বাহাদুর খাঁ-র সমাধি

বারীন্দ্রনাথ দাশ

সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা—৬

ঘোষণা প্রথম প্রকাশ :
ভাদ্র ১৩৬৮। অগস্ট ১৯৬১

প্রচ্ছদ চিত্র : ধ্রুব রায়

প্রকাশক : কৃষ্ণলাল ঘোষ
সুপ্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড
৯ রায়বাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

মুদ্রক : শ্রীকালীপদ নাথ
নাথ ব্রাদার্স প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৬ চালতাবাগান লেন
কলিকাতা-৬

ব্লক ও প্রচ্ছদ মুদ্রণ : রয়্যাল হাফটোন

বাঁধাই : নিউ ইণ্ডিয়া বাইণ্ডার্স

দাম : পাঁচ টাকা

জসরাজ

কল্যাণীয়েষু

এই উপন্যাসের চরিত্র, চরিত্রের নাম, ঘটনা প্রভৃতি নিতান্তই কাল্পনিক। কোথাও কোনো সাদৃশ্য সম্পূর্ণ অনিচ্ছাকৃত এবং আকস্মিক।

রচনাকাল:

ডিসেম্বর ১৯৪৯

এবং

ডিসেম্বর ১৯৬০ থেকে ফেব্রুআরি ১৯৬১

: এই লেখকের অন্যান্য বই :

কর্ণফুলি	রাজা ও মালিনী
রঙের বিবি	মিতালী-মধুর
বেগম বাহার লেন	নিশীথ-নিঝুম
অনুরঞ্জিতা	দুলারীবাঈ
পূর্বরাগের ইতিহাস	অনেক সন্ধ্যা, একটি সন্ধ্যাতারা
অন্তরতমা	ইমন বেহাগ বাহার
বিশাখার জন্মদিন	চন্দ্র-চকোর
চায়না-টাউন	অতনু ও জীবনদেবতা

সে আজ অনেক বছর হয়ে গেল।

মিমিকে আমার আজো মনে পড়ে দূরান্ত পথের বাঁকে ক্লান্ত পথিকের অপস্রিয়মান ছায়ার মতো।

পুরোনো দিনগুলোর অসংখ্য বিচিত্র মুহূর্ত আলোর ফুলকি হয়ে উড়ে এসেছে আর ভেসে চলে গেছে অন্ধকারের অগুণতি জোনাকির মতো। তাদের মনে করে কখনো কখনো ভাবপ্রবণ হয়ে ওঠা যায়, কিন্তু মনে না রাখলেও চলে। সেদিনের অবসর বিলাসের আনন্দ-মুখরতায় চেনা-অচেনার ভিড়ে মিমি ছিলো প্রবহমান নদীর মাঝখানে একটি সাময়িক উদ্দাম ঘূর্ণির মতো, কেউ সেখানে তলিয়ে গেছে, কেউ ভেসে চলে গেছে পাশ কাটিয়ে। তার সে এক রূপসজ্জা আমি দেখেছি। কিন্তু যেমনি মনে থাকে না ঝড়ের রাতের ক্ষণিক বিজলীকে যেমনি মনে থাকে না উষাকালের প্রথম কিছুক্ষণের বর্ণচ্ছটা, তেমনি সেই মিমিকে আমার তেমন পরিষ্কার মনে নেই। মনে আছে শুধু পটভূমিকা, যেমনি করে আকাশকে সবার মনে থাকে। আমার মনের ক্যানভাসে সেই গোধুলি-ধূসর ছবিখানি আজো অম্লান হয়ে আছে, সে ছবি প্রদীপ-দীপ্ত নগরসন্ধ্যার চটুল মজলিসের আনন্দ-বিভ্রমতায় দেখিনি, দেখেছি কোনো কোনো তন্দ্রানিথর আমেজী সন্ধ্যায়, মন যখন উত্তেজনাময় টেস্ট-ম্যাচের শেষে ফাঁকা স্টেডিয়ামের মতো।

সে-ছবি যেন কোনো এক অভিব্যঞ্জনাবাদী মেজাজী শিল্পীর আঁকা, যার তুলির রঙ সীমিত থাকেনি রেখা ও গঠনের বন্ধনে, কিন্তু সামান্য আলো আর অসামান্য ছায়ার বিন্যাসে স্বপ্নময় হয়ে আছে।

……শোয়ে ড্যাগনের উত্তর-দূরান্ত পটভূমিকার কোলে রেঙ্গুনের পশ্চিমপ্রান্তিক শহরতলি, সেদিকে আলোন ছাড়িয়ে লামডর কাছাকাছি, প্যাগোডা রোডের অনেক এদিকে;—চায়না-স্ট্রীটের ওদিক থেকে গেলেও ট্রাম চেপে রেলওয়ে ওভারব্রিজ পার হয়ে যেতে হয় অনেকখানি পথ। একদিকে চলে গেছে সিগন্যাল-প্যাগোডা রোড। ট্রাম থেকে নেমে খানিকটা হেঁটে গিয়ে তারপর মোড় ফিরতে হয়। সেখানে জনবিরল আবছায়া শীর্ণ সরল-রেখায়িত পথে ঘন-সবুজ গাছের নীলাভ-ধূসর ছায়ায় নিথর হয়ে লুটিয়ে-পড়া নিসাড় বৃহস্পতিবারের সন্ধ্যা। তারই এক প্রান্তে একটি জীর্ণ সমাধি, হঠাৎ দেখলে কোনো পীরের দরগাহ্ বলেই মনে হয়। সেদিন সেই উনিশ শো চল্লিশ একচল্লিশে খুব কম লোকেরই মনে ছিলো যে এই সমাধি ভারতের শেষ মোগল সম্রাট বাহাদুর শা-র। ইটের পাঁজার উপর একটি রূপোর চেরাগ, অনেকদিনের পুরোনো বলে কালো হয়ে এসেছে, আলোর মৃদু শিখাটুকু কেঁপে কেঁপে উঠছে দমকা হাওয়ায়। সামনে একটি দীর্ঘ পাষাণ বেদী, তার আশেপাশে ছায়া দুলে দুলে উঠছে। একপাশে বসে আছে একটি মেয়ে। গায়ে কামিজের উপর গাঢ় নীল রঙের জাকিট। পাতলা শিফনের আশমানী দুপাট্টা অবগুণ্ঠনের মতো মাথায় তুলে দেওয়া, তার দুটি প্রান্ত কাঁধের উপর নামিয়ে এনে বুকের উপর জড়ানো। হাত দুটো আঁজলা করে মেলে ধরা, ঠোঁট দুটো একটু একটু নড়ছে।

চারদিক নিসাড়, নিস্তব্ধ।

বৃহস্পতিবার রাতের কবর-জিয়ারত করছে বিস্মৃত সম্রাটের অবজ্ঞাত প্রপৌত্রী, বিংশ শতাব্দীর নগর-জীবনের রূপকথার এক হারানো রাজকন্যা।……

সে বছরটা বোধ হয় উনিশ শো চল্লিশ।

এপ্রিল মাস।

সেদিন ছিলো বর্মীদের জল-উৎসব, স্থানীয় ভারতীয়েরা যাকে বলতো পানি-খেলা। মনসুন শুরু হওয়ার আগে নিদাঘের দুঃসহ তাপ যখন চরমে ওঠে, ঠিক সে সময় হয় জল-উৎসবের অনুষ্ঠান, অনেকটা উত্তর ভারতের হোলির মতো, শুধু রঙ আর আবীরের বদলে ঠাণ্ডা জল। খুব স্নিগ্ধ, সতেজ, খুব প্রাণময় এই উৎসব, স্ত্রী-পুরুষ বালক নির্বিশেষে সবাই এতে যোগ দেয়, পিচকিরি, ঝারি আর বাটি দিয়ে পরস্পর পরস্পারের দিকে জল ছুঁড়ে দেয়। এই উৎসব শুধু বর্মীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না, এতে যোগ দেয় শহরের অন্যান্য বিদেশীরাও। সেদিন সবারই জামাকাপড়,—ছেঁড়া জামাকাপড় নয়, ভালো দামী জামাকাপড়,—জলে ভেজা। ধনী-নির্ধন, ছোট বড়, স্ত্রী-পুরুষ, দেশী-বিদেশী সবাই সারাদিন সদ্যোস্নাত। কোনো রাগারাগি নেই, কোনো কথা কাটাকাটি নেই, ঝগড়া-বিবাদ নেই, সারাদিন শুধু ঘরে বাইরে পথে ঘাটে অফুরন্ত হাসি।

সারাদিন পথে পথে ঘুরে বেড়ায় স্ত্রীপুরুষ যুবক যুবতী বালক-বালিকার দল, কেউ বাসে, ট্রাকে, মোটর গাড়িতে, কেউ বা হেঁটে। সবারই হাতে পিতলের পিচকারি, রূপোর বা ল্যাকারের কাজ করা বাটি আর জলের বালতি। বাস, ট্রাক, মোটর বেশির ভাগই রঙীন কাগজ রাংতা আর ফুলের পাতায় ময়ুর, হাঁস,ড্র্যাগন, হাতি বা অন্য কোনো আকৃতিতে সাজানো। সবার মাথায় রবারের

ক্যাপ, পরনে জমকালো সিল্কের লুঙ্গি, এক একটা দলের বিশেষ বিশেষ বর্ণ সজ্জা। সবারই মুখে গান, গানের সঙ্গে অনেকেরই নাচ, সেই সঙ্গে সুর আর তাল মিলিয়ে বাজে বেহালা, স্প্যানিশ গীটার, আর ব্যাঞ্জো। যখনই একটা দলের সঙ্গে আরেকটা দলের দেখা হয়, সঙ্গে সঙ্গে শুরু জল ছোঁড়া-ছুঁড়ির সংগ্রাম। এক দল আরেক দলকে চুবিয়ে দেয়, সবাই চিৎকার করে হাঁকতে থাকে,—য়ি-ডা-ব, য়ি-ডা-ব য়ি-ডা-ব। এই কথার ঠিক অনুবাদ অন্য ভাষায় হয় না। আমাদের খুব আনন্দ, খুব ভালো লাগছে, আমরা প্রাণ ভরে হেসে নিচ্ছি, এত কথা পর পর বলে গেলে যে ভাবটা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, সেটা য়ি-ডা-ব'র ভাবার্থের অনেকটা কাছাকাছি।

সব চাইতে সুন্দর সাজানো গাড়ির জন্যে রূপোর ট্রফি আছে, তাই নিয়ে নানা দলের মধ্যে ঘোরতর প্রতিযোগিতা। বিজয়ী দল নির্ণয় করতে করতে বিচারকেরা জলে স্নান করে গেল। চারিদিকে শুধু জল আর হাসি। থেকে থেকে গান আর গান। চারদিকে সবাই জলে চুবোনো। ভেজা জামা গায়ের সঙ্গে এঁটে গেছে, ভেজা জামার ভেতর দিয়ে পরিস্ফুট হয়ে উঠছে ছেলেদের মাংশপেশী আর মেয়েদের সুঠাম গঠনের জ্যামিতি। চারদিকে এত রং, এত হাসি, এত হুল্লোড়ের উচ্ছ্বাস যে কেউ সরে থাকতে চাইবে না এই উৎসব থেকে। পথের দু পাশে কৃষ্ণচূড়া আর রাধাচূড়ার গাছগুলিও এই উৎসবের অনুপ্রেরণায় যেন রঙীন পুষ্পসম্ভারে স্তবকময় হয়ে উঠলো, গোছা গোছা হলদে লাল পাপড়ি ঝরিয়ে দিলো পথের উপর, পথিকদের উপর।

নানা দেশের নানা জাতের লোক আছে নগরের অধিবাসীদের মধ্যে। বর্মীদের এই জাতীয়-উৎসব যেন তাদেরও নিজেদের উৎসব হয়ে ওঠে। ভারতীয়, ইউরোপীয়, এ্যাংলো-ব্রার্মিজ, চীনা, সিনো-বার্মীজ, জেরবাদী কেউ সরে থাকে না। স্ত্রী-পুরুষ সবাই জলের ঝারি আর পিচকারি হাতে পথে নেমে পড়ে। অল্প কয়েকজন যারা পথে নামে না, তারাও এসে দাঁড়ায় জানলায়

বারান্দায়, হাসি মুখে উপভোগ করে নগর-বীথির বারিসিঞ্চন সংগ্রাম, শেষ পর্যন্ত থাকতে না পেরে নিজেরাই জানলা বা বারান্দা থেকে জল ঢালতে শুরু করে রাস্তার লোকজনের উপর।

এত জলের বর্ষণে সমস্ত দিনটা যেন শীতল স্নিগ্ধ হয়ে থাকে প্রথম বৈশাখের প্রখর রোদ্দুর সত্ত্বেও। ভেজা পথ ঘাট পিছিল হয়ে থাকে, চিক চিক করতে থাকে সূর্যের আলোয়। চারদিকে হাজার পায়ের ছুটোছুটি।

পথের পাশে খোলা হাইড্রেন্ট থেকে জল উপচে পড়তে থাকে। গাছে গাছে কলরব করতে থাকে চকিত পাখিরা। পথের কুকুর ছুটে যায় এদিক থেকে ওদিকে। পুরুষদের শোরগোল, মেয়েদের শীৎকার, বাচ্চাদের চিৎকার চেঁচামেচি। সমস্ত শহর যেন পথে বেরিয়ে পড়েছে।

সেদিন পথে দেখা যায় না শহরের বেড়ালদের। এত অগুণতি বেড়াল এই শহরে, সেদিন সবাই উধাও।

চারদিকে শুধু জল আর হাসির প্লাবন। এদেশে এত হাসি, প্রাচ্যের আর কোনো দেশে এত হাসি শোনা যায় না।

আমি ভেবেছিলাম সেদিন বাড়ি থেকে বেরোবো না, কিন্তু একটু বেলা হতেই ইউনিভার্সিটির কয়েকজন বন্ধু এসে চড়াও হোলো। ওরা আমার কোনো আপত্তিই শুনলো না। সুতরাং ধুতি-পাঞ্জাবি ছেড়ে আমায় পরতে হোলো সাদা সিল্কের স্পোর্টস্‌-শার্ট আর রুপোলী সুতোর ডুরিদার নীল সিল্কের লুঙ্গি। মাথায় চাপাতে হোলো কান ঢাকা পাতলা নীল রবারের টুপি, যাতে কানে জল না ঢোকে।

ওরা বললে, "সর্দি কাল হবে। আজ তো প্রাণভরে হেসে নাও।"

আমি যে দলে ভিড়ে গেলাম, তার পোশাকের রঙ ছিলো নীল। ছেলে মেয়ে সবারই নীল লুঙ্গি। একটি কনভার্টিবল গাড়ি লাল আর সাদা ফুলে রথের মতো সাজানো হয়েছে। তারই ভেতর আর সবার

সঙ্গে ঠাসাঠাসি করে জায়গা করে নিলাম। আমাদের দলের সবাই ইউনিভার্সিটি কলেজের ছাত্রছাত্রী। বেশির ভাগই বার্মিজ, তবে কিছু ভারতীয় আর এ্যাংলো বার্মানও ছিলো, এবং সবারই বার্মিজ পোশাক। সারাদিন আমরা ঘুরে বেড়ালাম শহরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে, চষে বেড়ালাম বোটাটঙং, পজুনডঙং, বাহান, আলোন প্রভৃতি বার্মিজ মহল্লা, দক্ষিণ-পশ্চিমের চায়না টাউন, এবং মধ্য-পূর্ব ও মধ্য-পশ্চিমের ভারতীয় এবং ইঙ্গ-ভারতীয় পাড়া। কোকাইন লেকে যত জল আছে, তার চাইতেও যেন বেশী জল ছড়িয়ে দিলাম সারা শহরে, প্রাণভরে ছেলেমেয়ে সবাই হাঁকলাম,— য়ি-ডা-ব, য়ি-ডা-ব……।

সন্ধ্যে হতে না হতে উৎসব শেষ হয়ে এলো। ক্লান্ত বোধ করলাম সবাই। গায়ের জামা-লুঙ্গি তখন অল্প অল্প শুকিয়ে এসেছে।

"চমৎকার কেটেছে দিনটা," সবাই বলাবলি করলো।

"আজকের দিনটা বেশ ছিলো," বললো কো-চ্য-থেইন, "তেমন গরম নয়। এপ্রিল মাসের পক্ষে বেশ ঠাণ্ডা। ওয়াটার ফেসটি-ভ্যালের পক্ষে চমৎকার।"

দুষ্টু মেয়ে মা-খিন-চ্যি বললো, "কাল থেকে নিশ্চয়ই বৃষ্টি শুরু হবে।" ভবিষ্যৎ-বাণীর মতো শোনালো তার কথাগুলো। সংসারের সব মেয়ের মতোই তার নিজের ভবিষ্যৎ-দৃষ্টির উপর তার অগাধ বিশ্বাস।

"কাল থেকে কেন?" ইসমাইল জিজ্ঞেস করলো। সে ইণ্ডিয়া থেকে নতুন এসেছে। বার্মার আচার-বিশ্বাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানতো না।

"ওয়াটার ফেস্টিভ্যাল", বললো জিমি এ্যাঙ্গাস, "ঠিক মনসুন শুরু হবার আগে হয়।"

"কথা বললে উল্টো করে," কো-চ্য-থেইন বললো। সে একটু থেমে ভাবলো, বোধ হয় কি করে বোঝানো যায় জল-উৎসবের উদ্দেশ্য অথচ সেটা ঠিক কুসংস্কার মনে না হয়। "গ্রীষ্ম ঋতুর শেষে

আমাদের ওয়াটার ফেস্টিভ্যাল হয়, যাতে দেবতারা খুশি হয়ে মেঘ আর জল পাঠিয়ে দেয় আমাদের দেশে।”

ইসমাইল জিজ্ঞেস করলো, “তাই বুঝি তোমাদের দেশে এত বর্ষা ?”

কো-চ্য-থেইন হাসলো, “আমি ঠিক সে কথা বলবো না,” সে উত্তর দিলো, “কিন্তু আমি চিরকালই দেখেছি যে ওয়াটার ফেসটি-ভ্যালের পরই বর্ষা শুরু হয়ে যায়। আমাদের দেশের লোক তাই এই উৎসবের সঙ্গে বর্ষার একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক নির্ণয় করতে ভালোবাসে।”

“আমি যদি নাট্ হতাম”, আমি বললাম—বর্মী ভাষায় দেবতাকে বলে নাট্, সংস্কৃত “নাথ” কথা থেকে এসেছে—, “আমার প্রথম অনুশাসন হোতো,—নো ওয়াটার ফেস্টিভ্যাল, নো রেইন্‌স্। জল-উৎসব প্রতিপালিত না করলে বর্ষা পাবে না।”

সবাই খুব হেসে উঠলো। খুব সহজে হাসতে পারে বর্মী জাত। ওরা যখন হাসবে, আপনাকে হাসির ধারায় চুবিয়ে দেবে, যেমনি করে সবাইকে জলের ধারায় চুবিয়ে দেয় জল-উৎসবে। হাসির একটা উপলক্ষ হলেই হোলো। যে কথায় কলকাতা বা দিল্লী বা লণ্ডনে কেউ একটুখানি ভুরু উত্তোলন করবে, ঠোঁট গোল করে শুধু বলবে—“ও”, সে কথায় যে কোনো বার্মিজ ছেলে বা মেয়ে ফোয়ারা হয়ে যাবে। তাদের হাস্য রসের উৎসও খুব সরল, সহজ, কোনো সূক্ষ্মতার অপেক্ষা রাখে না।

“বাঃ, আমাদের সহপাঠি একজন নাট্,” বলে উঠলো কো-চ্য-থেইন, “তোমরা কেউ আগে জানতে ? ওর দিকে তাকিয়ে দেখ।”

কো-মওং-জ্যি হাতজোড় করে শেকো করলো আনত হয়ে, বললো, “এত বৃষ্টি যে সর্দি হয় আমাদের প্রফেসারদের, কলেজে ক্লাস না হয়, যাতে আমরা ছেলেরা মেয়েরা মিলে কোকাইন লেকে নৌকা বাইতে পারি।”

“তথাস্তু,” আমি বললাম নাট্-সুলভ গাম্ভীর্যে, “তোমার প্রতি

বিশেষ পক্ষপাতিত্ব করে এই বর দিচ্ছি যে তোমার নৌকোয় তোমার সঙ্গে দুজন মেয়ে থাকবে।"

হাসির বন্যা বয়ে গেল।

মা-লা-লা মেয়ে একটু বেশী প্রশ্ন করে, "দুজন মেয়ে কেন? একজন আর একজনের পাহারাদার?"

বয়ে গেল আর একটি দমকা হাসির হাওয়া।

"প্রত্যেক ছেলের দুটো করে কান," উত্তর দিলো রোজী মেহতা, "একটি করে কান মলে দেওয়ার জন্যে একটি করে মেয়ে। তুমি তো তাই ভাবছিলে, না?"

"নাট্ কিছু ভাবে না," আমি বললাম, "নাট্ শুধু বর দেয়।"

এভাবে হাসি আর কথার ঝড় বইয়ে আমি চললাম বাড়িমুখো, বাঁয়ে রয়্যাল-লেক আর ডাইনে শোয়ে-ড্যাগন রেখে।

কো-চ্য-থেইনের মাথায় হঠাৎ একটা মতলব এলো।

"চলো আমরা সবাই প্যাগোডায় যাই", সে বললো, "সেখানে খুব উৎসব হচ্ছে। ওই দেখছো, রাস্তার ধারে একটি প্যাণ্ডাল? ওখানে বোধ হয় আজ রাত্তিরে পোয়ে হবে।"

"পোয়ে কি?" ইসমাইল আমায় জিজ্ঞেস করলো। এমন গাধা, এদেশে এসেছে তিন মাস হোলো, কোনো খবর রাখে না।

বললাম, "পোয়ে এদেশের নৃত্য-নাট্য। খুব সুন্দর জিনিস, তোমার খুব ভাল লাগবে।"

"চলো যাই," সে বললো।

কিন্তু মেয়েরা বাড়ি ফিরে যেতে চাইলো। ওরা খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছে।

আমরা পাঁচজন নেমে পড়লাম,—কো-চ্য-থেইন, ইসমাইল, আমি, জিমি অ্যাঙ্গাস, আর অশোক বোস।

অন্য সবাই হাত নেড়ে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেল।

তখন অন্ধকার হয়ে আসছে।

জ্বলে উঠেছে শোয়ে-ড্যাগন প্যাগোডার সমস্ত আলো। প্যাগোডার স্বর্ণ চূড়া ঘিরে আলোর মালা, চূড়ার উপর সোনার "ঠী", সম্রাট আলাওংফায়ার রাজছত্র। সেখানে সম্রাটের দেওয়া একটি পদ্মরাগ মণি ছিলো, ঠিক একটা আস্ত নারকেলের মতো বড়। উনিশ শো তিরিশের ভূমিকম্পে সেটি স্থানচ্যুত হয়ে পড়ে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেছে। চারদিকে ছোটো সোনার ঘণ্টা। ঘণ্টাগুলো নানা সুরে টুংটাং করে বাজছে লেকের ওদিক থেকে বয়ে আসা মৃদু হাওয়ায়। চারদিকে অনেক লোক। কেউ এগিয়ে যাচ্ছে প্যাগোডার দিকে, কেউ বা নেমে আসছে প্যাগোডার দীর্ঘ প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে। কেউ চারদিকে এমনি ঘুরে বেড়াচ্ছে হাসি আর গল্পে মশগুল হয়ে। পথের ধারে এখানে সেখানে খাবারের স্টল। প্রত্যেকটি দোকানে ভিড়। জিভে জল আসে খাউ-সোয়ে আর মোহেইঙ্গার গন্ধে।

আমরা গল্প করতে করতে এগিয়ে যাচ্ছিলাম ভিড়ের মধ্যে পথ করে নিয়ে, এমন সময় হঠাৎ দেখতে পেলাম অমিয় গাঙ্গুলীকে।

"আই-সে, কো-চ্য-থেইন্," আমি বললাম, "তোমরা এগিয়ে যাও। আমি একটু পরে আসছি।"

ওরা অন্যদিকে চলে গেল। আমি ভিড় ঠেলে একটি খাউসোয়ে-স্টলের ভিতর ঢুকলাম।

সেখানে এককোনে বসেছিল অমিয় গাঙ্গুলী। তার কাঁধে হাত রেখে ডাকলাম, "অমিয়।"

সে ফিরে তাকালো।

"সলিল? হালো ডিয়ার! তুমি কোত্থেকে! এসো, এসো," সে বলে উঠলো, "এদ্দিন ছিলে কোথায়? কতকাল দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে!"

"প্রায় দু-বছর," আমি বললাম।

"হ্যাঁ, প্রায় দু-বছর। দাঙ্গা শুরু হওয়ার আগে তুমি আমার ওখানে এসেছিলে, তারপর আর তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। ছিলে কোথায়? আসো নি কেন?"

অমিয় থাকতো পজুনডওঙ অঞ্চলের বার্মিজ মহল্লায়। উনিশ শো আটত্রিশে খুব জোর দাঙ্গা বেঁধেছিলো রেঙ্গুনের বর্মী আর ভারতীয়দের মধ্যে। সে সময় এবং তারপরও বছর খানেক সে অঞ্চলে যাওয়া কোনো ভারতীয়ের পক্ষে নিরাপদ ছিলো না। আমার ধারণা ছিলো অমিয় হয়তো সে অঞ্চল ছেড়ে চলে গেছে অন্য কোথাও। কিন্তু কেউ আমায় কোনো খবর দিতে পারেনি তার সম্বন্ধে।

"আমি সেই আগের বাড়িতেই আছি," সে বললো আমায়।

"ওখানকার বর্মীরা কোনো গোলমাল করেনি?"

একটুও না। আমাদের পাড়ার বর্মীরা আমায় খুব ভালবাসে। ওরা আমার দেখাশোনা করতো। এখন অবশ্য সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ওপাড়ায় যেতে কোনো ভয় নেই। এসো না একদিন। তোমায় পেলে মা-খিন-ম্যা খুব খুশী হবে। সে প্রায়ই জিজ্ঞেস করে তোমার কি খবর, তুমি আসো না কেন।"

"দিলাওয়ার বখ্‌ত্‌-এর কি খবর", আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"ও ভালোই আছে। ও কবে খারাপ থাকে?"

"আগের মতো ওর নাক উঁচু এখনো?"

অমিয় হেসে ফেললো। "কি খাবে?" সে জিজ্ঞেস করলো, তারপর দোকানদারকে হেঁকে বললো আরেক প্লেট খাউসোয়ে পাঠিয়ে দেওয়ার জন্যে।

অমিয় আমার স্কুল জীবনের বন্ধু। সে বয়েসে আমার চাইতে

কয়েক বছরের বড়ো, পড়তোও দুক্লাস উঁচুতে, কিন্তু এই পার্থক্য সত্বেও সখ্যতা ছিলো খুব। এককালে অমিয়-দা ডাকতাম, কখন অমিয়দা থেকে শুধু অমিয়-তে নেমে এসেছে, সে আমার ভালো মনে নেই।

সে খুব ভালো গান গাইতো। প্রথমে শিখেছিলো তার মায়ের কাছে। উনি খুব ভালো গজল আর ঠুংরি গাইতেন। পরে শিখেছিলো এক ওস্তাদের কাছে। রেঙ্গুনে অনেক লক্ষপতি কোটিপতি সুরতী মুসলমানের বাস। ওরা অনেক সময় বহু টাকা খরচা করে বড় বড় ওস্তাদকে ভারতবর্ষ থেকে এনে কিছুদিন নিজেদের কাছে রাখতো।

একবার লাহোর থেকে এসেছিলো মিয়াঁ গুলদস্তা খান। কোনো এক আসরে অমিয়র গান শুনে গুলদস্তা খানের কি খেয়াল হোলো, বললো, আমি তোমায় খেয়াল শেখাবো। ওস্তাদ ছ-মাসের জন্যে এসেছিলো, অমিয়কে গান শেখাতে গিয়ে তিন বছর থেকে গেল। মায়ের কাছে শিখে ছেলেবেলা থেকেই অমিয়র তৈরী গলা, তার ওপর ছিলো আশ্চর্য শ্রুতিধর। তিন বছরের মধ্যেই সে যা শিখলো অনেকে সাত বছরেও তা শিখে উঠতে পারে না।

ওর কাছে গান শুনে শুনে আমারও কান তৈরী হয়ে গেল ভারতীয় রাগ সঙ্গীতে। তা নইলে ওই বিদেশে ভারতীয় রাগ-সঙ্গীতের জন্যে রুচি তৈরী হওয়াটা ছিলো অভাবনীয় ব্যাপার। সাধারণ ভারতীয়দের মধ্যে গ্রামোফোন-রেকর্ডের চালু গান আর বাঙালী শিক্ষিত সমাজে কিছু রবীন্দ্র-সঙ্গীত ছাড়া আর কোনো গান শোনাই যেতো না বড় একটা।

শুধু ওর গানের জন্যেই আমাদের বন্ধুত্ব খুব গভীর হয়ে উঠেছিলো।

হাই-স্কুল ফাইন্যাল দেওয়ার আগেই সে স্কুল ছেড়ে দিয়েছিলো। সে বলেছিলো, তার বাবার অল্প আয়ে স্কুল বা কলেজ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। আর গান গাওয়া ছাড়া আর কিছু করা যখন সম্ভব হবে না। তার পক্ষে, তখন পড়াশুনা করেই বা কি হবে? আমি জানতাম

যে পড়াশুনা করতে হলে সে ঠিক মতো রেওয়াজ করতে পারে না বলেই পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছিলো। পড়ার বই তার একেবারেই ভালো লাগতো না। নাইন্থ্ স্ট্যাণ্ডার্ডে সে ফেল করেছিলে দু-বার।

সে স্কুল ছেড়ে দিলেও তার সঙ্গে আমার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয় নি। আমাদের প্রায়ই দেখা হোতো। কিন্তু আমি স্কুল থেকে বেরিয়ে যখন কলেজে এলাম, সে বছরই সাংঘাতিক দাঙ্গা হোলো সারা বার্মায়, বিশেষ করে রেঙ্গুনে। তখন থেকেই তার সঙ্গে যোগাযোগটা হারিয়ে ফেলেছিলাম।

"তুমি এখানে কি করছো?" আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম।

"মা-য়িন-ম্যার ট্রুপ আজ রাত্তিরে এখানে পোয়ে-নাচ দিচ্ছে," সে বললো, "রাত্তিরে খাওয়া-দাওয়ার পর শুরু হবে। বোধ হয় ন-টায়। তুমি থাকবে ততক্ষণ?"

"বোধ হয় থাকবো," আমি উত্তর দিলাম, "ঠিক জানি না। কয়েকজন বন্ধু আছে আমার সঙ্গে। আমায় এক্ষুণি আবার ওদের কাছে ফিরে যেতে হবে। পোয়ে-তে তোমার সঙ্গে আবার দেখা হবে, কেমন? বলো তোমায় কোথায় পাবো।"

পোয়ের প্যাণ্ডাল কাছেই ছিলো, সে যে জায়গায় বসবে, আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো।

খাউসোয়ে খেতে খেতে আরো কিছুক্ষণ এটা-ওটা-সেটা গল্প করলাম আমরা। তারপর আমি উঠে পড়ে চললাম আমার অন্য বন্ধুদের খোঁজে।

খুঁজতে অসুবিধে হওয়ার কথা নয়। আমি জানতাম ওদের কোথায় পাওয়া যাবে।

প্যাগোডার প্রশস্ত সিঁড়ির দুপাশে নিচের থেকে উপর অবধি অসংখ্য ফুলের স্টল। বর্মী মেয়েরা সেখানে ফুল, মোমবাতি, ধূপ আর কাগজের ছাতা বিক্রি করে। সুন্দর তাদের সাজ, পায়ে সোনার মল, মুখে তানাখার পাউডার, চুলে নানা রঙের ফুল। তাদের একজন ছিলো মা-লা-মে। আমাদের কো-চ্য-থেইন্এর দূর আত্মীয়

হয় সম্পর্কে। আমরা যখনই প্যাগোডায় যেতাম, ফুল কিনতাম তারই কাছ থেকে। তারই দোকানে জুতো রেখে প্যাগোডার ভিতরে যেতাম, সে আমাদের পান খাওয়াতো, চা খাওয়াতো। প্যাগোডা থেকে বেরিয়ে প্রায়ই তার স্টলে বসে কিছুক্ষণ গল্প করতাম। সেও পছন্দ করতো আমাদের সাহচর্য।

আমার বন্ধুরা নিশ্চয়ই এখন তার ওখানে বসে চা খাচ্ছে, আমি ভাবলাম।

যা ভেবেছিলাম তাই। ওরা সবাই ওখানে ছিলো,—কো-চ্য-থেইন, এ্যাঙ্গাস, ইসমাইল আর অশোক বোস।

ফুল পশারিনী মা-ল:-মে আমার জন্যে এক বাটি চা এনে দিলো।

"তোমায় না দেখলাম অমিয়র সঙ্গে কথা বলতে", অশোক ভুরু তুলে বললো, "ওর সঙ্গে তোমার আলাপ আছে জানতাম না।"

"ও আমার অনেক দিনের বন্ধু", আমি একটু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলাম।

রেঙ্গুন শহরের বাঙালী মহল অমিয়কে খুব একটা বাঞ্ছনীয় ব্যক্তি মনে করতো না। একটু ছোটো নজরে দেখতো তাকে। নানা রকম কথা শোনা যেতো অমিয়র মা-বাবার সম্বন্ধে। সে সব কাহিনী নীতি-বাগীশদের রুচিকে ক্ষুণ্ণ করতো, কিন্তু সে সব কথা শোনবার পর ওর মা-বাবার উপর আমার শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গিয়েছিলো।

অমিয়র মা একদা ছিলো লক্ষ্ণৌয়ের নাম-করা বাঈজী। অর্থ এবং অনুরাগীর অভাব ছিলো না। দূর দূর শহর থেকে তার মুজরোর বায়না আসতো। অমিয়র বাবা চাকরি করতো কমিশারিয়িটে। সাধারণ চাকরি, কিন্তু কি করে যেন আলাপ হোলো ওদের মধ্যে। মেয়েদের কাকে কখন কিভাবে এবং কেন ভালো লাগে সে কথা বুঝে ওঠা অসম্ভব ব্যাপার। মধ্যবিত্ত জীবনের অনিশ্চিতির পরিবেশে সুখময় বিবাহিত জীবনের পরিপূর্ণতার জন্যে সে নিজের সচ্ছল জীবনের সহজ রোজগারের মায়া কাটিয়ে, নিজের বৃত্তি পরিত্যাগ করে সুদর্শন কেরানীর ঘরণী হোলো।

সে এক যুগ আগেকার কথা। নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের ঘরে বাঈজী কুলবধু তখনকার সমাজ সহ্য করবে কেন? সামাজিক উৎপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে সুদর্শন গাঙ্গুলী লক্ষ্ণৌ ছেড়ে চলে এলো কলকাতায়। সেখানেও টিকতে পারলো না আত্মীয় স্বজন পাড়া-পড়শীর দুর্ব্যবহারে। তার সামাজিক অপবাদ তার চাকরি-বাকরি পাওয়ার ব্যাপারেও একটা বাধা হয়ে দাঁড়ালো সুতরাং শেষ পর্যন্ত দেশের মায়া ত্যাগ করে সুদর্শন গাঙ্গুলী চলে এলো বর্মায়। এখানে ওসব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না, চাকরিও জুটে গেল সহজেই। বাঙালী মহলেও নানা কথা উঠলো বটে, কিন্তু এই বিদেশে নিন্দুকদের তুচ্ছ করে থাকা যায়।

আমি যখন অমিয়র মাকে দেখেছি, তখন তাঁর প্রৌঢ় বয়েস। সুন্দর সৌম্য চেহারা। বাঙালী-ঘরের আর দশজন গিন্নির মতো স্বামী আর সংসার নিয়েই সারাদিন কেটে যায়। গান ছেড়ে দেননি, কিন্তু ছেলেমেয়েদের সামনে ছাড়া আর কারো সামনে গাইতেন না। অমিয়র বন্ধু বলে আমিও মাঝে মাঝে শুনতে পেতাম তাঁর গান। সে এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা, গান শুনতে শুনতে আমরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকতাম।

অনেক বছর পরে কলকাতায় আমার এক বন্ধুর বৃদ্ধ পিতা আমায় বলেছিলেন,—লক্ষ্ণৌতে ছিলো এক পান্নাবাঈ। ও রকম গান আর শুনিনি। সে ছিলো একটা যুগ। তোমরা তো সব মিউজিক কনফারেন্সের শ্রোতা। ওসব গান তোমরা আর শুনবে কোথেকে?

শুনে আমি একটু হেসেছিলাম। ওঁকে বলিনি যে পান্নাবাঈয়ের সামনে আমি আর ওঁর ছেলে অমিয় পাশাপাশি বসে গান শুনেছি। আমরা যে গান শুনেছি, সে-গান ওই হৃতগৌরব বৃদ্ধ প্রাক্তন জমিদার তাঁর সুদিনের সমস্ত সঞ্চয় ঢেলে দিয়ে শুনতে পেতেন না কোনোদিন।

সেই মায়ের কাছে গান শিখেছিলো অমিয়।

"অমিয় গাঙ্গুলী চমৎকার গান গায়," ইসমাইল বললো, "আমি লক্ষ্ণৌতে, দিল্লীতে মানুষ, আমাদের বাড়িতে গানের আসর বসে নিয়-মিত। এই বিদেশে এসে যে আমি ওই জাতের গান শুনতে পাবো,

সে কথা গাঙ্গুলীর গান শোনবার আগে ভাবতেই পারতাম না, ও ঠুংরি অদ্ভুত গায়।"

"তোমার বুঝি খেয়াল ঠুংরি ভালো লাগে?" অশোক জিজ্ঞেস করলো।

"ভালো লাগে?" ইসমাইল চোখ তুলে বললো, "একটা ভালো খেয়াল শুনিয়ে কেউ আমায় কিনে নিতে পারে।"

"কি জানি, আমি ওসব বুঝি না," অশোক নাসারন্ধ্র স্ফীত করে উত্তর দিলো, "শুনেছি ওর মা নাকি গান টান গান। এককালে ওই পেশা ছিলো।"

"ওর মায়ের সম্বন্ধে দয়া করে আলোচনা করবে না আমার সামনে," আমি বললাম, "উনি আমার মাসীমা হন।"

"তোমার মাসীমা?" অশোক ভুরু তুলে আমার দিকে তাকালো।

"ওর মা কি ছিলো, না ছিলো তা নিয়ে আলোচনা করে কী লাভ" বললো ইসমাইল, "অমিয় গুণী লোক, ভালো গাইয়ে, আমার পক্ষে তাই যথেষ্ট।"

অশোক কিন্তু থামলো না, সে বলে গেল, "অমিয় গাঙ্গুলীর ধরন-ধারনও ভদ্রঘরের ছেলের মতো নয়। ওর মেলামেশা সব আজে-বাজে লোকের সঙ্গে। অনেক খারাপ মেয়েমানুষের সঙ্গে ওর অন্তরঙ্গতা। আমি বুঝি না, সলিল ওর সঙ্গে কথা বলে কেন। সলিলের বাবা নিশ্চয়ই একথা জানেন না, জানতে পারলে নিশ্চয়ই খুশী হবেন না।"

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই ইসমাইল বললো, "সলিল কার সঙ্গে কথা বলবে না বলবে সেটা ওর মাথা ব্যথা, তুমি তোমার বিজনেস মাইণ্ড্ করতে পারো।"

ইসমাইলের উত্তরের পর আমার আর উত্তর দে'ওয়া প্রয়োজন ছিলো না। আমি চুপ করে রইলাম। অশোক কলেজে আমার চাইতে এক-ইয়ার উঁচুতে পড়তো, ওর সঙ্গে আমার তেমন অন্তরঙ্গতা ছিলো না, কিন্তু সেদিন থেকে ওর উপর আমার একটা ঘেন্না ধরে গেল।

এটা সত্যি যে অমিয়কে বোঝা ওর মতো লোকের পক্ষে সম্ভব নয়। ওদের একটা বাঁধা জীবনের ধরন। বাপ বড়ো সরকারী চাকুরে। নিজেরা বার্মার ডোমিসাইলড হয়ে গেছে। এখানকার স্থায়ী ভারতীয় অধিবাসীদের আর দশজনের সুপুত্রের মতো সেও আশা করে যে পড়াশুনো শেষ করে বি-সি-এস ক্লাস-ওয়ান না হোক ক্লাস-টুতে ঢুকে পড়তে পারবে। বাঁধা ছকে ফেলা তাদের জীবন, অমিয় গাঙ্গুলীর জীবনধারার অনুমোদন করা তাদের সীমিত সুনীতি-মগ্নতায় সম্ভব নয়।

ওরা না জানুক, আমি জানতাম।

রেঙ্গুনে ধনী ভারতীয় ব্যবসায়ীরা অনেক সময় মুজরোর বায়না দিয়ে বাইজী নিয়ে আসতো বেনারস থেকে, লক্ষ্ণৌ থেকে। ওরা আসতো, দু-চার ছ-মাস থেকে চলে যেতো। তেমনি এসেছিলো এক নর্গিসবাঈ। পঞ্চাশের কাছাকাছি বয়েস, কিন্তু এই বয়সেও এমন আশ্চর্য ঠুমরি গাইতো সব বয়সের অতীত অপরূপা মনে হোতো তাকে। সে অমিয়র মা পান্নাবাঈকে জানতো। পান্নাবাঈ তার সঙ্গে দেখা করেনি, কিন্তু সে খবর দিয়ে অমিয়কে ডাকিয়ে নিয়েছিলো। অমিয় প্রায়ই যেতো তার কাছে। সে নিজের ছেলের মতো ভালবাসতো অমিয়কে। অমিয় তার কাছে তালিমও নিয়েছিলো তিন চার মাস।

লোকে জানলো যে অমিয় নর্গিসবাঈয়ের কাছে পড়ে থাকে সর্বক্ষণ। তাই নিয়ে দুর্গাবাড়িতে, বেঙ্গল ক্লাবে, বেঙ্গল স্পোর্টিং ক্লাবে, চট্টল-সমিতিতে নানারকম আলোচনা তাস-পাশা-ক্যারাম-বোর্ডের আড্ডায়।

সুদূর প্রাচ্যের অন্যতম কর্মব্যস্ত বন্দর রেঙ্গুন নগরী। অন্যান্য বহু জাতি অধ্যুষিত নগরের মতো এখানেও একদল পুরুষ ও মেয়ে আছে যারা সব সম্প্রদায়ের সামাজিক গণ্ডির বাইরে। তাদের মধ্যে যারা ভারতীয়, তাদের সঙ্গে অমিয়র একটা যোগাযোগ ছিলো। যে সমাজে স্থান পায় না, সব সমাজের বাইরে যে সমাজ আছে সেখানে সে

জায়গা করে নেবেই। অমিয় খুব ভালো গান গাইতো বলে এই শ্রেণীর পরিবারগুলোর মহিলামহলে তার একটা খাতির ছিলো। কখনো কখনো কারো না কারো সঙ্গে যে অন্তরঙ্গতাও হোতো না তা নয়। তবে আমি জানতাম যে, সে সব তার জীবনে এক একটা সাময়িক ঘটনা মাত্র, তার বেশী কিছু নয়। তার জীবনে ছিলো একটি মাত্র প্রণয়, সেটা তার গান।

অশোক তখনো থামেনি। সে বলছিলো, "আমি যদ্দুর জানি অমিয় এখন যার সঙ্গে থাকে, সে তার বিবাহিতা স্ত্রী নয়। বছর কুড়ি একুশ বয়েস, এরই মধ্যে এত? এ ধরনের লোক আমি একেবারে পছন্দ করি না।"

একথার মধ্যে খানিকটা সত্যি ছিলো, কিন্তু এরকম অভিযোগ করবার মতো নয়। কারণ সেই মেয়েটির সম্বন্ধে কেউ বিশেষ কিছু জানতো না।

ব্যাপারটা শুরু হয় বছর দুয়েক আগে, দাঙ্গা শুরু হওয়ার বোধ হয় মাস তিন চার আগে। সুরতী-বড়বাজারের কয়েকজন ধনী সুরতী-মুসলমানের উদ্যোগে টামওয়ে অঞ্চলে এক বাগান বাড়িতে একটি পার্টিতে কাওয়ালী গাইতে আমন্ত্রণ করা হয়েছিলো অমিয়কে। সেখানে তার আলাপ হোলো এক জেরবাদী মনোহারিণীর সঙ্গে। তার নাম মা-য়িন-ম্যা। সে ছিলো পোয়ে নাচিয়ে, সেখানে তাকে আমন্ত্রণ করা হয়েছিলো বর্মী অতিথিদের মনোরঞ্জন করতে।

বর্মী নারী আর বাঙালী মুসলমানের সংমিশ্রনে বর্মার জেরবাদী সম্প্রদায়ের উদ্ভব। আচারে ব্যবহারে এরা প্রায় বর্মী। এদের পোশাক, ভাষা, এমন কি নামধামও বর্মী। কিন্তু ভাঙা ভাঙা উর্দু'ও এরা বলতে পারে। এ সম্প্রদায়ের মেয়েদের দেহে চরিত্র-গলানো পূর্ণতা পেয়েছে, বর্মী যৌন-আবেদন আর ভারতীয় রূপ! মঙ্গোলীয় চিকন-সোনালী গায়ের রং, মাখনের মতো নরম গা, আর আশ্চর্য মসৃণ গায়ের চামড়া,—কিন্তু চোখা নাক, টানা বড়ো বড়ো ভারতীয় চোখ। জেরবাদী মেয়েদের মধ্যে এমন একটা বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আছে

যা সচরাচর দেখা যায় না বর্মার অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে। তাদের সংস্পর্শে এসে অনেক বিদেশী ভুলে গেছে নিজেদের দেশ-ঘর আপনজনের কথা, এবং কোনোদিন আক্ষেপ করেনি।

অমিয়ও না ভুলে পারলো না। তাদের অন্তরঙ্গতা আস্তে আস্তে বর্ণময় হয়ে উঠলো বর্মী গুলমোহরের মতো। মা-য়িন-ম্যার আকর্ষণ অমিয় প্রতিরোধ করতে পারলো না। সে ওর মায়ের সঙ্গে থাকতো পজুনডঙং অঞ্চলে একটি কাঠের বাড়িতে। একদিন অমিয় ওর বাড়িতে একটি ঘর নিয়ে ভাড়াটে হয়ে উঠে এলো।

উনিশ শো আটত্রিশের মার্চ মাসের সেই ঝিরঝিরে বিকেল বেলার কথা আমার এখনো মনে আছে। আমি কিছু জানতাম না, প্রায়ই যেমনি যেতাম, তেমনি বেড়াতে গিয়েছিলাম অমিয়দের বাড়ি। দেখলাম সিঁড়ির সামনে ঠিকে-গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। স্যুটকেস আর বিছানা গাড়ির চালের উপর তুলে দেওয়া হয়েছিলো আগেই। অমিয় তার তানপুরো নিয়ে গাড়িতে উঠছে।

আমায় দেখে বললো, "আমি এখান থেকে উঠে যাচ্ছি। চল্ আমার সঙ্গে, আমার নতুন বাড়ি দেখে আসবি।"

গাড়িতে ওঠবার আগে আমি উপর দিকে তাকালাম। অমিয়র মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে। মনে হোলো চোখ দুটো ছলছল করছে। আঁচলে নাক মুখ ঢাকা। ওর ছোট বোন ম্লান মুখে উঁকি মারছে জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে।

শুনেছিলাম, অমিয়র মা অমিয়র সঙ্গে খুব ঝগড়া করেছিলো। কিন্তু অমিয়র বাবা বলেছিলেন, যেতে চাইছে, যেতে দাও। এখানে যদি ওর মন না লাগে ওকে জোর করে ধরে রাখা যাবে না। একদিন তুমিও আমার জন্যে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে চলে এসেছিলে, আজ ছেলেও আরেকজনের জন্যে ঘর ছেড়ে চলে যাচ্ছে। হয়তো মেয়েও একদিন চলে যাবে। ওদের আটকে রাখবো সে জোর কোথায়। যে যার সুখী হওয়ার পথ নিজে নিজে খুঁজে নিক, বাধা দিতে যেও না, বাধা দেওয়া ঠিক নয়। তুমি সুখী হয়েছো, ওরাও সুখী হবে। শুধু

ওকে বলে দাও, ও যখন খুশি ফিরে আসতে পারে। আমার দরজা ওর জন্যে সব সময় খোলা থাকবে।

সেদিন থেকে অমিয় থাকছে মা-য়িন-ম্যার বাড়িতে।

আর সেই মা-য়িন-ম্যা আজ এখানে এসেছে তার দল নিয়ে প্যাগোডার পাশের মাঠে পোয়ে নাচ দেখাতে, যে নাচ দেখতে এসেছি আমরা সবাই।

আনমনে ভাবছিলাম মা-য়িন-ম্যা আর অমিয়র কথা। কখন দেখি মা-লা-মের দোকানের এক কোণে আমি চুপচাপ বসে আছি একটি টুলের উপর। সামনে তক্তপোশের উপর বসে মা-লা-মের সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে কো-চ্য-থেইন, এ্যাঙ্গাস, ইসমাইল আর অশোক।

আমি যখন পূর্ব নির্দিস্ট জায়গায় অমিয়র কাছে গিয়ে বসলাম, তখন সাড়ে আটটা বেজে গেছে।

শুরু হোয়ে গেছে পোয়ে নাচের আসর। খোলা মাঠে বর্মী স্ত্রী-পুরুষের ভিড়, সবাই মাটিতে বসে পড়েছে পাটি পেতে। ইবে-সা-ল, অর্থাৎ ভাজা সিম, চীনে বাদাম, পান, সিগারেটের ভারা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে হকারেরা। মাঠের একপাশে মোহেইঙ্গা-ওয়ালা, মলেই-সাঁ-ওয়ালীরা তাদের খাবার আর পানীয়ের ভারা নিয়ে খুব তোড়জোড় করে বিক্রি করতে বসে গেছে।

পোয়ের মঞ্চটা গোল। চারদিক খোলা। সামনে পিছনে ডাইনে বাঁয়ে ঘিরে বসেছে দর্শকেরা। মঞ্চের উপর দুজন ভাঁড় খুব অঙ্গভঙ্গী করে অভিনয় করছে আরেকজন নর্তকীর সঙ্গে। তাদের সংলাপ আগের থেকে তৈরী করা নয়, দর্শকের মন বুঝে মঞ্চের উপর তৈরী করতে হয় সঙ্গে সঙ্গে। তাদের কথা শুনে দর্শকেরা হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। একজন ভাঁড় একটা অবাঞ্ছনীয় রসিকতা করলো নর্তকীর সঙ্গে। নর্তকী তার হাতপাখা দিয়ে মারলো তার টাকের উপর। হাসির ঝড় বয়ে গেল চারিদিকে।

মা-য়িন-ম্যা তার নাচের পোশাক পরে মঞ্চের এককোণে বসে সিগারেট খাচ্ছে, নিজের হাতপাখা নেড়ে হাওয়া খাচ্ছে মাঝে মাঝে, কখনো বা কথা বলছে যন্ত্রীদের সঙ্গে।

"একটু আগে আমি মা-য়িন-ম্যাকে বলেছি যে তোর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তুইও পোয়ে দেখতে আসছিস," অমিয় বললো। "সে তোকে কাল আমাদের বাড়ি চা খেতে আসতে বলেছে।"

বছর দুয়েক আগে, যদ্দিন দাঙ্গা বাধেনি, প্রায় প্রত্যেকদিন বিকেলবেলা অমিয়র সঙ্গে গল্প করতে যেতাম মা-খ্নিন-ম্যার বাড়ি। অমিয় গান শোনাতো, আর মা-খ্নিন-ম্যা চা খাওয়াতো, নয়তো বা জিন-দো, মলেই-সাঁ কিংবা শরবৎ তৈরী করে খাওয়াতো।

ওই বিদেশী শহরে অমিয়র মতো ভালো গাইতে পারতো না কেউ। ভারতীয় মহলে তার যথেষ্ট খাতিরও ছিল। কিন্তু প্রবাসী বাঙালীদের মধ্যে তার ডাক পড়তো না কোনোদিনই। যার মা ছিলো লক্ষ্ণৌয়ের মুজরাওয়ালী, যে এক সময় পড়ে থাকতো নর্গিস-বাঈয়ের কাছে, যে এখন থাকে এক জেরবাদী পোয়ে নর্তকীর সঙ্গে, তাকে কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ করবার সাহস বাঙালী-মহলে কারোই ছিলো না। পজুনডওং অঞ্চলের যে মহল্লায় সে থাকতো সেখানে কোনোদিন কোনো বাঙালী পদার্পণ করেছে বলে শোনা যায়নি। শরৎ চাটুজ্যে নাকি কিছুকাল সেখানে বাস করে-ছিলেন বলে শোনা যায় বুড়োদের মুখে, তবে ওঁর কথা আলাদা। উনি সে সময় ছিলেন এ-জি অফিসের কেরানী, কেউ তাঁকে নিয়ে মাথা ঘামাতো না। তাঁরও যদি গান গাইবার সুনাম না থাকতো, অনেকে সে সময় তাঁকে চিনতোই না হয়তো। কবি নবীন সেন যখন বার্মায় যান তাঁর ছেলে রেঙ্গুনের ব্যারিস্টার নির্মল সেনের কাছে বেড়াতে, তখন তাঁকে ফেয়ার স্ট্রীটের বেঙ্গল ক্লাবে অভিনন্দন দেওয়া হয়। সেখানে গান গাইতে ডাকা হয়েছিলো শরৎ চাটুজ্যেকে। গানের প্রশংসা হোলো, সবাই খোঁজ করলো, কে এই শরৎ বাবু। কে একজন বললে, পজুনডওংএ থাকে। শুনে কয়েকজন ভুরু উত্তোলন করলো। আরেকজন বললে, না, আজকাল সেখানে থাকে না, এখন সাঁইত্রিশ নম্বর গলিতে উঠে এসেছে। শুনে উত্তোলিত ভুরু আনমিত হোলো। পজুনডওঙের চাইতে সাঁইত্রিশ নম্বর গলি ভালো, যদিও এরও কোনো আভিজাত্য নেই। ফেয়ার স্ট্রীট, লুইস স্ট্রীট, স্পার্কস স্ট্রীট, মোটামুটি ভদ্রপাড়া। ভদ্র বাঙালীরা থাকে এসব রাস্তায়, নয়তো বা স্পার্কস স্ট্রীটের পর যে পর পর

সমান্তরাল ভাবে চলে গেছে ফর্টি-ফার্স্ট স্ট্রীট, ফর্টিসেকেণ্ড স্ট্রীট, ক্রকিং স্ট্রীট, ফর্টিথার্ড স্ট্রীটে এবং তার পূব দিকে অন্যান্য ভদ্র অঞ্চলে। কেউ কেউ তখন গিয়ে বাঙালী পাড়া গড়ে তুলছে লোকের কাছে কালা-বস্তিতে। কিন্তু শহরের বাইরে থিঙ্গান্‌জুন, কামায়ুট, ওচ্যিন, জোগোন, ইনসীন অঞ্চলে বাঙালীরা তখনো ছড়াতে শুরু করেনি। তবে ফেয়ার স্ট্রীট আর লুইস স্ট্রীটের মাঝখানে সাঁইত্রিশ আর আটত্রিশ নম্বর গলি, লুইস স্ট্রীট আর স্পার্কস স্ট্রীটের মাঝখানে উনচল্লিশ আর চল্লিশ নম্বর গলি এসব পাড়ায় থাকে রিকসা-ওয়ালা, কাঠ-মিস্ত্রী, পাইপ-মিস্ত্রী শ্রেণীর লোকেরা, পথে গুণ্ডারা ঘুরে বেড়ায়, সোডার বোতল নিয়ে মারামারি হয় প্রায়ই সন্ধ্যের পর, নিম্ন শ্রেণীর গণিকালয় ছড়ানো আছে এখানে সেখানে—সে সব জায়গায় বাঙালীরা বড়ো একটা বাসা ভাড়া নেয় না, নেহাৎ অল্পবিত্ত না হলে। সাঁইত্রিশ নম্বর গলিতে ছিলো সামান্য মাইনের বাঙালী কেরানীদের একটি মেস, পজুনডওং অঞ্চল থেকে কেউ সেখানে উঠে এসেছে শুনলে তার যে আত্মিক উন্নতি হয়েছে সে কথা মেনে না নিয়ে উপায় নেই। সে সব তো উনিশ শো দশ এগারো সালের কথা। এই উনিশ শো উনচল্লিশ সালে যদি কোনো বাঙালী পজুনডওং অঞ্চলের নিষিদ্ধ মহল্লায় বসবাস করে তো সে ক্ষমার অযোগ্য।

সুতরাং বাঙালীদের কোনো সামাজিক অনুষ্ঠানে দেখা যেতো না অমিয় গাঙ্গুলীকে। বার্মার বাঙালীদের সব চেয়ে বড় অনুষ্ঠান হোতো ডিসেম্বর মাসে বড়দিনের বন্ধে। তার নাম ছিলো নিখিল ব্রহ্ম প্রবাসী বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন। সেখানে মূল সভাপতি রূপে আহূত হতেন কলকাতার কোনো নাম করা কেউ, শাখা অধিবেশন-গুলোর সভাপতি হোতো স্থানীয় বাঙালী অধ্যাপকেরা। গান বাজনা অভিনয়ের খুব ভারী প্রোগ্রাম হোতো সেখানে। কোরাস গাইতো বাঙালী কিশোরীরা; গান গাইতো, সেতার বাজাতো স্থানীয় শিল্পীরা। গান মোটামুটি ভালো হলেও খুব উচ্চাঙ্গের রাগসঙ্গীত একেবারে শোনা যেতো না, কারণ সে গান গাইবার মতো অমিয়

গাঙ্গুলী ছাড়া আর কেউ ছিলো না। কলকাতার অতিথি সে গান শুনেই বিমুগ্ধ হোতো, তাঁর তদ্বিরে বিস্তৃত খবর বেরোতো কলকাতার খবরের কাগজে। তাইতেই পরিতৃপ্ত থাকতো সম্মেলনের উদ্যোক্তারা।

উনিশ শো উনচল্লিশে আমার চেনা এক ভদ্রলোক ছিলেন কর্ম-কর্তাদের অন্যতম। তাঁকে বললাম বিবিধ অনুষ্ঠানের কর্মসূচীতে অমিয় গাঙ্গুলীর ঠুম্‌রি গান রাখতে।

"ঠুম্‌রি!" আঁৎকে উঠলো সেই ভদ্রলোক, "এটা সাহিত্য সম্মেলন, মাইফেল নয়। ওসব ঠুম্‌রি-ফুম্‌রি চলবে না। বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে ঠুমরির কি সম্পর্ক?"

একবার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হোলো মূল-সভাপতির অভিভাষণ ছাড়া সম্মেলনের কর্মসূচীর আর কিসের সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের সম্পর্ক আছে। নামে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলন, আসলে তো বার্মার বিভিন্ন জায়গার বাঙালীদের বৎসরান্তে একবার মিলিত হয়ে আনন্দ করবার সামাজিক অনুষ্ঠান।

একটু থেমে আসল কারণটাই বলে ফেললেন সেই ভদ্রলোক। "লোক যখন জিজ্ঞেস করবে, অমিয় গাঙ্গুলীর কী পরিচয় দেবো?"

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে রেঙ্গুন রেডিওতে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রোগ্রাম থাকতো প্রত্যেক রোববার দশটা থেকে সাড়ে দশটা। সেখানে মাঝে মাঝে গান গাইতো অমিয়। তাছাড়া মাঝে মাঝে মাইফেল হোতো সুরতী-মুসলমান বা গুজরাতী ব্যবসায়ীদের বাড়িতে। অমিয়র ডাক পড়তো সে সব জায়গায়। তার আসল রোজগার ছিলো কাওয়ালী গানের আসরে।

টিউশনির চেষ্টা সে করেছিলো, কিন্তু পায়নি। বাঙালী-মহলে মেয়েদের গান সেখানোর রেওয়াজ ছিলো, তার জন্যে তিন চার জন চালু মাস্টারও ছিলো। ওরা অফিসে চাকরি করতো। সকাল সন্ধ্যে গানের টিউশানি করতো। কয়েকটা রবীন্দ্র সংগীত, কয়েকটা আধুনিক, কিছু ভজন, খুব বেশী হলে কোনো খেয়াল গানের

বন্দীশটুকুর সঙ্গে আটমাত্রার তিন চারটে সহজ তান,—এই পর্যন্ত ছিলো ওদের দৌড়।

একদিন তাদেরও রোজগার গেল। পোনাবস্তিতে বাঙালীরা একটা স্কুল করেছিলো, তার গানের মাস্টারের জন্যে বিজ্ঞাপন বেরোলো কলকাতার কাগজে। এক শো পঁচিশ টাকা মাইনে,—উনিশ শো চল্লিশে সে অনেক টাকা। অনেক আবেদন এলো কলকাতা থেকে। নিযুক্ত হোলো প্রতুল চৌধুরী, কলকাতার বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ সঙ্গীতাচার্য অতুল চৌধুরীর ভাই-পো। এই পরিচয়ের উপর আর কিছু দরকার হোলো না। সঙ্গীতাচার্যের ছেলেরাও খেয়াল ধ্রুপদে খুব নাম করেছে, প্রতুল চৌধুরীর নাম তেমন শোনা বলে মনে না হলেও যখন ওর গানের রেকর্ড আছে, রেডিওতে গেয়েছে বলছে, নিশ্চয়ই বড় ওস্তাদ। সে রেঙ্গুনে আসবার পর হঠাৎ তার কাছে মেয়েদের গান শেখানো একটা ফ্যাশান হয়ে দাঁড়ালো। কার কাছে গান শেখে আপনার মেয়ে,—না, সঙ্গীতাচার্য অতুল চৌধুরীর ভাইপোর কাছে। রেঙ্গুনের স্থানীয় গানের মাস্টারদের টিউশানি একটা একটা করে বন্ধ হোলো।

মোগল স্ট্রীটের গুজরাটী জুয়েলার মনুভাই-শা খুব সঙ্গীতরসিক লোক। তার বাড়িতে একদিন প্রতুল চৌধুরীকে আমন্ত্রণ করা হোলো, গান গাইতে ডাকা হোলো মাসুদী-গলির লতিফ কাওয়াল আর অমিয় গাঙ্গুলীকেও। অমিয়র সঙ্গে আমিও গিয়েছিলাম সেখানে। লতিফ কাওয়ালের গজলের পর অমিয় চন্দ্রকোশ রাগে একটি খেয়াল গাইলো, তারপর গাইলো একটি ঠুম্‌রি।

তার গান শেষ হওয়ার পর গান গাইবার পালা প্রতুল চৌধুরীর। সে তখন পান চিবুতে চিবুতে বললো, "একটা বড় ভুল হয়ে গেছে মনুভাই সাহেব। আমি গান গাইতে রাজী হয়েছিলাম বটে, কিন্তু তখন একটা কথা আমার মনে ছিলো না। আজ আমার পিতামহ সঙ্গীতবারিধি পণ্ডিত কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরীর মৃত্যুতিথি। এদিনে আমাদের ঘরানার কেউ তানপুরো উঠায় না।"

অমিয় আমার দিকে তাকিয়ে শুধু একটু হাসলো।

শুনেছিলাম, প্রতুল চৌধুরী অনেককে বলেছিলো ওই অমিয় গাঙ্গুলী ছোঁড়াটা গান গাইতে জানে নাকি? বনগাঁয়ে শিয়াল রাজা, তাই এই রেঙ্গুন শহরে যা খুশি তাই গলা দিয়ে বার করছে। কলকাতার কোনো আসর হলে কান ধরে তুলে দিতো।

প্রতুল চৌধুরীকে কোথাও কোনোদিন খেয়াল গাইতে শুনিনি। রাগপ্রধান নয়তো বা ভজন, ওই পর্যন্ত। একদিন জিজ্ঞেস করেছিলাম। উত্তর দিয়েছিলো, এখানে খেয়াল কে বুঝবে?

টিউশানির বাজার একচেটিয়া করে রেখেছিল প্রতুল চৌধুরী। ওদিকে আর কেউ ঘেঁসতে পারেনি। বাঙালী মহলে অমিয়র টিউশানি পাওয়ার উপায় ছিলো না। আর অন্যান্য ভারতীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে টিউশানির রেওয়াজ ছিলো না। হয় তো ওসব পরিবার অত্যন্ত গোঁড়া, মেয়েরা গান শেখে না, অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যায়; নয়তো বা অত্যন্ত পাশ্চাত্যভাবাপন্ন শেখে তো পিয়ানো, ভায়োলিন, খেয়াল নয়। আর ছেলেদের গান শেখবার সময় কোথায়? বার্মা দেশ পয়সা করবার জায়গা। ছেলেরা পয়সার ধান্দাতেই আছে।

অমিয়র গান জমতো তার বাড়ির আসরে। সেখানে আসতো কয়েকজন সঙ্গীতরসিক বন্ধু। আসর বসতো নিয়মিত। তবলা সঙ্গত করতো একজন মারাঠী, বালাজী রাও, সারেঙ্গি বাজাতো মোগল স্ট্রীটের আলি মুহম্মদ, গান গাইতো অমিয়, মাথা নাড়তাম আমি আর পান শরবত খাওয়াতো মা-য়িন-ম্যা।

সেখানেই দিলাওয়ার বক্‌স্‌কে আমি প্রথম দেখি।

অমিয়র সঙ্গে তার খুব বন্ধুত্ব ছিলো। সে আসতো, এককোণে খুব চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে থাকতো। প্রথম প্রথম তার উপস্থিতিই আমার মনে অসোয়াস্তি এনে দিতো। তার দীর্ঘকান্তি সুন্দর চেহারায় একটা দূরত্ব-বজায়-রাখা আত্মসচেতন আভিজাত্য ছিলো যেটা তার আশেপাশে সবাইকে মনে করিয়ে দিতে পারতো যে, সে

যদি একটু হাসেও বা কারো দিকে তাকিয়ে, অথচ পুরোটা না তাকিয়ে, তা হলেই যেন একটা বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশ করা হয় যার জন্যে মনটা ওই একটুকুতেই নরম হয়ে যেতে পারে অবুঝ কৃতজ্ঞতায়। আমার দিকে মাঝে মাঝে সে চোখ মেলে তাকাতো। আমার কি রকম যেন মনে হোতো যে, সে হয়তো ভাবছে আমার মত এত অল্পবয়েসী একজন এই পরিবেশে কেন।

তাকে আমার বোঝানোর অবকাশ,—এবং বন্ধুত্ব হবার পর বোঝানোর প্রয়োজন,—হয়নি যে, আমি মা-য়িন-ম্যার বাড়ি যেতাম তার একমাত্র কারণ আমাদের বাড়িতে আনা যেতো না অমিয় গাঙ্গুলীকে। আনা যেতো না এ জন্যে নয় যে পোয়ে-নর্তকীর অসামাজিক অন্তরঙ্গতার মধ্যে তার দিন কাটতো, যে জেরবাদী ললনার সঙ্গে আমারও একটা সহজ সখ্যতা গড়ে উঠেছিলো। আনা যেতো না তার কারণ আমাদের বাড়ির কড়া আবহাওয়া। সেখানে গাইয়ে বাজিয়ের কালোয়াতি চলবে না।

অমিয় আমার বন্ধু, মা-য়িন-ম্যাও আমার বন্ধু, সেই সুবাদে ওই বাড়িতে আমার যাওয়া আসা। তার পর অমিয়র জীবন যাত্রার ধরন কি রকম, আর মা-য়িন-ম্যার জীবন যাত্রার ধরন কি রকম, তাতে আমার কোনো আগ্রহ নেই।—এসব দিলাওয়ার বক্‌স্‌'এর জানবার কথা নয়, তাই তার পক্ষে অসম্ভব নয় একথা ভাবা যে, আমার মতিগতি হয়তো আমার বয়সী ছেলেদের থেকে একটু অন্যরকম।

তাতে তোমার পিতৃদেবের কি?—আমি মনে মনে ভাবতাম। মা-য়িন-ম্যা'র দিকে সে কি ভাবে তাকাতো, আমার নজরে যে পড়েনি তা-তো নয়। তবে এসব বিতর্ক আমার মনে মনেই, কারণ এমনি আমাদের মধ্যে সাধারণ দুটো চারটের বেশী কোনো কথাবার্তা হোতো না। হয়তো সে কিছুই ভাবতো না। হয়তো আমারই অবচেতন মনে একটু অপরাধবোধ ছিলো, যাদের সঙ্গে মেলামেশা করা বাড়িতে পছন্দ করবে না তাদের সঙ্গে মেলামেশা করি বলে। তাই মনে মনে কল্পনা করতাম এখানে কে আমার সম্বন্ধে কি ভাবছে।

হয়তো যাওয়া আসা আরো কিছুদিন থাকলে দিলাওয়ার বক্স্‌এর সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরো সহজ হয়ে যেতো। কিন্তু কয়েক মাসের মধ্যে ইন্দো-বার্মিজ দাঙ্গা বেধে গেল।

তারপর থেকেই কারো সঙ্গে আর যোগাযোগ নেই।

"কি ভাবছিস," অমিয় জিজ্ঞেস করলো, "তুই কোনদিন মা-য়িন-ম্যা'র পোয়ে নাচ দেখিস্‌নি, না? ওই ছাখ, সে উঠে দাঁড়িয়েছে। এবার ও নাচবে। নাচের পোষাকে ওকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে, না রে?"

তা দেখাচ্ছিলো।

কড়া অর্গাণ্ডি আর জমকালো সিল্কের সজ্জায় তাকে দেখাচ্ছিলো ম্যাণ্ডেলের রাজপ্রাসাদের অন্তঃপুরিকার মতো।

চার দিকের জনতা হঠাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। এত নিস্তব্ধ যে, স্পষ্ট শোনা গেল গাছের পাতার ঝিরঝির শব্দ। যন্ত্রীদের ঐকতানও থেমে আছে।

বিভিন্ন সুরের তিনটি কাঁসর বেজে উঠলো। একটি সুরের তরঙ্গ বয়ে গেল বিভিন্ন সুরে বাঁধা বর্মী তবলার উপর দু-সপ্তক জুড়ে। আবার শুরু হোলো যন্ত্রসঙ্গীত, শুরু হলো একটা উদ্দাম ঝড়ের মতো, যে রকম ঝড় এলে হঠাৎ মনে পড়ে যায় জীবনের প্রথম প্রেমের কথা। তেমনি একটা প্রেমের কাহিনী অবলম্বন করে এই নৃত্য নাট্য। আভার এক রাজকন্যার জীবনে প্রথম প্রণয়ের বন্যা এসেছে, এক অচেনা ভিনদেশী রাজকুমারের সঙ্গে তার দেখা হয়েছে নদীর ধারে বেড়াতে গিয়ে। সেই রাজকুমার মঞ্চের এক কোনে যন্ত্রীদের পাশে বসে চুরুট খেতে খেতে নিরাসক্ত মনে অবলোকন করছিলো তার নবনায়িকার শৃঙ্গার-নৃত্য। আর জলদ সুরতরঙ্গের তালে তালে অঝোর বৃষ্টির ধারার মতো দ্রুত পদপ্রক্ষেপে এক অনন্য চিত্ত-চেতনার আনন্দ-বেদনা ফুটিয়ে তুলছিলো সুন্দরী নর্তকী মা-য়িন-ম্যা।

মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে নাচ দেখছিলো চারদিকের নিস্তব্ধ জনতা।

কিন্তু অমিয় নাচ দেখছিলো না মোটেও। তার দৃষ্টির অনুসরণ করে আমিও তাকালাম।

পেছন দিকে দাঁড়িয়ে আছে একজন দীর্ঘ সুপুরুষ। চিনতে পারলাম তাকে। প্রায় দুবছর দেখা না হলেও তাকে আমি ভুলে যাইনি।

সে আমাদের দেখতে পায়নি। একমনে মা-য়িন-ম্যার নাচ দেখছিলো।

আমি অমিয়র দিকে ফিরে তাকালাম। দেখি, অমিয়র চোখে একটা বিষাক্ত দৃষ্টি।

"দিলাওয়ার এখানে কেন?" অমিয় চাপা ধারালো গলায় বললো, "ওর তো এখানে আসবার কোনো দরকার নেই।"

কেন আসবে না?—আমি ভাবলাম,—সেও পোয়ে দেখতে এসেছে আর দশজনের মতো। মুখে কিছু বললাম না। এ কথা অমিয়ও নিশ্চয়ই বোঝে। তা সত্ত্বেও যখন বলছে, তখন ব্যাপার কিছু আছে নিশ্চয়ই। অমিয় আর দিলাওয়ার না বন্ধু?—আমি ভাবলাম—কে জানে এই দুবছরের মধ্যে কি হয়েছে তাদের মধ্যে।

দিলাওয়ার-বক্‌স্‌ এক মনে তাকিয়ে রইলো মা-য়িন-ম্যা'র দিকে, অমিয় দিলাওয়ারের দিকে, আর আমি অমিয়র দিকে।

মা-য়িন-ম্যা তখনো নাচছে সংযম-হারা যন্ত্রসঙ্গীতের তালে তালে।

দূরে রয়্যাল লেকের জলে ঝিলমিল করছে শোয়ে ড্যাগনের অসংখ্য আলোর রেখাচিত্রের প্রতিবিম্ব।

জুডা-ঈজিক্যাল স্ট্রীট থেকে বেরিয়েছে সরু গলি। সে পথ ধরে খানিকটা গিয়েই ওয়াই-এম্-সিএ গ্রাউণ্ডস্। চারিদিকে অনেকগুলো ছোটো ছোটো ছবির মত বাড়ি। প্রায় বাড়ির সামনেই বারান্দায় জানালায় কোনে কানাচে নানারকম ফুলের টব সাজানো। তারই একটিতে থাকতেন প্রসন্ন সেন। সে সময় প্রায় সত্তর বছর বয়েস, মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে, কিন্তু এ-বয়সেও বেশ মজবুত ও কর্মঠ। ব্যবসা করে সামান্য অবস্থা থেকে খুব বড়ো হয়েছেন। আমাদের পরিবারের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠতা। ওঁকে জ্যাঠামশাই বলে ডাকতাম। নিজে অবসর সময় খুব পড়াশুনা করতেন বলে বাড়িতে একটা ভালো লাইব্রেরী ছিলো। মাঝে মাঝে সেখানে যেতাম বই আনতে। যদি ওঁর সঙ্গে দেখা হয়ে যেতো, ঘণ্টা দুয়েকের আগে উঠতে পারতাম না। বসে বসে শুনতে হোতো পুরোনো দিনের গল্প। উনি বর্মায় এসে-ছিলেন গত শতাব্দীর শেষ দিকে। তখন বানিজ্যবন্দর হিসেবে জাঁকিয়ে উঠেছে রেঙ্গুন নগরী। দলে দলে ভারতীয় এসে ভিড় করছে শহরে, ছড়িয়ে পড়ছে বাইরের মফস্বল অঞ্চলে। ওঁর মুখে সেসব দিনের গল্প শুনতাম।

একদিন বিকেলবেলা প্রসন্ন বাবুর বাড়ি গিয়ে দেখি ওঁর কাছে বসে আছে দিলওয়ার-বক্স্।

"এসো এসো কয়েকদিন ধরে তোমার কথাই ভাবছিলাম," বলে উঠলেন প্রসন্নবাবু, "সেদিন তোমায় বাহাদুর-শার শেষ জীবনের দিনগুলোর গল্প শোনাচ্ছিলাম। এই ভদ্রলোকও তোমায় অনেক কথা বলতে পারবেন। এঁর সঙ্গে আলাপ করে তুমি খুশী হবে। ইনি হলেন—"

ওঁর কথার মাঝখানে দিলওয়ার বলে উঠলো, "সলিলকে আমি চিনি।"

"চেনো!" আকাশ থেকে পড়লেন প্রসন্নবাবু, "কই তুমি তো আমায় বলোনি ?" বললেন আমার দিকে ফিরে।

"ওকে যে আপনি চেনেন সে কথাতো আমিও জানতাম না," আমি উত্তর দিলাম।

প্রসন্নবাবু বললেন, "আমি চিনবো না দিলওয়ারকে ? পুরোনো রেঙ্গুনের কাকে আমি না চিনি ?"

দিলওয়ার পুরোনো রেঙ্গুনের! আমি বিস্ময় প্রকাশ না করে পারলাম না। ওর বয়েস চব্বিশ পঁচিশের বেশী নয়।

"মীর্জা দিলওয়ার বক্স্ পুরোনো রেঙ্গুনের নয়," প্রসন্নবাবু উত্তর দিলেন, "কিন্তু ওর বাপ-পিতামহ এখানকার পুরোনো বাসিন্দা। ও যে বাহাদুর শা'র নাতির নাতি। তুমি জানো না ?"

মীর্জা দিলওয়ার বক্স্ বাহাদুর শা'র নাতির নাতি! আমি শুনে অবাক হলাম। অমিয়র বাড়িতে কেউ আমাকে ওর এই পরিচয় দেয়নি। ওখানে অমিয় ওকে নাম ধরে ডাকতো, অন্য সবাই ডাকতো দিলওয়ার সাহাব বলে। আমিও ওকে ওই নামেই জানতাম।

"তুমি ওকে কি করে চেনো ?" জিজ্ঞেস করলেন প্রসন্নবাবু।

আমি একটু ইতস্তত করলাম। অমিয় গাঙ্গুলীকে তিনি নামে চেনেন। যেহেতু তিনি আমার পিতৃবন্ধু, ওঁর একথা না জানাই বাঞ্ছনীয় যে অমিয়র ওখানে আমার যাতায়াত আছে।

আমি কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই দিলওয়ার বললো, "ওর এক বন্ধুর সঙ্গে আমার খুব চেনাজানা আছে। ওখানেই সলিলের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছে।"

আমার অন্য বন্ধুটি কে, প্রসন্নবাবু জানতে চাইলেন না। বললেন "দিলওয়ার আমার এখানেও মাঝে মাঝে আসে। ওর কাছ থেকে আমরা চিনে বাদাম কিনি।"

চিনেবাদাম! আমি একটু অবাক হয়ে প্রসন্নবাবুর মুখের দিকে

তাকালাম। উনি আমার বিস্ময়ের কারণ অনুমান করে খুব জোরে হেসে উঠলেন। বললেন, "না হে, তুমি যা ভাবলে তা নয়। বাহাদুর শার একজন বংশধর চিনে বাদাম বেচে আর ওর কাছ থেকে আমি চিনে বাদাম কিনি, এ কথা শুনতে খুব মজার, না? ব্যাপারটা তা নয়। দিলওয়ার চিনেবাদামের আড়তদার। আমাদের ফার্ম ওর কাছ থেকে প্রচুর চিনেবাদাম কেনে, কিনে সেগুলো বিদেশে রপ্তানি করে।

তবু ভালো। আমি একটু হাসলাম। দিলওয়ারও হাসলো।

"সলিল আমার ভাই-পো হয়," প্রসন্নবাবু বললেন দিলওয়ারকে। দেখলাম, দিলওয়ারেরও আগের সেই নাকউঁচু ভাবখানি আর নেই। তার চোখের চাউনি প্রবাসী ভারতীয়ের সহজাত সখ্যতায় সহজ!

চা খেতে খেতে খুব গল্প জমে উঠলো। দিলওয়ার প্রসন্নবাবুর কাছ থেকে যথেষ্ট সহায়তা পায় তার ব্যবসায়, সেজন্যে তাদের মধ্যে একটা হৃদ্যতা আছে। প্রসন্নবাবু আমাকে ওঁর ভাইপো বলে পরিচয় দিলেন বলে আমার সঙ্গেও সে আস্তে আস্তে সহজ হয়ে গেল।

দিলওয়ার সম্পর্কে আরেকটু বিস্তারিত বিবরণ জানবার জন্যে আমার একটু কৌতূহল হচ্ছিলো। আপনার বাপ ঠাকুরদার কথা বলুন বলে তো সোজাসুজি অনুরোধ করা যায় না। তাই একটু ঘুরিয়ে কথা পাড়লাম।

"আমি যদ্দুর শুনেছি বাহাদুর শার সঙ্গে বর্মায় এসেছিলেন শুধু এক ছেলে, মীর্জা জওয়ন-বখ্‌ত্‌।"

"না উনি একা নন ওঁর সঙ্গে আরো এক ছেলে ছিলো। তার নাম মীর্জা শাহ্‌ আব্বাস।"

"সেও কি জিন্নতমহল বেগমের ছেলে?" প্রসন্নবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

"না, অন্য এক স্ত্রীর ছেলে।"

"অন্য স্ত্রী কে ছিলো?" প্রসন্নবাবু ভুরু কুঁচকে ভাবলেন, "ও, হ্যাঁ। দাঁড়াও বলছি। কি যেন নাম? হ্যাঁ, তাজমহল বেগম। তাঁরই ছেলে বুঝি?"

"না," হাসলো দিলওয়ার, "মীর্জা শাহ্ আব্বাসের মা হলেন বেগম মুবারক'নিসা।"

"উনিই বুঝি আপনার প্রপিতামহ ?"

"না," দিলওয়ার হেসে উত্তর দিলো, "আমার প্রপিতামহ দিল্লীতে মারা যান। বাদশাহ তখনো বেঁচে ছিলেন। ওঁকে রেঙ্গুনে নিয়ে আসবার কিছুদিন পর আমার পিতামহকে রেঙ্গুনে আনিয়ে নেওয়া হয়। উনি তখন খুব ছোটো।"

আমার ইচ্ছে ছিলো একটু খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করা, বাহাদুর শার কোন ছেলের বংশধর এই দিলওয়ার বক্স্। কিন্তু সেই প্রসঙ্গ দিলওয়ার খুব সূক্ষ্মভাবে এড়িয়ে গেল। পরে জেনেছিলাম ব্যাপারটা। যাকে কেন্দ্র করে এই কাহিনী, তারই কাছে শুনেছিলাম।

শাহ আলম আর কুদসিয়া বেগমের ছেলে আকবর শা। তার প্রধান বেগম ছিলো মমতাজ মহল। তাদের চৌদ্দজন ছেলেমেয়ের মধ্যে ছিলো মীর্জা আব্দুল জাফর, মীর্জা বাবর আর মীর্জা জাহাঙ্গীর। মীর্জা বাবর পাশ্চাত্য ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে আদব কায়দায় একেবারে ইউরোপীয় বনে গিয়েছিলো। আকবর শা আর কুদশিয়া বেগম বেশী পছন্দ করতো না তাকে। ছোটো ছেলে মীর্জা জাহাঙ্গীর তাদের নয়নের মণি, তাকেই তখ্‌ত্‌এ বসানোর ইচ্ছে। কিন্তু ইংরেজের মনোনীত ওয়ারিশ বড়ো ছেলে মীর্জা আব্দুল জাফর। তাকে আকবর শা, মমতাজ মহল এবং জাহাঙ্গীর কেউই পছন্দ করে না, কারণ সে একটু আয়েসী লোক, খুব উদার তার মনোভাব, গজল লিখে, ঘুড়ি উড়িয়েই দিন কাটায়, হিন্দুস্থানের শাহী তখ্‌ত্‌এ বসবার মতো জবরদস্ত সে নয়। কিন্তু ইংরেজ গভর্ণর জেনারেল সোজাসুজি জানিয়ে দিয়েছে, আর কারো দাবি তারা বরদাস্ত করবে না। সুতরাং মীর্জা আব্দুল জাফরকে নানারকমভাবে নাস্তানাবুদ করতে চাইলো সবাই। মীর্জা জাহাঙ্গীর দুবার বিষ খাইয়ে তাকে হত্যা করতে চেয়েছিলো, কিন্তু পারেনি। বাদশাহ আকবর শা তার বিরুদ্ধে এই

অভিযোগ পর্যন্ত এনেছিলো যে আব্দুল জাফর আকবর শা'র অন্য এক বেগমের সাথে গোপন প্রণয়ে লিপ্ত আছে।

কিন্তু ইংরেজ সরকার কিছুতেই মীর্জা জাহাঙ্গীরকে দিল্লীর তখ্‌ত্‌-এর উত্তরাধিকারী বলে স্বীকার করলো না। আকবর শাহ্‌ ইংরেজের কাছ থেকে মাসোহারা পায়, সুতরাং ইংরেজের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করতেও পারলো না। রাজা রামমোহন রায়কে বিলেত পাঠিয়ে দিয়েও না পারলো নিজের মাসোহারা বাড়িয়ে নিতে, না পারলো নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও নিজের সার্বভৌম ক্ষমতাকে স্বীকৃত করিয়ে নিতে।

আকবর শাহ্‌র পর মীর্জা আব্দুল জাফর দিল্লীর তখ্‌ত্‌এ আসীন হোলো বাহাদুর-শা নাম নিয়ে।

বাহাদুর-শার নিজের সন্তান অনেক, সে ছাড়া আরো একজনকে বাহাদুর-শার হারেমের এক বেগম নিজের ছেলের মতো করে বড়ো করেছিলো। সে ছিলো বাদশাহ্‌ আকবর-শার কোনো এক কনিষ্ঠা বেগমের সন্তান, সেই বেগমের সঙ্গে বাহাদুর-শার নাম জড়িয়ে কলঙ্ক রটিয়েছিলো আকবর শাহ। এই ঘটনার কিছু পরে জন্ম হয়েছিলো সেই সন্তানের। তাকে খুব ভালোবাসতো বাহাদুর শা। আকবর শার বিভিন্ন বেগমের বিভিন্ন সন্তানের মধ্যে বেছে বেছে তারই উপর কেন বাহাদুর শার এত অপত্যস্নেহ, এ নিয়ে নানা প্রশ্ন, নানারকম কথাবার্তা শোনা যেতো হারেমের ভিতর। এই শাহজাদাকে অত্যন্ত অপছন্দ করতো বাহাদুর-শার প্রধানা বেগম জিন্নতমহল। কিন্তু সে বাদশাহ্‌র খুব প্রিয়পাত্র এবং শাহজাদা মীর্জা ফকরুদ্দীনের খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে তাকে কেউ কিছু বলতে পারতো না। অন্যান্য শাহজাদাদের সঙ্গে সেও বড়ো হয়ে উঠলো। শোনা যায়, বেগম জিন্নতমহল আঠারোশো বাহান্ন সালে মীর্জা ফকরুদ্দীনের সঙ্গে একেও বিষ খাইয়ে মারবার চেষ্টা করে। মীর্জা ফকরুদ্দীন মারা যায়, কিন্তু ভাগ্যক্রমে তার কোনো উপস্থিত ক্ষতি না হলেও বছর তিনেকের বেশী বাঁচেনি সেও।

সে আরো কিছুকাল বেঁচে থাকলে কি হোতো বলা যায় না, কিন্তু আঠারো শো সাতান্নোর স্বাধীনতা সংগ্রামের কিছু আগে দিল্লীর বাইরে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গিয়ে জখম হয়ে সে মারা যায়। লোকে বলতো, এই দুর্ঘটনার পেছনেও নাকি জিন্নতমহলের হাত ছিলো।

আঠারো শো সাতান্নো এলো। সংগ্রামের ঝড় ঝরাপাতার মতো উড়িয়ে নিয়ে গেল দুই শাহজাদা, মীর্জা মহম্মদ ও মীর্জা মুগলকে। মীর্জা দারা বখ্‌ত্‌ আর মীর্জা ফকরুদ্দীন তো আগেই ইহধাম পরিত্যাগ করেছে। বছর দুয়েক পরে, অক্টোবর মাসে লেফ্‌টেনান্ট অম্যানির তত্ত্বাবধানে দিল্লী পরিত্যাগ করে সুদূর বর্মায় নির্বাসনে চললো বাদশাহ বাহাদুর শা, দুই ছেলে মীর্জা জওয়ন বখ্‌ত্‌ আর মীর্জা শাহ আব্বাসকে সঙ্গে নিয়ে। জিন্নত মহল ছাড়া আরো দুজন বেগম ছিলো সঙ্গে, তাজমহল বেগম আর বেগম মুবারক-নিসা। আর ছিলো মীর্জা জওয়ন বখ্‌ত্‌এর স্ত্রী জামানী বেগম, তার মা আর বোন। আকবর শা-র কনিষ্ঠা বেগমের সেই স্বল্পপরিচিত সন্তান মারা যাওয়ার সময় রেখে গিয়েছিলো একটি অনাথ শিশুপুত্র। সেও বড় হচ্ছিলো বাহাদুর শার হারেমে। তার কিন্তু এই দলে স্থান হোলো না। বাহাদুর শা-র তখন খুব দুঃস্থ অবস্থা সেও তার কোনো ব্যবস্থা করে যেতে পারলো না।

সেদিন থেকে তৈমুর বংশ ইতিহাস থেকে নিখোঁজ।

সেই শিশুসন্তান মীর্জা আব্বাস শেকোকে কিছুদিন প্রতিপালন করেছিলো বাহাদুর শা-র দূর আত্মীয় মীর্জা আফতাবউদ্দীন সালাতিনের স্ত্রী রফি-উন্‌-নিসা। কিন্তু নানা কারণে ওরা বেশীদিন দিল্লীতে থাকতে পারে নি। মীর্জা আব্বাস শেকোকে নিয়ে ওরা চলে আসে কলকাতায়।

বাহাদুর-শার সঙ্গে এদেশের কোনো যোগাযোগ ছিলো না, কিন্তু লোকমুখে মীর্জা আব্বাস শেকোর খবর পেয়ে তাকে নিজের কাছে রাখবার ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলো। তখন আব্বাস শেকোকে

একজন বিশ্বস্ত ওমরাহ্‌র সঙ্গে রেঙ্গুনে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বৃদ্ধা জিন্নতমহল দুচোখে দেখতে পারতো না একেও। কিন্তু শাহজাদা মীর্জা জওয়ন বখ্‌ত্‌এর স্ত্রী জামানি বেগমের বোন তাকে প্রতিপালন করেছিলো নিজের ছেলের মতো।

তারই নাতি মীর্জা দিলওয়ার বক্‌স্।

এত কথা আমি তখনো জানতাম না।

প্রসন্ন বাবু বলছিলেন অন্য গল্প। উনি রেঙ্গুনে এসেছিলেন আঠারো শো পঁচানব্বুই কি ওরকম একটি সময়ে। সে সময়কার গল্প বলতে ওঁর খুব ভালো লাগতো। কোনো উপলক্ষ পেলেই শুরু করে দিতেন পুরোনো দিনের কাহিনী।

উনি তখন বলছিলেন, "মীর্জা জওয়ন বখ্‌ত্‌কে আমি দেখিনি। আমি আসবার আগেই উনি মারা যান।"

"হ্যাঁ, উনি মৌলমিনে মারা যান," উত্তর দিলো দিলওয়ার বক্‌স্, "সেই আঠারোশো চুরাশী কি পঁচাশীতে।"

"আমি তখনো রেঙ্গুনে আসিনি। তবে অন্য এক ছেলেকে একদিন দেখেছিলাম। যদ্দুর মনে পড়ে, সে বোধ হয় মীর্জা শাহ আব্বাস। সে বাড়ি থেকে বেশী বেরোতো না। একদিন কোনো এক জুম্মাবারে মোগল-স্ট্রীটের মসজিদে নমাজ পড়তে আসছিলো, তখন দেখেছিলাম।—আরো অনেক পরে, তখন বোধ হয় উনিশ শো তিন কি চার, শহরের এখানে সেখানে প্রায়ই একজন সুদর্শন মোগলকে দেখা যেতো একা পথ চলেছে একটি মস্তো বড়ো শাদা ঘোড়ায় চড়ে। শাদা রেশমের আংরাখা আর শাদা চুড়িদার পায়জামা, গায়ে ভেলভেটের উপর জরির কাজ করা জাকিট, পায়ে জরির নাগরাই আর মাথায় একপাশে কাতকরা জরির টুপিতে খুব সুন্দর দেখাতো তাকে। সব সময় তাকে এ পোশাকেই দেখতাম। ব্রীচেস্ পরে ঘোড়ায় চড়তে তাকে কোনোদিন দেখিনি। পরে একদিন আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো হাজী আহ্‌মদ মাহ্‌দী,

সেকালের রেঙ্গুনের একজন মস্ত ব্যবসায়ী। আলাপ হোলো তার সিকাই-মণ্ডণ্ড-টওলে-স্ট্রীটের বাড়িতে। শুনলাম সে বাহাদুর-শার নাতি। সরকারী ভাতা সে যা পেতো তাতে তার আদব কায়দা বজায় রেখে দিন চালানো সম্ভব হোতো না। তবু সে কোনোদিন কারো কাছে মাথা নোয়ায় নি।"

"আমাদের কেউ কোনোদিন কারো সামনে শির ঝুঁকায়নি," একটু হেসে উত্তর দিলো দিলওয়ার বক্‌স্।

আমি বললাম, "শুনেছি দিল্লীতেও নাকি কয়েকজন আছে। ওদেরও অবস্থা ভালো নয়।"

"ওদের অনেকেই ঠিক আমাদের ঘরের লোক নয়। শাহী আমলেও ওরা লালকেল্লার ভেতরেই থাকতো, কিন্তু অবস্থা ভালো ছিলো না, যদিও ওদের প্রত্যেকেই আগের দিনের কোনো না কোনো শাহজাদার বংশধর। ওদের বলা হয় সালাতিন।"

"হ্যাঁ, এই যেমন ধরো বাদশাহ্ জাহাঙ্গীরের বড়ো ছেলে শাহজাদা খসরুর ছেলে দাওয়র বক্‌স্এর বংশধরেরা," বলে উঠলেন প্রসন্ন বাবু, "আওরংজেবের ছোটো ছেলে শাহজাদা কাম-বক্‌স্এর নাতি শাহ্-সুলতান্এর বংশধরেরা, কে এখন এদের খবর রাখে।"

"ওরা সবাই সালাতিন," বললো দিলওয়ার বক্‌স্, "প্রায় কারো অবস্থাই ভালো নয়।"

"এখানে একজনকে আমি চিনতাম," আস্তে আস্তে বললেন প্রসন্ন বাবু, "মীর্জা মহম্মদ শারিয়র। আমার সঙ্গে খুব ভাব ছিলো। প্রত্যেকদিন সন্ধ্যেবেলা ফিশে-স্কোয়ারে বেড়াতে আসতো। তার আর্থিক দুরবস্থা খুব। তবু সে কোনোদিন চাকরি করলো না কোথাও,—যদিও সে চাইলে যে কোনো বড়ো ফার্মে ভালো কাজ পেয়ে যেতো। ব্যবসায় নামলো না,—যদিও ব্যবসা করলে রেঙ্গুনের ভারতীয় ধনীদের সহায়তা পেতো খুব। সে চাইলে কি না করতে পারতো। রেঙ্গুন তখন নতুন গড়ে উঠছে। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের হাতে দেদার পয়সা। তাদের চোখের সামনে একজন মোগল দুরবস্থায়

দিন কাটাবে, এ কিছুতেই হতে পারতো না যদি কেউ জানতে পারতো। আমি তাকে কতোবার বলেছি, এসো, তুমি আর আমি একসঙ্গে ব্যবসা করি। কিন্তু সে রাজী হোলো না। মোগল রাজ-বংশে তার জন্ম। সে করবে ব্যবসা? সে করবে চাকরি? অন্য লোকের কাছে সে বলতে যাবে তার অভাবের কথা?—একদিন দেখলাম সে আর আসছে না। তার কোনো পাত্তা নেই। আমি অনেকের কাছে ওর খোঁজ করেছি। কিন্তু কেউ কোনো খবর দিতে পারে নি।"

দিলওয়ার একটু ম্লান হাসলো। বললো, "উনি আমার চাচা। ওঁর থাইসিস হয়েছিলো। মারা যাওয়ার আগে ভুগেছিলেন বছর তিন। ওষুধের দাম জুটতো না।"

"মীর্জা সাহেব তোমার চাচা!" প্রসন্ন বাবু চোখ তুলে তাকালেন দিলওয়ারের দিকে। চুপ করে রইলেন একটুখানি। তারপর বললেন, "অদ্ভুত খেয়ালী লোক। বিয়ে করেনি কোনোদিন। সে বলতো, আমার বরাবর খানদানী দুলহান্ পাবো কোথায়? বিৎমিনডাইন অঞ্চলে তার একজন বর্মী রক্ষিতা ছিলো। তাকে নিয়েই খুশী থাকতো সে।"

"ও খবরটা ঠিক নয়," আস্তে আস্তে বললো দিলওয়ার বক্স্, চাচা-সাহাব্ মারা যাওয়ার বছর দুয়েক আগে বিয়ে করেছিলো তাঁর এক চাচেরা বোন্‌কে। কিন্তু মেয়েটি ছিলো পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অথর্ব। তবু করেছিল।"

অনেকদিন আগে খোঁজ-হারানো এক পূর্ব-পরিচিতের জীবনের পরিণতির খবর পেয়ে বিষণ্ণ হয়ে গেলেন প্রসন্নবাবু। আনমনে তাকিয়ে রইলেন জানলার বাইরের আকাশের দিকে, যেখান থেকে দেখা যায় বোটাটংএর প্যাগোডা। কিন্তু বেশীক্ষণ বিমর্ষ হয়ে থাকবার লোক প্রসন্নবাবু নন্। আবার আস্তে আস্তে শুরু করলেন পুরোনো দিনের গল্প। একথা সেকথার পর আবার ফিরে এলেন বাহাদুর-শা'র ছেলেদের প্রসঙ্গে।

"সেবার যখন লর্ড কার্জন রেঙ্গুনে এলো, দরবারে আমন্ত্রণ এলো বাহাদুর শা-র নাতির। সে গেল না। বললো, ওর কাছে কী যাবো? ও একজন সুবাদার, আমি বাদশাহ্‌র নাতি, আমি যাবো ওর কাছে? কিছুতেই গেল না। গেলে হয়তো তার আর্থিক দুরবস্থা কিছু ঘুচতো, হয়তো বাড়িয়ে দেওয়া হোতো তার মাসোহারা। কিন্তু সে কারো কথা কানে তুললো না।—তারপর প্রিন্স অফ্‌ ওয়েল্‌স্‌ যখন এলো, সেটা বোধ হয় উনিশ শো পাঁচ কি ছয়, বর্মার লেফটেনাণ্ট গভর্নরের এ-ডি-সি এসে তাকে ইংরেজ রাজপুত্রের আমন্ত্রণ জানালো। সে গেল না। বললো,—আমি যেতে পারবো না। কিন্তু আমার এখানে উনি যদি আসেন, আমি খুব খুশী হবো। রেঙ্গুনের গভর্নমেণ্ট হাউসের সবাই একথা শুনে মুচকি হাসলো, কিন্তু তার সঙ্গে গোপনে দেখা করতে গেল প্রিন্স অফ্‌ ওয়েলস্‌। কিন্তু দেখা হোলো না। যে সময়ে যাওয়ার কথা ছিলো, কোনো কারণে সেই সময় রাখা গেল না। পৌঁছতে দেরি হয়ে গেল। বাহাদুর শা'র নাতি তখন আর বাড়িতে নেই, ঘোড়ায় চেপে হাওয়া খেতে বেরিয়েছে স্ট্র্যাণ্ড রোডে।"

কিছুক্ষণ পরে দিলওয়ার বক্‌স্‌ উঠে পড়লো।

পজুনডওঙ অঞ্চল বড্ড নোংরা। চারদিকে অনেক কাঠের গোলা আর তেলের ঘানি। পথের দুপাশে ছোটো ছোটো দোতলা কাঠের বাড়ি, কয়েকটা পুরোনো পাকাবাড়ি দেখা যায় মাঝে মাঝে। চায়ের দোকান, দিশী ওষুধের দোকান, মাংসের দোকান, মনোহারী দোকানে ঠাসাঠাসি। ফুটপাত জুড়ে ছেলে-মেয়ে-হকারের ভিড়, কেউ বিক্রি করছে ভাজা সিম, মোহেইঙ্গা, ডিম সেদ্ধ, জলে ভেজানো সিমের দানা, কেউ বিক্রি করছে শুঁটকি মাছ, তরকারী আর মাটির কুঁজো। আগে অনেক চাটগেঁয়ে মুসলমান আর দক্ষিণ ভারতীয় কোরঙ্গী থাকতো এ অঞ্চলে। দাঙ্গার সময় সবাই চলে গিয়েছিলো এখান থেকে, এখন আবার ফিরতে শুরু করেছে দু-চার দশজন করে। কোরঙ্গী রিকশওয়ালা কি হিন্দুস্থানী মুসলমান গাড়িওয়ালা এ পাড়ায় সওয়ারি আনতে আর ভয় পায়না। পান-সিগারেটের গুমতিগুলিও খুলতে শুরু করেছে একটি দুটি করে। পথের বর্মী ও চীনে জনতার মধ্যে কিছু কিছু ভারতীয়ও দেখা যায় মাঝে মাঝে।

দুটি রিকশর আড়তের মাঝখান দিয়ে একটা সরু গলি ভেতরে ঢুকে গেছে। পথের দুপাশে খোলা ড্রেন। বেশির ভাগ একতলা বাড়ি বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরী। অধিবাসীরা প্রায় সবাই বর্মী। সে পথ ধরে খানিকটা গিয়ে একটা বাঁকের মুখে মা-য়িন-ম্যার বাড়ি।

দোতলা, কাঠের বাড়ি। পথ থেকে কাঠের সিঁড়ি সোজা দোতলায় উঠে গেছে। একতলার একপাশে এক মাদ্রাজী হোমিও-

প্যাথ ডাক্তার তার সাইনবোর্ড ঝুলিয়েছে। অন্যপাশে মা-য়িন-ম্যার মায়ের ছোট্টো একটুখানি দোকান,—সেখানে নানারকম টুকিটাকি জিনিসপত্র, চুরুট, কাগজ, খাতা, পেন্সিল, কালি, এইসব। দোতলার সামনের দিকের একটি ঘর নিয়েছে অমিয় গাঙ্গুলী, কোনো মাসে ভাড়া দেয়, কোনো মাসে দেয় না। অন্য দুটো ঘরে থাকে মা-য়িন-ম্যা আর ওর মা।

একদিন বিকেল বেলা সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলাম।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে দেখি অমিয়র ঘরে তালা ঝুলছে। হয়তো নেমে চলে আসতাম, কিন্তু কাঠের সিঁড়িতে আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে মা-য়িন-ম্যার মা বেরিয়ে এলো। আমাকে চিনতো। বললো, "চলে যাচ্ছো কেন, বোসো। আমার মেয়ের কাছে অমিয়র ঘরের চাবি আছে। ও এখনি এসে পড়বে। বাজারে গেছে।" তারপর বাড়ির ভেতরে গিয়ে ডাকলো মা-য়িন-ম্যাকে।

"মা-য়িন-ম্যা য়ে, হ্যাঃ মা-য়িন-ম্যা, অমিয়র বন্ধু এসেছে, সেই বেঙ্গলী কালা। ওর ঘরের দরজাটা খুলে দিয়ে যাও।"

মা-য়িন-ম্যা বেরিয়ে এলো ওর ঘর থেকে। আমায় দেখে হেসে বললো, "তুমি? আমাদের তো তুমি ভুলে গেছ।"

আমি চোখ তুলে মা-য়িন-ম্যার দিকে তাকালাম। ওর পরনে সবুজ সিল্কের খসখসে লোন্‌জ্যি, গায়ে পাতলা অর্গাণ্ডির এন্‌জ্যি, মাথার চুলে বেলফুলের মালা জড়ানো। এই দুবছরে যেন সে আরো সুন্দর হয়েছে দেখতে।

হঠাৎ সচেতন হলাম যে, এই দুবছরে তো আমার বয়েসও আরো দু-বছর বেড়েছে। কি জানি কেন, কান দুটো একটু উত্তপ্ত মনে হোলো।

মা-য়িন-ম্যা বললো, "অমিয়র ঘরে কেন? আমিও কি তোমার বন্ধু নই? এসো, আমার ঘরে এসে বোসো।"

ওর পেছন পেছন ওর ঘরে ঢুকলাম। ঢুকে একটু অবাক হলাম। ঘর জুড়ে পাটি পাতা। এক কোনে দিলওয়ার বক্‌স্ বসে

আছে। তার পরনে একেবারে বার্মিজ পোশাক। হয়তো সে আমায় দেখে একটু বিব্রত হয়েছিলো, আমার অন্তত তাই মনে হোলো। কিন্তু সে ভাব গোপন করে সে আমার দিকে তাকিয়ে হাসলো। বললো, "তোমায় এ বাড়িতে দেখলাম অনেকদিন পরে।"

"ও তো আসে না আজকাল," বললো মা-য়িন-ম্যা, তারপর ল্যাকারের কাজ করা পানের বাটা আর পোলো সিগারেটের বাক্স রাখলো আমার সামনে। জিজ্ঞেস করলো, "ল্য-ফে খাবে?"

আমি জানালাম, এই অসময়ে চায়ের হাঙ্গামা করার কোনো প্রয়োজন নেই, কিন্তু শুনলাম চা বাড়িতে তৈরী হবে না, মোড়ের দোকান থেকে নিয়ে আসবে মা-য়িন-ম্যার ঝি মা-খিন-চ্যি।

কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর দিলওয়ার চলে গেল। অমিয়র সঙ্গে দেখা না করেই চলে গেল বলে আমি একটু অবাক হলাম। মা-য়িন-ম্যা বুঝলো আমার বিস্ময়, বললো, "দিলওয়ার সাহাব আবার আসবে। ওর একটু কাজ আছে। তাই চলে গেছে।"

আমি কি বলবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। তাই পুনরাবৃত্তি করলাম, "অমিয় আসবে কখন?"

"এখনি আসবে," বলে মা-য়িন-ম্যা হেসে ফেললো, বললো, "তুমি অনেকদিন আসোনি। কেন আসোনি? অমিয় প্রায়ই বলে তোমার কথা। পোয়েতে তোমার সঙ্গে ওর দেখা না হলে তোমার হয়তো মনেই পড়তো না আমাদের কথা।"

"তা-নয়," আমি বললাম, "অমিয়র কথা আমার মনে হোতো সবসময়, কিন্তু আমি ভেবেছিলাম অমিয় হয়তো এখানে আর থাকে না, এখান থেকে উঠে গেছে।"

"আমার এখান থেকে? অমিয়?" সে যেন অবাক হোলো আমার মুখ থেকে এরকম একটা অসম্ভব সম্ভাবনার কথা শুনে।

মা-য়িন-ম্যাকে ছেড়ে চলে যাওয়া অমিয়র পক্ষে হয়তো সম্ভব, কিন্তু অমিয়কে চলে যেতে দেওয়া যে মা-য়িন-ম্যার পক্ষে সম্ভব নয়

স্নেকথা জানতাম, যদিও এই অনুরাগের গভীরতা উপলব্ধি করবার বয়েস তখনো হয়নি।

"এসব জায়গায় তো খুব দাঙ্গা হয়েছিলো," আমি বললাম।

"তা হোক না," উত্তর দিলো মা-য়িন-ম্যা, "যতোক্ষণ অমিয় আমার বাড়িতে আছে, ততক্ষণ এ অঞ্চলে কারো সাহস নেই অমিয়কে কিছু করে।"

"কিন্তু শহরের ইণ্ডিয়ান কোয়ার্টার্সে যাওয়া আসা করবার পথ তো সব বার্মিজ মহল্লার ভিতর দিয়ে। ওর অসুবিধে হোতো না?"

"ওকে আমি বাড়ি থেকে বেরোতে দিতাম না।"

"ওর বাড়ির লোকের নিশ্চয়ই ভাবনা হোতো ওর জন্যে।"

"প্রথম কিছুদিন হয়েছিলো। ওর মা চিঠি লিখেছিলো ওকে, লোক পাঠিয়েছিলো। বলেছিলো কিছুদিন ওদের সঙ্গে গিয়ে থাকতে।"

"ও বুঝি যেতে চায়নি?"

"আমিই যেতে দিইনি।"

মা-য়িন-ম্যা বললো খুব সহজ সুরে, কিন্তু আমার কানে কথাটা খুব নির্মম শোনালো। আমি কিছু বললাম না, শুধু চোখ তুলে একবার মা-য়িন-ম্যার দিকে তাকালাম।

মা-য়িন-ম্যা একটি সিগারেট ধরালো, তারপর জিজ্ঞেস করলো, "দাঙ্গা তো থেমে গেছে অনেকদিন। তুমি এদ্দিন আসোনি কেন?"

"ভেবেছিলাম, হয়তো অমিয় এখানে থাকেনা, এখানে এসে তাকে পাবোনা। তাই আসিনি।"

"অমিয়কে না পেলে আমাকে তো পেতে।"

একথার কোনো উত্তর হয়না, তাই চুপ করে রইলাম।

মা-য়িন-ম্যা হাসলো। বললো, "কেন? শুধু অমিয় তোমার বন্ধু, আমি তোমার বন্ধু নই?"

আমিও হেসে উত্তর দিলাম, "তুমি আমার বন্ধুর বন্ধু, সুতরাং আমার বন্ধু তো বটেই। তবে শুধু তোমার কাছেই যে আসতে পারতাম, সে কথা কোনোদিন খেয়াল হয়নি।"

"মাঝে মাঝে আমার কাছেও এসো," বলে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো মা-য়িন-ম্যা।

ওর আর আমার ধাত এত আলাদা যে বেশীক্ষণ কথা বলবার মতো কিছু থাকে না। কি বলবো ভেবে না পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, অমিয়র গান তোমার ভালো লাগে?"

মা-য়িন-ম্যা তাকালো আমার দিকে, জিজ্ঞেস করলো, "কেন ভালো লাগবে না?"

"দেখ, ও যে ধরনের গান গায়, সে তো সবার ভালো লাগবার কথা নয়। ইণ্ডিয়ানদের ভালো লাগে। তোমরা এদেশের লোক। তোমাদের ও গান ভালো লাগে বলে তো শুনিনি।"

মা-য়িন-ম্যা আস্তে আস্তে উত্তর দিলো, "দেখ, আমার বাবা চাটগাঁওএর মুসলমান। গজল কাওয়ালি গাইতে পারতো। ওঁর গান অনেক শুনেছি। বাবার গ্রামোফোন ছিলো। অনেক রেকর্ড ছিলো। অনেক গান শুনেছি, শুনে শুনে অনেক গান নিজেও গাইতাম। আমি উর্দু বুঝি, একটু একটু বলতেও পারি। অমিয়কে ভালো লেগেছিলো ওর গান শুনে। ওর গান যতো শুনি, ততো বেশী ভালো লাগে।"

"কিন্তু তুমি তো পোয়ে নাচো।"

"হ্যাঁ। আমার মায়ের বোন পোয়ে নাচতো, প্রথমে ওর কাছে শিখেছি, তারপর ওর সায়া-জীর কাছে শিখেছি।"

সায়া মানে গুরু। পেশাদারী লোক, প্রথমে এমনি খেয়ালের বসে শিখতে গিয়ে, পরে সেটা মা-য়িন-ম্যারও পেশা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল।

"তোমার বন্ধু আসছে" বললো মা-য়িন-ম্যা, তারপর একটু থেমে বললো, "অমিয় বাড়ি থাকুক বা না থাকুক, তুমি মাঝে মাঝে আমার কাছে এসো।"

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। আমায় দেখে অমিয় খুব খুশি। বললো, "তুমি এসেছো, ভালোই হয়েছে। আজ আমার এখানে

গান বাজনা হবে। বালাজী আর আলি মহম্মদ আসছে, বোধ হয় দিলওয়ারও আসবে।"

অমিয়র পরনে সিল্কের লুঙ্গি আর শার্ট, শার্টের নিচের দিকটা বর্মাদেশের ধরনে লুঙ্গির ভেতরে ঢুকিয়ে দেওয়া। চুল কিন্তু লম্বা, কানের দুপাশ দিয়ে ছড়ানো। দেখলে বাঙালী বলে চেনা যায় না, জেরবাদী মুসলমানদের মতো দেখায়।

অন্য সবার আসতে দেরি ছিলো। আমি অনেকদিন অমিয়র গান শুনিনি। তাকে সেকথা বলতে সে হারমোনিয়াম টেনে নিয়ে একটি উর্দু গজল শোনালো।

হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা অমিয়, তুমি এই বিদেশে পচে মরছো কেন? তার চাইতে বরং কলকাতায় চলে যাও। ওখানে তোমার গানের আদর হবে।"

অমিয় একটু উদাস হয়ে গেল। জানলা দিয়ে তাকালো বাইরের আকাশের দিকে, তারপর আস্তে আস্তে বললো, "মা-ও সেকথা বলছিলো।"

"যাচ্ছো না কেন? ওখানে গানের রেকর্ড করতে পারবে, রেডিওতে গাইতে পারবে, মাইফিলে গাইতে পারবে।"

"সব চেয়ে বড়ো কথা, আরো ভালো করে শিখতে পারবো।"

"এদেশে কজনই বা তোমার গান বুঝতে পারবে। তার উপর এদেশের যা অবস্থা, ইণ্ডিয়ানরা বেশীদিন এখানে থাকতে পারবে বলে তো মনে হচ্ছে না।"

"মা-য়িন-ম্যাকে বলেছিলাম," অমিয় আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে উত্তর দিলো, "ও আমায় কোথাও যেতে দিতে চায়না।"

"কোথায় যেতে দিতে চাই না?" জিজ্ঞেস করলো মা-য়িন-ম্যা। সে কখন ঘরে ঢুকেছে আমরা টের পাইনি।

অমিয় চুপ করে রইলো। আমি বললাম, "অমিয় যদি কলকাতায় যায়, খুব নাম করতে পারবে।"

মা-য়িন-ম্যা আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করলো। তারপর

বললো। "ও যদি আমার কাছ থেকে চলে যায়, ও খেতে পাবে না।"

অমিয়র মুখ অন্ধকার হয়ে গেল। মা-য়িন-ম্যা বলে গেল, "শুধু ভালো গাইতে পারলেই তো নাম হয় না। যাদের সাহায্য পেলে নাম হয়, তাদের সঙ্গে কি করে যোগাযোগ করতে হয় সেটাও জানা দরকার। অমিয় ওসব জানেও না, ওসবের ধারও ধারে না। এই রেঙ্গুন শহরের বাঙালীরা ওর নাম করে না, কলকাতার বাঙালী করবে ?"

"রেঙ্গুন শহরের বাঙালীরা করে না, তার অন্য কারণ আছে," আমার মুখ থেকে বেফাঁস বেরিয়ে গেল। কিন্তু অমিয় আমার কথা গায়ে মাখলো না।

মা-য়িন-ম্যা একটু গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, "কলকাতার কথা আমি খুব জানি। আমার ফুফার মরদ ওখানে থাকে। সে বলেছে কলকাতায় কেউ কাউকে পোঁছে না। এখানে অমিয়কে একলা ছেড়ে দিতে আমি পারবো না।"

"তুমিও যাওনা সঙ্গে," আমি বললাম।

"আমি ? তাহলে পয়সা কামাবে কে ?"

মা-য়িন-ম্যার কথা শুনে আমার একটু রাগ হোলো। বললাম, "অমিয় কি তাহলে সারাজীবন তোমার কাছে পড়ে থাকবে নাকি ?"

"যদি থাকতে পারে তো সারাজীবন ওর সুখেই কাটবে। থাকা খাওয়ার ভাবনা নেই, নিজের খুশী মতো গান গাইতে পারে, কারো খোসামোদ করতে হয় না, ব্যস আর কি চাই ?"

থাকা খাওয়ার ভাবনা নেই, নিজের খুশি মতো গান গাইতে পারে, কারো খোসামোদ করতে হয়না, সবই সত্যি। কিন্তু অমিয়র মুখ দেখে কেমন যেন মনে হোলো, ও খুব সুখে নেই।

বালাজী রাও আর আলি মহম্মদ এসে পড়লো কিছুক্ষণের মধ্যেই। ওদের সঙ্গে এলো ওদের আরো তিনজন বন্ধু, ইউসুফ

হারুণ, বিষ্ণু ত্রিবেদী আর রাজকুমার কাপুর। বিষ্ণু ত্রিবেদী গান গাইতে পারে অল্পসল্প, তার সঙ্গে তবলা সঙ্গত করতে বসলো বালাজী রাও। ওর দুটো গানের পর তানপুরো নিয়ে অমিয় মালগুঞ্জর আলাপ ধরলো। সঙ্গে সঙ্গে মুখের উপর থেকে মুছে গেল ওর এতক্ষণের বিষাদ।

মা-য়িন-ম্যা পানের বাটা আর সিগারেট রেখে চলে গেল। চা নিয়ে এলো ওর চাকরানি মা-খিন-চ্যি।

বালাজীর তবলা আর আলি মহম্মদের সারেঙ্গির সঙ্গে খুব জমে উঠলো অমিয়র গান। এমন সময় আস্তে আস্তে ঘরের ভেতর ঢুকলো দিলওয়ার বক্‌স্‌। তখন দ্রুত ধরেছে অমিয়। দিলওয়ার আমার পাশে বসে পড়লো। একটি সিগারেট ধরালো সে, তারপর আস্তে আস্তে বললো, "ভাই সাহাব, অমিয় কি জানে, আমি আগে একবার এসে ঘুরে গেছি?"

আমি একটু অবাক হয়ে দিলওয়ারের দিকে তাকালাম, বললাম, "বোধ হয় জানেনা। আমিও বলিনি, মা-য়িন-ম্যাও বলেনি। কেন?"

"তুমি কিছু বোলো না," দিলওয়ার বললো।

"কেন?"

"এমনি।"

মা-য়িন-ম্যা যখন আবার ঘরে ঢুকলো, দিলওয়ারকে দেখে এমন কিছু ভাব দেখালো না যে তাকে এই দ্বিতীয়বার দেখেছে। শুধু জিজ্ঞেস করলো, "চা খাবে?"

অমিয় শুনতে পেলো না কোনো কথা, কিন্তু একবার আমার দিকে একবার দিলওয়ারের দিকে, তারপর মা-য়িন-ম্যার দিকে তাকালো। মালগুঞ্জ শেষ করে একটি ঠুম্‌রি ধরলো সে।

গানের আসর যখন শেষ হোলো তখন সাতটা বেজে গেছে। অন্য সবাই হয়তো আরো কিছুক্ষণ বসে গল্পসল্প করবে, কিন্তু আমি উঠে পড়লাম। পরদিন ইতিহাসের টিউটোরিয়াল ক্লাস আছে।

একজন নতুন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে টিউটার এসেছে, বড্ড বকুনি দেয়। সুতরাং তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে পড়াশুনা করতে হবে।

আমার সঙ্গে সঙ্গে দিলওয়ারও উঠে পড়লো। বাইরে এসে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি কদ্দুর যাবে?"

"স্পার্কস্ স্ট্রীট," আমি বললাম।

"আমিও ওদিকে যাচ্ছি," বলে সে একটি ঘোড়ার গাড়ি ডাকলো, "চলো তোমায় নামিয়ে দিয়ে যাবো।"

পজুনডওণ্ড অঞ্চল ছাড়িয়ে টমসন স্ট্রীটের ভেতর দিয়ে এসে ডেলহাউসি স্ট্রীটে পড়লাম। এ অঞ্চলটা খুব নিরিবিলি, সন্ধ্যে হতে না হতেই প্রায় নির্জন হয়ে যায়। প্রশস্ত পথে কখনো সখনো পাশ কাটিয়ে যায় দ্রুত আর-ই-টি বাস, নয়তো বা মন্থর রিকশ। কোনো বাড়ির সামনে দিয়ে একটুখানি কানে আসে টুং টাং পিয়ানো বাজছে, কখনো বা কোনো রাস্তার মোড়ে শোনা যায় কোনো বার্মিজ ভবঘুরের ম্যাণ্ডোলিন।

জনহীন পথ ধরে আস্তে আস্তে ছুটছিলো ঘোড়ার গাড়ি। অনেকক্ষণ আমরা দুজন কেউ কোনো কথা বলিনি। ক্রীক স্ট্রীট, ফর্টি-এইট্থ্ স্ট্রীট, ফর্টিসেভেন্থ্ স্ট্রীট, ফর্টিসিকস্থ্ স্ট্রীট পেরিয়ে বৈজনাথ হল বাঁয়ে রেখে যখন জুডাহ্-ঈজিকেল স্ট্রীটের কাছে এসে পৌঁছলাম, দিলওয়ার বক্স্ হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "তোমার গান শুনতে ভালো লাগে?"

"হ্যাঁ," আমি উত্তর দিলাম।

"যদি শুনতে চাও তো দিল্লীর মুজরাওয়ালির মুখে ভালো ঠুম্‌রি শোনাতে পারি।"

"দিল্লীর মুজরাওয়ালি? রেঙ্গুনে দিল্লীর মুজরাওয়ালি কোত্থেকে এলো?"

দিলওয়ার হাসলো। বললো, "শুনতে চাও কি না বলো না।"

"আজ নয়। আরেকদিন।" আমি বললাম। কৌতূহল হচ্ছিলো খুব। কিন্তু সে সময় মাকে বা বাবাকে না বলে রাত্তিরে বেশীক্ষণ বাইরে থাকা যায় না। বাড়ি ফিরতে হয় আটটার মধ্যে,

সিনেমায় যাবো বলে আগের থেকে জানিয়ে রাখলে বাইরে থাকা যায় বড় জোর দশটা পর্যন্ত।

সেদিন যাইনি, কিন্তু তারপরদিন বিকেলবেলা দিল্লীর মুজরা-ওয়ালির ঠুম্‌রি শুনতে গেলাম দিলওয়ারের সঙ্গে। কথা ছিলো সুলে-প্যাগোডা রোডে কন্টিনেণ্ট্যাল হোটেলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবো, দিলওয়ার এসে আমায় তুলে নিয়ে যাবে। গিয়ে দেখি দিলওয়ারই অপেক্ষা করছে আমার জন্যে।

ফ্রেজার স্ট্রীট দিয়ে ইলেকট্রিক ট্রলি-বাস যায় পশ্চিম রেঙ্গুনের দিকে। কিন্তু বাসে উঠতে চাইলো না দিলওয়ার। একটি ঘোড়ার গাড়ি করলো। বললো, "আমার গাড়ি চড়তে ভালো লাগে।"

পরে জেনেছিলাম দিলওয়ার ট্রাম, বাস কি রিকশতে চড়ে না। হয় ঘোড়ার গাড়ি, নয়তো বা ট্যাক্সি।

সিকাই-মওঙ-টও-লে স্ট্রীট তখনকার দিনে ভারতীয় মহলে পরিচিত ছিলো মাসুদী-গলি নামে। এককালে এই রাস্তায় থাকতো হাজি আহ্‌মদ মাসুদী নামে এক ধনকুবের। সেই অঞ্চলে দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিলো তার পরিবারের সবারই। এ সময় এই অঞ্চলে থাকতো বেশির ভাগ উত্তর ভারতীয় মুসলমান, রিভার-ব্লকের দিকে কিছু কিছু বার্মিজ ও চীনা দেখা যেতো। সেই রাস্তায় রেলওয়ে-ব্লকে একটি বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামলো।

তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। পথে লোকজনের ভিড়। তার মধ্যে দিয়ে আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে ঘোড়ার গাড়ি, রিকশ, কখনো বা একটা দুটো পুরোনো মডেলের গাড়ি। মোড়ের কাছে দক্ষিণ ভারতীয় চোলিয়া মুসলমানের রেস্তরাঁ, এদেশে বলে কাকা-টী-শপ্। সেখানে চোঙ বসানো সেকেলে গ্রামোফোনে বাজছে উর্দু গজল। তন্দুরে নান্‌-রুটি শেঁকা হচ্ছে অনবরত। ভেতরের ভিড় বাইরের পথে উপচে পড়েছে। পথের উপর টিনের চেয়ারে বসে পিরিচে ঢেলে চা খেতে খেতে গল্প করছে মাথায় রেশমী রুমাল

বাঁধা কয়েকজন মুসলমান। রাস্তায় সিগারেটের খালি বাক্স বাজী ধরে মার্বেল খেলছে কয়েকটি লুঙ্গি পরা ন্যাড়া মাথা ছেলে। দূরে একটি ল্যাম্পপোস্টের নিচে ভাঙা হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে এক পশ্চিমা মুসলমান, তার গানের সঙ্গে সঙ্গে পায়ের ঘুঙুর বাজিয়ে অঙ্গভঙ্গি করছে জরির টুপি আর জরির কাজ করা জাকিট পরা একটি দশবারো বছরের শীর্ণ মেয়ে।

গাড়ির থেকে নেমে দেখি সামনে একটি ছোটো দোতলা বাড়ি। রাস্তা থেকে সোজা কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে। উপরে বারান্দায় নানা রঙের রঙীন কাচের জানলার শার্সী। জানলাগুলি সব বন্ধ। ভেতরে আলো জ্বলছে।

নিচে সিঁড়ির সামনে একটি টুলের উপর বসেছিলো এক মুসলমান, পরনে সরু পায়জামা, মাথায় চিকনের কাজ করা শাদা কাপড়ের টুপি, হাতে হান্টার। কানের পাশ দিয়ে ঝাঁকড়া চুল ঘাড়ের উপর এসে পড়েছে। দিলওয়ারকে দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে তসলিম জানালো। তারপর তাকালে আমার দিকে। একটু যেন বিস্ময় ফুটে উঠলো তার দুটো ক্রূর চোখে।

আমাদের আগে আগে সে উঠে গেল সিঁড়ি দিয়ে, দোতলায় উঠে দরজাটা ঠেলে তুলে ধরলো। সে দরজা পুরোনো ধরনের, দোতলার মেঝের সঙ্গে লম্ব অবস্থায় নয়, মেঝের সঙ্গে সমক্ষেত্র। সিঁড়ির মুখে দোতলার মেঝেতে একটা আয়তক্ষেত্র কেটে সেখানে দরজা বসানো হয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে উঠে দরজাটা উপর দিকে ঠেলে তুলে তবে ভেতরে যাওয়া যায়।

আমরা দোতলায় উঠে আসতেই সে নিচের থেকে আবার দরজাটা নামিয়ে বন্ধ করে দিলো।

সামনে চওড়া বারান্দা। মেঝের উপর রঙবেরঙের নক্সা আঁকা মাদুর বিছানো। একপাশে একটি পেতলের পিকদান। সেখানে বসে একটি মেয়ে হাতে মেহেদী লাগাচ্ছিলো। তাকে দেখে দিলওয়ার জিজ্ঞেস করলো, "ছোটী বিবিজান কোথায় ?"

আমায় নতুন দেখে মেয়েটি বার বার তাকাচ্ছিলো আমার দিকে। ওর কথার কোনো উত্তর দিলো না। হাত দিয়ে ঘরের দরজাটা দেখিয়ে দিলো।

ঘরের দরজায় লাল-নীল-সবুজ কাচের লম্বা লম্বা পুঁতির পর্দা ঝুলছে। বাইরে জুতো রেখে দিলওয়ার ঘরের ভিতর ঢুকলো পেছন পেছন ঢুকলাম আমি।

ঘরের ভিতর কার্পেট বিছানো, একদিকে কয়েকটি তাকিয়া সাজানো। মাঝখানে পা মুড়ে বসেছিলো একটি মেয়ে। তার চোখে সুর্মা, হাতে মেহেদী, পরনে পেশোয়াজ, জাকিট ওড়নি, মাথায় জরির টুপি। দিলওয়ারকে দেখে উঠে দাঁড়িয়ে তসলিম জানালো। দিলওয়ার বসে পড়লো একটি তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে।

"তশরীফ রাখিয়ে," মেয়েটি বললো আমায়। খুব মিহি মিষ্টি তার গলা।

আমি বুঝতে না পেরে দিলওয়ারের দিকে তাকালাম।

সে হেসে বললো, "বোসো।"

আমিও জড়োসড়ো হয়ে বসলাম একপাশে।

"শিরীজান," দিলওয়ার বললো সেই মেয়েটিকে, "একে তোমার গান শোনাতে নিয়ে এলাম। এ আমার খুব প্যারা দোস্ত।"

"সপরদাদের ইত্তলা দেবো?" জিজ্ঞেস করলো শিরী।

"ওদের দরকার নেই। হারমোনিয়াম নিয়ে তুমি এমনিই গাও।"

পর পর দুটো গান শোনালো শিরী। ফরাশ এসে দিলওয়ারের সামনে রুপোর গড়গড়া রেখে গেল।

"গান কিরকম লাগলো?" দিলওয়ার জিজ্ঞেস করলো আমাকে।

"ভালো," আমি বললাম। কিন্তু গান আমি সত্যি সত্যি শুনিনি। গানে আমার মন ছিলোনা। খুব অসোয়াস্তি বোধ করছিলাম। মুজরাওয়ালী কি জিনিষ, সেটা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ করবার জন্যে দিলওয়ারের সঙ্গে এসেছি নিজের ইচ্ছেতেই, সুতরাং সে জন্যে মনে

কোনো অপরাধবোধ ছিলো না। তাই বসে বসে ভাবছিলাম কেন আমার এই অসোয়াস্তি।

সেদিন ঠিক বুঝতে পারিনি। সঠিকভাবে আত্মবিশ্লেষণ করবার মতো বয়স হয়নি তখনো। আজ বেশ বুঝতে পারি যে, সেই অসামাজিক পরিবেশের জন্যে মন তখনো প্রস্তুত হয়নি। সেই বয়েসের মন বেশী রোমান্টিক। তার উপর, সে সময়টা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগেকার, যুদ্ধোত্তর জীবনের তিক্ততা ও বস্তুতান্ত্রিকতা তখনো সঞ্চারিত হয়নি অল্পবয়েসীদের মনে। বিদেশী সমাজ-পরিবেশে মন যতোই উদারপন্থী হোক, তবু তার একটা মধ্যবিত্ত সংস্কার আছে, সেটা সেই বয়েসে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়।—আর, সেটা পারছিলাম না বলেই অসোয়াস্তি বোধ করছিলাম।

সেদিন ভেবেছিলাম, বোধ হয় অসোয়াস্তি বোধ করছিলাম দিলওয়ারের ব্যবহারে। ওর সঙ্গে আমার এমন কিছু অন্তরঙ্গতা নেই ,তবু কেন আমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করবার জন্যে তার এত আগ্রহ ? —সেদিন এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাইনি, তবে আঁচ করতে পেরে-ছিলাম আরো কিছুদিন পরে।

দিলওয়ার হয়তো বুঝতে পেরেছিলো আমি কি ভাবছি। শুনলাম সে শিরীকে বলছে, "এ বয়েসে আমার চাইতে ছোটো হলেও, আমার খুব বন্ধু। বেশীদিনের আলাপ নয়, তবু এর সঙ্গে মিশতে কথা বলতে আমার যতো ভালো লাগে ততো আর কারো সঙ্গে ভালো লাগে না। এর এক চাচা আমার ব্যবসায় আমাকে খুব মদত করেন। এখানে এসে এর যদি আজ ভালো লেগে থাকে তা-হলে আমিও খুব খুশি হবো।"

শিরী আমার দিকে ফিরে তসলিম জানালো, বললো, "আপনি আমার এখানে তশরীফ এনেছেন, সে আপনার অনেক মেহেরবাণী।" তারপর পান-সাজানো রুপোর রেকাবি আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললো, "গিলৌরী ফরমাইয়ে।"

আমার ভালো লাগছিলো না, কিন্তু নতুন লাগছিলো। মনের কুণ্ঠা মনে চেপে পান তুলে নিলাম।

এমন সময় ঘরে ঢুকলো আরেকটি মেয়ে। শিরীর চাইতে বয়েসে কিছু বড়ো। ওর সঙ্গে চেহারার একটা মিল আছে। ভাবলাম, নিশ্চয়ই এর দিদি। সে আমার দিকে তাকিয়ে তসলিম জানালো একটু হেসে।

"আমার বন্ধু," আমায় দেখিয়ে দিলওয়ার বললো নবাগতাকে। আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "এ আমার সাকী।" তারপর আবার ওর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, "বলো সাকীজান, পেয়ালা ভরিয়ে দেওয়ার ইন্তেজাম করবে, না কি শুকনো মুখে বিদায় নিতে হবে আমাকে?"

আমি একটু আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। মেয়েটি উঠে যাচ্ছিলো, আমার মুখের চেহারা দেখে শিরী ওকে বললো, "বুবু-জান, এখানে নয়।"

অন্য মেয়েটি দিলওয়ারের দিকে তাকালো, হেসে ফেললো দিলওয়ার, বললো, "বেশ, আমি আর জমিলাবানু অন্য ঘরে গিয়ে বসছি।"

ওরা চলে গেল। আমি আরো আড়ষ্ট হয়ে বসলাম।

শিরী খানিকক্ষণ মুখ নিচু করে চুপ করে বসে রইলো, তারপর বললো, "আপনি খামোশ হয়ে আছেন, আমার ভালো লাগছে না। এখানে আপনার ভালো লাগছে না বুঝি?"

"তা নয়," আমি আস্তে আস্তে উত্তর দিলাম, "তবে—।"

"তবে কি?"

"—তবে তোমাদের সঙ্গে কি ভাবে কথা বলতে হয় তাতো জানিনা, তাই—"

শিরী হেসে ফেললো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "মীর্জা সায়েবের সঙ্গে আপনার পরিচয় খুব বেশীদিনের নয়, না?"

"হ্যাঁ।"

"আপনিও কি ব্যবসা করেন ?"

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "না তো, আমি পড়ি।"

"কোথায় ?"

"কলেজে।"

"ও।—ম্। তাহলে মীর্জা সাহেবের সঙ্গে আপনার চেনা হোলো কি করে।"

"পজুনডওঙে আমার একজন বন্ধু থাকে। সেখানে দিলওয়ার সাহেব যায় মাঝে মাঝে। সেখানে চেনা হয়েছে।"

"পজুনডওঙ্এ!" শিরীর ভুরু দুটি একটু উত্তোলিত হোলো। "সেই জেরবাদী মেয়েটির বাড়িতে ?"

এবার অবাক হওয়ার পালা আমার। জিজ্ঞেস করলাম, "মা-য়িন-ম্যাকে তুমি চেনো নাকি ?"

"চিনি না। তবে নামে জানি। সে তো দু-সাল আগে পর্যন্ত বাঁধা ছিলো মীর্জা সায়েবের কাছে। তারপর কে এক বাঙালী সাওয়াইয়ার সঙ্গে তার প্যার হোলো, সেদিন থেকে সে আর টাকা নেয়না মীর্জা সাহাব্এর কাছ থেকে। তবে মীর্জা সাহাবের এখনো নেশা ছোটেনি, সে এখনো তার কাছে যায়। কেন মিছিমিছি যায় জানিনা। জেরবাদী মেয়েদের তো সে চেনে না, এখন লাখ টাকা দিলেও সে নেবেনা।"

আমি এত খবর জানতাম না। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, "দিলওয়ার বুঝি এখানেও মাঝে মাঝে আসে ?"

"সব সময় আসে," শিরী হেসে বললো, "জমিলার সঙ্গে ওর অনেক দিনের সম্পর্ক। তাতে আমাকে ছোট বোন মানে। জমিলা আমার দিদি কিনা, তাই।"

"জমিলার সঙ্গে ওর অনেকদিনের সম্পর্ক!" আমি অবাক হয়ে বললাম, "ওদিকে মা-য়িন-ম্যার কাছেও যেতো ?"

আমার বিস্ময় দেখে শিরী কৌতুক বোধ করলো। বললো, "এতে তাজ্জব বনবার কি আছে। ওদের গায়ে শাহী-খুন বইছে, ওদের

ধাতই এরকম। শাহী দৌলত নেই, কিন্তু শাহী কায়দা আছে। মীর্জা সাহেবের বাড়িতে দুই খানদানী বিবি আছে তা-ছাড়া ছত্রিস নম্বর গলিতে একজন গুজরাতী বাঈও রেখেছে। মীর্জা সায়েব তো তবু রুপয়া কামায়, ওর অন্য রিশতা যাদের কোনো কামাঈ নেই, শুধু সরকারী মাহিনা আছে, তাদেরও আদত ভালো নয়।”

শুনে আমি চুপ করে রইলাম, তারপর জিজ্ঞেস করলাম, “তোমরা কি অনেকদিন রেঙ্গুনে আছো?”

শিরীন তাকালো আমার দিকে, বললো, “হ্যাঁ, অনেকদিন। আমার নানী-মার মাকে বর্মায় নিয়ে এসেছিলো এক সালাতিন সাহেব। এক শাহজাদা তাঁকে রেখেছিলেন। তখন থেকে আমরা এখানে। আমার নানী-মা, আমার আম্মা, আমার বুবু, আমি, আমরা সবাই এখানে পয়দা হয়েছি। আম্মা, বুবু, আমি, আমরা তো কোনোদিন মুল্‌কে যাইনি। এখন বর্মা মুল্‌কই আমাদের মুল্‌ক্।”

“দেশে যেতে ইচ্ছে করে না?”

“কার কাছে যাবো?” একটু বিষণ্ণ হেসে শিরীন উত্তর দিলো।

“এখানেই বা কে আছে?”

“যারা আছে, এখানেই আছে।”

“এদেশে থাকতে ভালো লাগে বুঝি?” আমি জিজ্ঞেস করলাম।

শিরীন আস্তে আস্তে বললো, “এ দেশের তো কিছু জানি না। রেঙ্গুনের বাইরে কোনোদিন যাইনি, এই শহরেও যা কিছু মিলনা-জুলনা সব আপনার কওমের লোকজনের সঙ্গে। এরা এই শহরে একটা ছোট্টো হিন্দুস্থান গড়ে তুলেছে। তারই মধ্যে আছি।—তবু মাঝে মাঝে মনে হয় আমরা সবাই যেন গামলার ফুলের গাছের মতো। এখানকার মাটিতে আমাদের শিকড় নেই। একটা তুফান এলেই কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে কে জানে।”

এই ভাবনা এর মনেও এসেছে?—আমি মনে মনে ভাবলাম। হিন্দুস্থান থেকে পঞ্চাশ ষাট বছরে অনেক লোক এসেছে, নানা জাতের, নানা ধরনের। ব্যবসায়ী এসেছে, মহাজন এসেছে, চাকুরে

এসেছে, আর এসেছে শ্রমিক মজুর। তাদের সামাজিক অসামাজিক চাহিদায় এসেছে নানা জাতের আগাছা পরগাছা। আস্তে আস্তে শহর ভরে গেছে ভারতীয় অধিবাসীতে। শহরের বেশির ভাগ অঞ্চলে তাদেরই সংখ্যাধিক্য। দক্ষিণ ব্রহ্মে গড়ে উঠেছে তাদের নানারকম স্বার্থ, ভুলে গেছে যে এটা বিদেশ। একদা এদেশ বৃটিশ ভারতের একটা প্রদেশ হলেও এটা যে হিন্দুস্থানের সুবা নয় সেটা মনে রাখেনি। ভারতে কংগ্রেসী আন্দোলন শুরু হয়ে গেলেও এখানকার ভারতীয়েরা বর্মীদের জাতীয়তাবাদী স্বতন্ত্রীকরণ আন্দোলনের বিরোধিতা করেছে। তার ফলে ভারতীয় আর বর্মীদের মধ্যে একটা ব্যবধান গড়ে উঠেছে উনিশ শো তিরিশের অর্থনৈতিক দুর্দিনের সময় থেকেই। সে সময় একটা তীব্র ইন্দো-বার্মিজ দাঙ্গা হয়েছিলো, তার গুরুত্ব বোঝেনি এখানকার ভারতীয়েরা। কিন্তু উনিশ শো সাঁইত্রিশে বার্মা ভারতবর্ষ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পর থেকেই ভারতীয়েরা সচকিত হতে শুরু করলো। তারা কতোখানি অসহায় সেটা বুঝতে পারলো যখন উনিশ শো উনচল্লিশে আবার সারা দেশ জুড়ে বর্মী-ভারতীয় দাঙ্গা হোলো। বর্মী পুলিশ তাদের বাঁচাতে পারলো না, বর্মার একদল নেতা খুশি হোলো মনে মনে, ভারতের বিদেশী সরকার তাদের নিরাপত্তার কোনো ব্যবস্থা করতে পারলো না। তারপর থেকে এদেশের ভারতীয় শ্রমিক, ভারতীয় মসীজীবী, ভারতীয় ছাত্র, ভারতীয় ছোটো বড়ো ব্যবসায়ী পুঁজিপতি সবাই ভাবতে শুরু করলো আত্মসম্মান বজায় রেখে এদেশে বেশীদিন নিরাপদে থাকা যাবে কিনা।

আজ এক মুজরাওয়ালীর গান শুনতে এসে তার মুখেও শুনলাম ওই একই ভাবনা।

"মীর্জা সাহেবকে বলেছিলাম একদিন, আমরা সবাই হিন্দুস্থানে ফিরে গেলে হয়।"

"কি বললো দিলওয়ার?"

"কি আর বলবে? ওর কি হুঁশ আছে? পয়সা কামাতে

পায়লে আর পয়সা ওড়াতে পারলেই খুশি, আর কিছু চায় না। বলে, যে দেশের মাটিতে আমাদের বাদশাহ শুয়ে আছে সে দেশ থেকে আমাদের কেউ বার করে দিতে পারবে না। মাঝে মাঝে বলে, যেই হিন্দুস্তানে আমাদের বাপ ঠাকুরদাদের জায়গা হয়নি, সেই হিন্দুস্তানে আমরা কেউ ফিরে যাবো না। এই বিদেশে আর দশজনের একজন হয়ে থাকতে পারি, হিন্দুস্তানে গিয়ে সেরকম থাকতে পারবো কি করে? ও-দেশের তখ্‌ত্ যে একদিন আমাদের ছিলো।"

শুনে আমি হাসলাম, শিরীনও হাসলো, বললো, "মীর্জা সাহেব বোঝে না যে এই জমানা সে জমানা নয়। জমানা বদলে গেছে। আর আসল বাত হোলো এই যে, এই জেরবাদী আউরতের নেশা যদ্দিন ওর না ছুটবে তদ্দিন ওর আর কিছু সোচবার ফুরসত নেই?"

"তোমাদের কি আর আসে যায়?"

শিরীন মৃদু দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়লো, বললো, "আমাদের কিছু আসা যাওয়ার তো কথা নয়, কিন্তু—কি জানি। শায়দ কিছু আসে যায় না। তবে ও আমাদের দেখাশোনা করে, বুবু ওকে থোড়াবহুত প্যার করে, তাই মাঝে মাঝে ভাবি, আর কি। আপনি ওর য়ার বলেই বলছি, তা নইলে এসব কথা বলতে যাবোই বা কেন?"

ভিতর থেকে দিলওয়ার আর জমিলার উচ্চকণ্ঠের হাসির আওয়াজ ভেসে এলো। শিরীন আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলো। তারপর এসে বসলো আমার কাছে।

মাথার উপরে ফ্যান ঘুরছে, কিন্তু সারামুখ ঘামে ভিজে গেল।

শিরীন একটু তাকিয়ে দেখলো আমায়, তারপর বললো, "আপনি তো শরাব খান না।"

"না।"

"আপনার সুরত দেখেই আমি সমঝে নিয়েছিলাম যে আপনি মীর্জা সাহেবের কিসিমের লোক নন্। তাই একটু তাজ্জব হয়েছিলাম ওর সঙ্গে দেখে। মীর্জা সাহেব যখন শরাব চাইলেন ওকে বুবুর

কামরায় পাঠিয়ে দিলাম। শরাব খাবেন না। ভালো চীজ নেই। খাবেন তো আরো চার পাঁচ সাল পরে খাবেন।"

আমি একটু হাসলাম।

শিরীন কি ভাবলো কে জানে, বললো, "শরাব তো খান না। তাই বলে তো কিছু না খাইয়ে আমি ছাড়বো না। চা খাবেন?"

"না।"

"ফালুদা? না বলবেন না, ফালুদা খেতে হবে। বাড়িতে বানিয়েছি।"

ফালুদার নামে রসনা সিক্ত হোলো। আর এমন আন্তরিক ভাবে সে বললো যে না বলতে পারলাম না। বাইরে যে মেয়েটিকে হাতে মেহেদি লাগাতে দেখেছিলাম সে আমাদের জন্যে দু-গ্লাস ফালুদা নিয়ে এলো।

আমি চুপচাপ ফালুদা খাচ্ছিলাম, শিরীন হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা সত্যি বলুন, আপনি কি আমার গান শুনতেই এসেছেন?"

"এ কথা কেন জিজ্ঞেস করছো?" আমি বললাম তাকে।

"আমি দেখেছি, আপনি মন দিয়ে গান শোনেননি। আপনার গান ভালো লাগছিলো না একটুও। কিন্তু আমি যে গান ভালো গাইনা, একথা তো আমায় আজ পর্যন্ত কেউ বলেনি।

আমি হেসে ফেললাম। কোনো উত্তর দিলাম না।

"আমি বলবো?" শিরীন জিজ্ঞেস করলো, "আপনি আমাদের দেখতে এসেছেন। বেশ, আজ তো দেখে গেলেন। ভালো করে গান শুনতে কবে আসবেন বলুন।"

আমি চুপ করে রইলাম।

"আপনি আর আসবেন না?"

"হয়তো আর আসবার সুযোগ হবে না," আমি আস্তে আস্তে বললাম।

"কেন?"

"আমার পক্ষে ঠিক হবে না," আমি উত্তর দিলাম।

"ও।" একটু চুপ করে রইলো শিরীন। তারপর সোজা আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "দেখুন, আমরা মুজরাওয়ালী, কসবী নই।"

কথাটা আমার মনে হঠাৎ চাবুকের মতো সপাং করে এসে লাগলো। উত্তর দিতে গিয়ে মুখ লাল হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললাম, "আমি টাকা দিয়ে গান শুনিনা।"

"কিন্তু গান তো শোনেন?"

"বন্ধুবান্ধবের গান শুনি, চেনাপরিচিতদের গান শুনি।"

শিরীন খুব সহজ হয়ে হেসে উত্তর দিলো, "জানপহচান আমার সঙ্গে তো হোলোই, আমায় দোস্ত মনে করে গান শুনতে আসবেন।"

"দোস্ত?" আমি হেসে ফেললাম। ভাবলাম, একদিনেই?

শিরীন আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলো, কি ভাবলো কে জানে, হঠাৎ বললো, "মুখে বললেই দোস্ত হয়না জানি, কিন্তু মুখে বললে বহন্ হয়। আপনি আমাকে ছোটি বহন্ মনে করেই আসবেন।"

আমি অবাক হয়ে গেলাম শিরীনের কথা শুনে। আশ্চর্য মেয়ের জাত বাবা, কথা নেই বার্তা নেই আচমকা কাকে কখন কি ভাবে আপন করে নেয়, কেন করে, বুঝে ওঠা অসম্ভব।

হঠাৎ মনে হোলো, ওকেও আমার বেশ লাগছে। আমার এতক্ষণের অসোয়াস্তির ভাব এক নিমেষে মুছে গেল।

"কালুদা খাইয়েছি এমনি এমনি?" ঠোঁট ফুলিয়ে বললো শিরীন।

দিলওয়ার ঘরে ঢুকলো দরজা ঠেলে, তার পেছন পেছন জমিলা।

"অনেক দেরি হয়ে গেছে, এবার আমায় যেতে হবে," আমি বললাম।

"চলো আমিও যাবো," দিলওয়ার বললো, "অনেকক্ষণ আগেই আসতাম, দরজা বন্ধ দেখে ঘরে ঢুকিনি," বলে একবার শিরীনের দিকে তাকালো।

শিরীন দিলওয়ারের দিকে তাকালোই না। আমায় জিজ্ঞেস করলো, "ভাইয়া-জী, আবার কবে আসবেন?"

আমি উত্তর দেওয়ার আগে দিলওয়ার বলে উঠলো, "ভাইয়া-জী।"
"আমি ওঁকে ভাই মেনেছি," উত্তর দিলো শিরীন।
"ভাই মেনেছো?" দিলওয়ার আকাশ থেকে পড়লো।

দিলওয়ারের আসল মতলব একটু একটু করে পরিষ্কার হোলো আমার কাছে, তবে একদিনে নয়।

মাঝে মাঝে দিলওয়ার আর আমি কোথাও না কোথাও বসে চা খেতাম, কোনোদিন ডেলহাউসি স্ট্রীটের উপর বোম্বে রেস্তরাঁয়, কোনোদিন সুলে-প্যাগোডা রোডের কন্টিনেণ্ট্যালে, কোনোদিন বা স্কট-মার্কেটের উল্টোদিকে পীপ্‌ল্‌স্‌-ওন্'এ। একদিন আমরা বসে-ছিলাম সুলে প্যাগোডা রোডের একটি ছোটো কাকা-টীশপ্‌এ।

তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। আলো জ্বলে উঠেছে সুলে-প্যাগোডায়। প্রশস্ত রাজপথে বাড়িমুখো গাড়ির ভিড়। দূরে গ্লোব সিনেমায় শো ভেঙেছে। সিনেমা হলের দর্শকের ভিড় বেরিয়ে এসে মিশে যাচ্ছে পথের জনতায়। এদিকে কোথায় কোন রেডিও-সার্ভিস্ স্টোরে খুব জোরে রেডিও ছেড়ে দিয়েছে। উচ্চমন্দ্রে উদ্বেল হয়ে উঠেছে কিন্নরকণ্ঠী বর্মী ললনার গান। ফুটপাথের ওধারে দাঁড়িয়ে আছে পরপর কয়েকটি বর্মী সার্ভিস-বাস। কন্‌ডাক্‌টারেরা চেঁচিয়ে সংগ্রহ করছে কোকাইন বাহান ট্রামওয়ের যাত্রী। সামনে একটি দোকানের সামনে জ্বলছে নিয়ন-সাইন। তার লাল আভা ম্লান হয়ে নামলো দিলওয়ার বক্‌স্‌এর মুখের উপর।

দিলওয়ার হঠাৎ বললো, "ওই জেরবাদী মেয়েটার জন্যেই অমিয় জীবনে কিছু করতে পারবে না।"

"কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"এত ভালো গাইয়ে, কিন্তু এদেশে কে ওর গানের দাম দেবে। ওর উচিত কলকাতা কি বম্বে কোথাও চলে যাওয়া। যেখানকার জিনিস সেখানেই আদর হয়। তাছাড়া আরো শিখতেও পারবে। কিন্তু মা-য়িন-ম্যা ওকে যেতে দেবে না।"

"মা-য়িন-ম্যা ওকে খুব ভালোবাসে," আমি বললাম।

"প্যার? একে প্যার বলে? যাকে প্যার করি, তাকে জীবনে বড়ো হতে দেবো না, এটা কি রকম প্যার। এটা শুধু নেশা, যেদিন নেশা ছুটে যাবে, সেদিন অমিয়কে বার করে দেবে বাড়ি থেকে। সেদিন অমিয় দেখবে তার আর কিছু করবার ক্ষমতা নেই।"

"এদ্দিন অমিয় ওর সঙ্গে আছে, নেশা যদি হোতো তাহলে এরই মধ্যে ছুটেও যেতো।"

"তুমি বলছো এটা নেশা নয়?"

"আমার তো মনে হয় না।"

"তুমি বলছো এটা প্যার?"

"আমার তো তাই মনে হয়।"

দিলওয়ার হেসে ফেললো। বললো, "আমি যা দেখেছি, মা-য়িন-ম্যা ওরকম প্যার সব্বাইকে করে,—বেশীক্ষণের জন্যে নয়, ঘণ্টা দেড়ঘণ্টার জন্যে। সময় বা সুবিধে হলে তোমাকেও করবে। অমিয়র জন্যে ওর কিরকম প্যার জানো? কুত্তা বা বিল্লি পালনে মানুষ যে রকম প্যার করে, অমিয়কে সে ওরকম প্যার করে। লোকে চিড়িয়া পোষে, ওর জেরবাদী বিবিজান অমিয়কে পুষেছে।"

আমার মুখ দেখে সে বুঝতে পারলো যে আমি তার কথা মেনে নিতে পারছি না। সে সামনে ঝুঁকে পড়ে বললো, "ইনসানকে এরকম প্যার তো করে না, এরকম প্যার জানোয়ারকে করে। অমিয় জানোয়ারের মতো থাকবে কেন?"

"ওর যদি ভালো লাগে তো ক্ষতি কি?"

"ও আমার দোস্ত্। আমি ওর এই ক্ষতি হতে দেবো না। তুমি ওর দোস্ত। তোমারও ওর এরকম ক্ষতি হতে দেওয়া ঠিক নয়। আমি কোশিশ করবো যাতে ও জীবনে উন্নতি করতে পারে। তোমার মদত পেলে আমার খুব সুবিধে হয়।"

"আমার সাহায্য? কি ভাবে?" আমি ভুরু তুলে জিজ্ঞেস করলাম।

আমার কথার উত্তর দিলওয়ার দিলো না। সে বলে গেল, "আর মা-য়িন-ম্যা যদি ওকে সত্যি সত্যি প্যার করে, তাহলে সে ওর কাছ থেকে দুঃখই পাবে। অমিয় ওকে কোনোদিন শাদী করবে না। যে গাইয়ে, সে নিজের সঙ্গীতকেই শুধু প্যার করে, কোনো ইনসানকে নয়। হয় তো সে নিজেই একদিন মা-য়িন-ম্যাকে ছেড়ে চলে যাবে। মা-য়িন-ম্যা দুঃখ পাবে। আমি মা-য়িন-ম্যাকে খুব স্নেহ করি। আমি চাই না যে সে দুঃখ পায়।"

"ওদের যা হবে হোক, ওরা যদি দুজন সঙ্গে থেকে সুখ পায় তো আমাদের কি।"

"অমিয় আমার দোস্ত," দিলওয়ার উত্তর দিলো, "মা-য়িন-ম্যা-ও আমার দোস্ত।"

শিরীনের কাছে ইতিমধ্যে আমি আরো কয়েকবার গেছি, দু-তিনবার আমি একা, সাধারণত দিলওয়ারের সঙ্গে। জমিলার সঙ্গে আমার বেশী কথাবার্তা হোতো না, দিলওয়ার না থাকলে সে বেরোতোই না বড়ো একটা। আমার কি রকম যেন মনে হোতো সে আমায় খুব পছন্দ করে না। শিরীনকে একদিন বলেছিলাম, "তোমার দিদি বোধ হয় চায় না যে আমি এখানে আসি।"

"তা নয়," শিরীন উত্তর দিয়েছিলো, "মীর্জা সাহেবের বন্ধুদের কাছে সে বেশী বসতে চায় না।"

"কেন?" আমি অবাক হলাম।

শিরীন চুপ করে একটু ভাবলো, তারপর বললো, "বিয়ে করা বিবি না হলে ও রকম হয়। সে মীর্জা সাহেবকে যে রকম প্যার করে, ওর নিজের বিবিরাও করে না। তার মনে একটা ভয় আছে, যদি মীর্জা সাহেবের য়ার-দোস্তেরা ওর সঙ্গে ঠাট্টা তামাসা দিললগী করে তো ওর মান থাকবে না।"

"কিন্তু মুজরা তো করে।"

"হ্যাঁ, তা করে, আমিও করি। পয়সা তো কামাতে হয়। মীর্জা

সাহেব তো বেশী টাকা দেয় না বুবুকে। আগে যদিও বা দিতো, যেদিন থেকে টের পেয়েছে বুবু তাকে প্যার করে খুব, সেদিন থেকে দেওয়া কমিয়ে দিয়েছে। বুবু তো নিজের থেকে মাঙে না।"

"তোমাদের বাড়িতে পুরুষমানুষ কেউ নেই?"

শিরীন তাকালো আমার দিকে। বললো, "হ্যাঁ, আছে। মামু আছে, ভাই আছে।"

"ওদের কোনোদিন দেখিনি কেন?"

"ওরা এদিকটায় আসে না।"

জমিলা দিলওয়ারের রখ্‌ওয়ালী হওয়ার দরুণ একটা সুবিধে আছে। এসব অঞ্চলে মীর্জা সাহেবের ইজ্জত খুব। এদের কেউ ঘাঁটায় না, বিরক্ত করে না, ঘাঁটাতে সাহস করে না। ধারে কাছে দু-চার-পাঁচজন নাম করা গুণ্ডার আড্ডা আছে। ওরা মীর্জা সাহেবের খুব অনুরক্ত।

মাসুদী গলিতে গুণ্ডা ঘুরে বেড়ায় সেটা জানতাম। তাদের উপর যে দিলওয়ারের প্রভাব আছে সেটা কোনোদিন টের পাইনি। ওর সঙ্গে যখন এ পাড়ায় এসেছি তখন ও যে আর কাউকে চেনে, অথবা আর কেউ ওকে চেনে, একথা কোনোদিন মনে হয়নি। একদিন তার প্রভাব টের পেলাম।

সেদিন আমি আর দিলওয়ার গাড়িতে আসিনি। স্কট-মার্কেটের ওদিক থেকে হেঁটে এসেছিলাম। গলির ভিতর ঢুকে খানিকটা এগিয়ে যাওয়ার পর দিলওয়ার হঠাৎ ধাক্কা খেলো একটি জোয়ান মাদ্রাজী খৃষ্টান ছেলের সঙ্গে। দিলওয়ার কিছু বলবার আগেই সে ইংরেজিতে গালাগাল দিতে শুরু করলো। তারপরই দেখি কোত্থেকে চার-পাঁচজন মুসলমান এসে ঘিরে ফেলেছে সেই মাদ্রাজী খৃষ্টান ছেলেটিকে।

দিলওয়ার সেই ছেলেটির দিকে ফিরেও তাকালো না। এক-জনকে ডেকে বললো, "হানিফ, এই বেতমিজকে দু-চার থাপ্পড় মেরে

গর্দান ধরে গলির মোড়ে ছেড়ে দিয়ে এসো। আর কোনোদিন যেন এ পাড়ায় না ঢোকে।”

এমনিতে দিলওয়ারের গলা খুব কোমল, মধুর। সেই এক মুহূর্তে দেখলাম ওর গলার স্বর পাল্টে গেছে। মনে পড়লো, বেঙ্গল সোসিয়্যাল ক্লাবের থিয়েটারে যে ভদ্রলোক বাদশা সাজে, সে এমনি গলা করে বন্দীকে কোতল্ করবার হুকুম দেয়। মনে মনে হাসলাম একটুখানি।

আরেক দিন, আমি একা গেছি সে পাড়ায়। দেখি মারামারি হচ্ছে গলির ভেতর। চারদিকে সোডার বোতল চলছে। গলির মোড় থেকেই ফিরে চলে আসছিলাম। হঠাৎ একজন মুসলমান এসে আমায় বললো, “সাহাব, আমার সঙ্গে আসুন।”

রেঙ্গুনের প্রত্যেক দুটো রাস্তার মাঝখানে একটি সমান্তরাল সরু রাস্তা আছে, সেটা লোক চলাচলের জন্যে নয়, প্রত্যেক বাড়ির নোংরা ফেলার জন্যে। প্রত্যেক বাড়ির সামনের দিকটা সদর রাস্তার উপর, পেছন দিকটা এরকম একটি গলির গায়ে। দু-বেলা কর্পোরেশানের লরি এসে সাফ করে দিয়ে যায়। রেঙ্গুনের ভারতীয়েরা একে বলতো কাছরা-গলি। সেই মুসলমান আমায় নিয়ে একটি দোকানের ভিতর দিয়ে সেই কাছরা-গলিতে নিয়ে এলো, তারপর খানিকটা হেঁটে গিয়ে একটি ভেজানো দরজা ঠেলে বললো,—এদিক দিয়ে সোজা চলে যান, সামনের দিকে সিঁড়ি পাবেন। সেই সিঁড়ি উঠে গেছে বিবি-জীদের ঘরে।

আমি সেদিন খুব বিস্মিত হয়ে অনুধাবন করলাম যে এ পাড়ার কোনো কোনো লোক আমাকেও চিনে রেখেছে।

শিরীনের সঙ্গে কিছুক্ষণ বসে গল্প করতে বা ওর গান শুনতে খারাপ লাগতো না। সেও যথেষ্ট আদর আপ্যায়ন করতো, চা খাওয়াতো, শরবত খাওয়াতো। কিন্তু বেশীক্ষণ বসতে পারতাম না। সন্ধ্যে হওয়ার পরই উঠে পড়তাম। আর একটা ভাবনা আমায় পীড়িত করতো,—মানলাম শিরীন আমায় ভাইয়া-জী বলে, কিন্তু

আমি এখানে আসায় এদের তো কোনো লাভ নেই। তবু এরা কেন চায় যে আমি আসি?

বেশীক্ষণ বসবার জন্যে শিরীনও আমায় কোনোদিন বলতো না। দিলওয়ার যদি পীড়াপীড়ি করতো কিংবা জমিলা যদি অনুরোধ করতো, শিরীন বলতো, "না, ভাইয়া-জীকে যেতে দাও, ওকে বাড়ি ফিরে লেখাপড়া করতে হবে।"

সেদিন দিলওয়ার, জমিলা, শিরীন আর আমি, চারজনই বসে গল্প করছি, দিলওয়ার হঠাৎ বললো, "সলিল ভাইয়া, শিরীনের একটা অনুরোধ আছে তোমার কাছে, কিন্তু বলতে পারছে না। তুমি যদি না রাখো ওর অনুরোধ!"

"কী অনুরোধ?"

"বলো না ছোটি বিবিজান," শিরীনের দিকে ফিরে দিলওয়ার বললো, "এ তো সামান্য কথা। ও তোমায় ছোটো বোনের মতো মানে, নিশ্চয়ই রাখবে।"

শিরীন একটু ইতস্তত করলো। আমি জমিলার দিকে তাকালাম। দেখি সেও একটু বিষণ্ন হয়ে চুপ করে আছে।

"বলো," বললো দিলওয়ার। একটু গুরুগম্ভীর শোনালো তার গলা। এক মুহূর্তের জন্যে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল তার চোখে। আমার ভালো লাগলো না সেই চাউনি।

শিরীন চোখ তুলে তাকালো দিলওয়ারের দিকে, তারপর আমার দিকে। তারপর সব আড়ষ্টতা ঝেড়ে ফেলে সহজ লাজুক হাসি হেসে বললো, "না, এমন কিছু কথা নয়। শুনেছি অমিয়-জী আপনার খুব দোস্ত। আমার খুব ইচ্ছে ওর গান শোনবার। যদি পারেন, ওকে একদিন এখানে নিয়ে আসুন।"

এই ব্যাপার! এক মুহূর্তের জন্যে আমিও যেন আড়ষ্ট হয়ে গেলাম। খুব সহজ সামান্য অনুরোধ, তবু কি জানি কেন মনে হোলো, এর পেছনে আরো কিছু আছে। যাই হোক, আমিও খুব

সহজ ভাবে বললাম, "সে আর এমন শক্ত কি কাজ। তুমি যখন বলছো, আমি ওকে একদিন নিয়ে আসবো।"

জমিলা হঠাৎ উঠে গেল সেখান থেকে। দিলওয়ার তার যাওয়ার পথের দিকে একবার তাকালো, তারপর পঞ্চমুখে অমিয়র গানের প্রশংসা শুরু করে দিলো। চুপ করে বসে রইল শিরীন।

একটু পরে উঠে গেল দিলওয়ার। শিরীন হঠাৎ আমায় বললো, "অমিয়-জীকে জোর করবেন না। না আসতে চায় তো কোনো ক্ষতি নেই।"

আমি তাকালাম শিরীনের দিকে। জিজ্ঞেস করলাম, "ব্যাপারটা কি বলো তো?"

শিরীন ম্লান হাসি হেসে উত্তর দিলো, "সত্যি কথা বলবো? মীর্জা সাহেবই চায় যে অমিয়-জী এখানে এসে একদিন আমার গান শুনুন, আর আমাদের গান শোনান। আমার খুব ইচ্ছে নেই, আমি আপনাকে মানাই করতাম, কিন্তু আপনি ওকে আনতে না চাইলে মীর্জা সাহেব রাগ করবেন, তাই আমি চাই যে আপনি ওকে একবার মুখে অন্তত বলবেন। তারপর সে যদি না আসে তো আপনার কিছু করবার নেই, মীর্জা সায়েবও কিছু বলতে পারবে না আপনাকে।"

"দিলওয়ার নিজেই তো ওকে নিয়ে আসতে পারে।"

"সেটা মা-য়িন-ম্যার ভালো লাগবে না। আপনি নিয়ে এলে মা-য়িন-ম্যার কিছু বলবার নেই।"

আমার একটু রাগ হোলো। "ও আমায় কি মনে করে," আমি বললাম।

"না, না, অন্য কিছু মনে করবেন না, ও আপনাকে পছন্দ করে খুব। আপনাকে বন্ধু বলে মানে। আপনার কাছে বন্ধুর মতোই একটু সাহায্য চায়, তবে সোজাসুজি আপনাকে বলতে ওর বাধছে বলেই আমাকে দিয়ে বলাচ্ছে।"

"অমিয়কে এখানে এনে তার লাভ?"

"কিছু না। এমনি। হয়তো অমিয়-জী আসবেই না।"

"যদি ওকে নিয়ে আসি তাহলে কোনো গোলমাল হবে না তো। ওর আসল মতলব কি তাতো জানিনা, কিন্তু এ পাড়ার লোকজন ওকে যে রকম মানে, তাতে তো—"

আমার কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে শিরীন বলে উঠলো, "ও সব কিছু মনে করবেন না। আপনাকে আমি যখন ভাইয়া-জী বলে মানি, তখন আপনি নিশ্চিন্ত হয়ে আপনার বন্ধুকে এখানে আনতে পারেন, যদি অবশ্যি সে আসে। আমি কথা দিচ্ছি, আপনি যে রকম খাতির পান, অমিয়-জীও সে রকম খাতির পাবে। উনি উস্তাদ, আমাদের গুরু যেমন।"

দিলওয়ার ফিরে এলো, "বড়ী বিবিজান গেল কোথায়, দেখছি না তো?" বললো সে।

"বাবুর্চিখানায় আছেন হয়তো," উত্তর দিলো শিরীন।

আমি উঠে পড়লাম। বাইরে বেরিয়ে এসে বারান্দা পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামতে যাচ্ছি, এমন সময় হঠাৎ পেছন থেকে ডাক শুনলাম।

"ভাইয়া-জী!"

শিরীনের গলা নয়, কিন্তু জমিলা তো আমায় এ ভাবে ডাকে নি কখনো। ফিরে তাকালাম।

"ভাইয়া-জী, শুনুন।"

দু-চার ধাপ নেমেছিলাম, আবার উঠে এলাম জমিলার কাছে, অবাক হয়ে দেখি, জমিলার চোখে জল।

"ভাইয়া-জী, আমার একটা বাত রাখবেন? অমিয়-জীকে এখানে আনবেন না।"

"কেন?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"সে কথা আমায় জিজ্ঞেস করবেন না।"

"কিন্তু ব্যাপারটা কি না জানলে কি করে? আমি দিলওয়ারকে আর শিরীনকে বলেছি যে ওকে একদিন নিয়ে আসবো। এখন যদি ওকে না আনি, দিলওয়ার কি মনে করবে?"

"যাই মনে করুক, আপনি আনবেন না।"

আমি দাঁড়িয়ে একটু ভাবলাম। তারপর বললাম, "আমি যখন বলেছি ওকে আনবো, ওকে আনবো তো নিশ্চয়ই, তবে একথা জেনে রেখো দিলওয়ার কি কেউ ওর কোনো ক্ষতি করতে পারবে না।"

মনে মনে ভাবছিলাম প্রশান্তবাবুর কথা। পুরোনো লোক, নানারকম মহলে খুব প্রভাব। কোনো গোলমাল হলে ওঁকে সব বলে দেবো। আমায় ভালোবাসেন খুব, শুনে হয়তো আমার উপর একটু রাগ করতে পারেন এসব জটিলতার মধ্যে জড়িয়ে পড়েছি বলে, কিন্তু দিলওয়ারকে সামলে রাখতে পারবেন। দিলওয়ার ওঁকে চটাতে সাহস করবে না।

অমিয়র কাছে গেলাম পরদিনই। সে তখন পাটি পেতে বসে তানপুরো নিয়ে রেওয়াজ করছে। মা-য়িন-ম্যাও এলো আমায় দেখে।

ওর সামনেই অমিয়কে বললাম, "শোনো, একটা দরকারে এলাম। একজন তোমার গান শুনতে চায়, সে ঠিক আমার বোনের মতো। কবে যাবে বলো।"

অমিয় মা-য়িন-ম্যার দিকে তাকালো, মা-য়িন-ম্যা বললো, "পরশু আমার রিহার্স্যাল আছে। আমি তো থাকবো না, পরশু যেতে পারো।" আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলো, "তোমার বোনের মতো? কোথায় থাকে?"

"মাসুদী গলিতে। একটা কথা। দেখ অমিয়, ওকে আমি বোনের মতো মানি, তুমিও বোনের মতো মানবে বলে দিচ্ছি।"

মা-য়িন-ম্যা হেসে ফেললো। বললো, "কেন, তোমার কি কোনো ভয় আছে নাকি? তোমার যে বোনের মতো, তাকে সে যদি অন্য কিছুর মতো মানতে যায়, আমাকে এসে বোলো। আমি দেখবো, কি করা যায়।"

একটু পরে সে অমিয়কে বললো, "দেখ, তোমায় বাজারে যেতে হবে। রাত্তিরে রান্না করবার মতো কিছু নেই।"

অমিয়কে বাজারের টাকা আর একটি শান্-ব্যাগ দিলো সে। আমিও উঠে পড়ছিলাম, মা-য়িন-ম্যা বললো, "তুমি চলে যাচ্ছো কেন ? বোসো, মা-খিন-চ্যি তোমার জন্যে চা আনতে গেছে। অমিয়ও এসে পড়বে আধ ঘণ্টার মধ্যে।"

অমিয় সিঁড়ি দিয়ে নেমে যাচ্ছিলো। মা-য়িন-ম্যা ডাকলো পেছন থেকে, "অমিয়—য়ে! হ্যাঃ অমিয়। সিমের দানা নিয়ে আসবে পঁচিশ টিক্যাল, আর তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে। আজ আমি তাড়াতাড়ি বেরোবো। আমার লোনজ্যি আর এন্‌জ্যি ইস্তিরি করে দিতে হবে ফিরে এসে।"

আমি অবাক হয়ে তাকালাম মা-য়িন-ম্যার দিকে। অমিয়কে দিয়ে ও বাজার করায়, সংসারের টুকটাক কাজ করায় জানি। একদিন ওকে ঘর ঝাঁটও দিতে দেখেছিলাম। আজকাল কি মা-য়িন-ম্যার লুঙ্গি আর জামাও ইস্তিরি করতে শুরু করেছে নাকি ?

আমার মুখের ভাব দেখে মা-য়িন-ম্যা হাসলো। বললো, "এ ধরনের লোককে একটু খাটিয়ে নিতে হয়, তা নইলে ওরা একেবারে অকর্মণ্য হয়ে যায়। যাক, আর সবার কি খবর বলো, তুমি তো কয়েকদিন আসো নি। দিলওয়ার সায়েব কোথায় ?"

"কেন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি ?"

"সেই যে এসেছিলো, যেদিন তুমি এসেছিলে, তারপর আর আসেনি। তোমার সঙ্গে দেখা হয় ?"

"হ্যাঁ, প্রায়ই দেখা হয়," আমি উত্তর দিলাম।

মা-য়িন-ম্যা মুখ নিচু করে কি যেন ভাবলো খানিকক্ষণ। তারপর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "শুনেছি মাস্তুদী গলিতে দিলওয়ার সায়েবের একজন আউরত আছে। সেই কি তোমার বোনের মতো ?" বলে হেসে ফেললো।

"তুমি কি করে জানো ?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"শুনেছি। বোধ হয় দিলওয়ার নিজেই বলেছিলো একদিন, এখন তার মনে নেই যে আমায় বলেছিলো। তাকেই বুঝি তোমার বোনের মতো বলছো?"

আমার কানদুটো লাল হোলো। বললাম, "না, সে নয়। তার একটি ছোটো বোন আছে।"

"সেও গানেওয়ালী?"

"হ্যাঁ, গানটান সেও গায়।"

"দিলওয়ার সায়েব বুঝি তোমায় বলেছে, সে অমিয়র গান শুনতে চায়?"

"না," আমি বললাম, "সেই মেয়েটি নিজেই আমায় বলেছে।"

মা-য়িন-ম্যা অন্য দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো। বললো, "দিলওয়ার সায়েবকে তুমি চেনো না। তোমার বয়েস তো কম। আমি ওকে চিনি।"

আমি এবার একটু বিরক্ত হলাম। বললাম, "ওসব আমি বুঝি না। শিরীন আমায় বলেছে, ও অমিয়র গান শুনতে চায়। আমি বলেছি আমি অমিয়কে বলবো। এখন অমিয় যেতে চায় যাবে, না যেতে চায় যাবে না। তোমাদের অতো প্যাঁচ আমি বুঝি না, তোমাদের কোনো গোলমালে আমি থাকতেও চাই না।"

মা-য়িন-ম্যা তার বড়ো বড়ো চোখ দুটো তুলে আমার দিকে তাকালো। বললো, "আমাদের কোনো প্যাঁচও নেই, কোনো গোলমালও নেই। তুমি যখন বলেছো, অমিয় নিশ্চয়ই যাবে। তা ছাড়া, দিলওয়ার সাহেবেরও বোঝা দরকার, সে যা ভাবছে, তা হবে না। মা-য়িন-ম্যা অতো কাঁচা মেয়ে নয়।"

"কি জানি, আমি কিছুই বুঝতে পারছি না," আমি বললাম। মা-য়িন-ম্যা উত্তর দিতে গেল, তার আগেই আমি বলে ফেললাম, "তবে আমার বুঝে কোনো দরকারও নেই।"

মা-য়িন-ম্যা হাসলো, হেসে বললো, "আমিও সে কথাই বলতে যাচ্ছিলাম, তোমার বুঝে কোনো দরকারও নেই। তুমি ভালো

ছেলে, কলেজে পড়ো, অমিয় তোমার বন্ধু, ওর কাছে আসো, সবার সঙ্গে গল্প করে চা খেয়ে বাড়ি চলে যাও, ব্যস, এই তোমার অনেক। দিলওয়ারের সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করাই ভালো, সে তোমার থেকে বয়েসে বড়ো, ওর আদতও ভালো নয়। তবে সে তুমি বুঝবে, আমি বলতে যাবো না।"

মা-খিন-চ্যি এলুমিনিয়ামের কেটলিতে করে চা নিয়ে এলো। সেই চা সস্তা জাপানী চিনেমাটির কাপে ঢেলে দিলো মা-য়িন-ম্যা। এক পেয়ালা নিজে নিলো, এক পেয়ালা আমার দিকে এগিয়ে দিলো।

তারপর একটি সিগারেট ধরিয়ে মা-য়িন-ম্যা বললো, "অনেক আজে বাজে কথা বললাম। এখন অন্য কথা বলা যাক।"

"বলো।"

মা-য়িন-ম্যা হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে দেখলো। তারপর বললো, "তুমি তো বড়ো হয়েছো, কলেজে পড়ো। আর দু-সাল পরে নোকরি করবে। একে বোন, ওকে বুবু ডেকে কদ্দিন চালাবে। এবার একটা ছোকরি তল্লাস করে নাও।"

"ছোকরি!" আমি অবাক হয়ে মা-য়িন-ম্যার দিকে তাকালাম, তবে কিছু মনে করলাম না। ভাষা পরিমার্জিত না হলেও যা বলছে ভালো মনেই বলছে। বললাম, "এখন কি? পড়াশুনা খতম করে রোজগার করতে শুরু করি, তারপর দেখা যাবে।"

"আমি বিবির কথা বলছি না," মা-য়িন-ম্যা হাসি মুখে বললো, "আমি বলছি ছোকরির কথা, যার কাছে মাঝে মাঝে আসবে, বাতচিত করবে। শুধু কলেজে গিয়ে বই পড়ে কি হবে? তোমার তো উমর হয়েছে, কতো হবে? উনিশ? এখন তো ছোকরি দরকার। এখন তো মাঝে মাঝে ছোকরির সঙ্গে বসে বাতচিত না করলে চলে না।"

"আমার চলে," আমি একটু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলাম।

আমার কথা শুনে মা-য়িন-ম্যা হেসে ফেললো। বললো, "আমাদের মা-খিন-চ্যি'কে তোমার পছন্দ হয়? ও খুব ভালো

মেয়ে। ওকে মাঝে মাঝে লোন্‌জ্যি কি সিল্কের জামা কি ওরুক ম টুকটাক কিছু কিনে দিলেই চলবে। ডাকবো তাকে ? আজ ওর সঙ্গে কিছুক্ষণ বাতচিত করে দেখ না। মা-খিন-চ্যি-য়ে—, মা-খিন-চ্যি !"

আমি উঠে পড়লাম। বললাম, "আমায় এখন যেতে হবে। আমি পরশু বিকেলে আসবো অমিয়কে নিতে।"

মা-য়িন-ম্যা আমার হাত ধরে ফেললো। বললো, "অমিয় আসবার আগে তোমায় ছাড়বো না। বোসো।"

মা-খিন-চ্যি ঘরে ঢুকলো, দেখলো মা-য়িন-ম্যা আমার হাত ধরে আছে। সে হাসলো একটু, জিজ্ঞেস করলো, "আমায় ডেকেছো ?"

"হ্যাঁ। এই কেটলি আর কাপগুলো নিয়ে যাও। তারপর উনুনটা ধরিয়ে দিও।"

কেটলি আর চায়ের কাপ তুলে নিয়ে হাসি মুখে বেরিয়ে গেল মা-খিন-চ্যি। নিটোল তার স্বাস্থ্য। নিজের অজান্তেই বোধ হয় একবার তাকিয়ে দেখলাম সেদিকে।

"বোসো," বললো মা-য়িন-ম্যা, "আমার উপর রাগ করো না। আমি তোমায় এমনি ঠাট্টা করছিলাম। বোসো, অমিয় এলে পরে তারপর যেও।"

আমি বসলাম। জানিনা কেন, মনে হোলো শিরায় শিরায় রক্তচলাচল যেন খুব দ্রুত হয়ে উঠেছে।

"এবার অন্য কথা বলা যাক," বললো মা-য়িন-ম্যা।

"বলো।"

"কার কথা বলবো ? দিলওয়ার সাহেবের কথা বলি ?"

"বলো।"

"জানো, দিলওয়ার সাহেব আমায় শাদি করতে চায়।"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

"কিন্তু আমি কেন ওকে শাদি করবো ? ওসব শাদি-উদি আমাকে দিয়ে হবে না। তা ছাড়া ওর দুটো বিবি আছে, দুটো না তিনটে আউরত আছে। ও বলছে আমার জন্যে ভালো জায়গার

আলাদা ঘর ভাড়া করবে, আমাকে মাসে মাসে দেড়শো টাকা দেবে। কিন্তু আমার মায়ের বাড়ি আছে, আমি আলাদা ঘর কি করবো? আমার অমিয় যাবে কোথায়?"

"তুমি অমিয়কে শাদি করো না কেন?"

"শাদি? অমিয়কে?" আমার কথা শুনে হাসতে লাগলো মা-য়িন-ম্যা। "ওকে শাদি করিনি বলেই সে আমার কাছে থাকে, শাদি করলেই দুমাস পরেই মুলুক্ চলে যাবে। কতো জেরবাদী-মেয়ে ক্যলাকে বিয়ে করে ঠকেছে। আমি ঠকতে পারবো না। ও আমার কাছে থাকলে আমার ভালো লাগে, তাই ওকে আমার কাছে রেখেছি।"

"দিলওয়ারকে সোজাসুজি বলে দিলেই হয়।"

"বলেছি। ও শোনে না। ওকে বলেছি, শাদি করার কি দরকার? যেমন আসছো, ওরকম মাঝে মাঝে এসো। আমার দোস্ত-মেহমান আরো পাঁচ সাত দশজন যেমনি আসে তুমিও এসো। ওসব শাদি-উদির বাত বোলো না, অমিয়কেও বাড়ি থেকে বার করে দেওয়ার কথা বোলো না। আমি কারো নই, তবে অমিয় আমার।"

মা-য়িন-ম্যার ব্যক্তিগত জীবনের কথা কোনোদিন তলিয়ে ভাবিনি। ওকে চোখের সামনে যতোটা দেখতাম, ততোটাই বুঝতাম। আজ হঠাৎ যেন একটুখানি পরিষ্কার হতে লাগলো মা-য়িন-ম্যার স্বরূপ।

আমি তাকিয়ে দেখলাম মা-য়িন-ম্যার দিকে। ফরসা মুখ ঢলঢল করছে, খুব বিভ্রমময়ী দেখাচ্ছে পরনের গাঢ় নীল সিল্কের লোন্-জ্যি আর কড়া অর্গানডির শাদা এন্-জিতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে ভেতরের লেস্ বসানো বডিস্। পায়ে সোনার মল, গলায় ঝিকমিক করছে সবুজ জেড্ আর কালো জেট্ বসানো নেকলেস।

মা-য়িন-ম্যা চোখ রাখলো আমার চোখের উপর। একটু হেসে বললো, ছোকরীর কথা বলেছি বলে রাগ করেছিলে কেন? তুমি তো ছোকরী চাও, আমি তোমার আঁখ দেখে টের পেয়েছি।"

আমি আবার উঠে পড়বার চেষ্টা করবো কিনা ভাবছিলাম। হঠাৎ মা-য়িন-ম্যা আমার কাছে সরে এলো পেলব হাত দুটো বাড়িয়ে ধরলো। আমি হাত দুটো ছাড়াবার চেষ্টা করলাম। পারলাম না। মা-য়িন-ম্যা খুব কাছে নিয়ে এলো তার মুখ। উষ্ণ নিশ্বাসে অনুভব করলাম তার মুখের তানাখা-পাউডারের মৃদু গন্ধ।

সে বললো, "আজ তুমি পাশে বসে আছো, তাই তোমার সঙ্গে বাতচিত করবো। তেমনি যখন দিলওয়ার আসে তার সঙ্গে। তুমি বলো, তুমি যদি আমায় বিয়ে করতে চাও, আমি কি তোমায় বুদ্ধু ভাববো না?"

আমি চুপ করে তাকিয়ে রইলাম মা-য়িন-ম্যার চোখের দিকে। তার জীবনধারা পরিষ্কার হয়ে গেল আমার কাছে। আমি ভাবছিলাম অমিয়র কথা। এরই কাছে কেনা গোলাম হয়ে পড়ে আছে অমিয়?

"এসো," মা-ইন-ম্যা আস্তে আস্তে বললো।

আমি ঘাড় নাড়লাম, ছাড়িয়ে দিলাম মা-য়িন-ম্যার বাহুবন্ধন।

মা-য়িন-ম্যা সহজ হয়ে সরে বসলো, একটু হেসে বললো, "তুমি এখনো বাচ্চা, কি জানি, বড়ো হবে না কোনোদিন। এরকম আদত থাকলে মেয়েদের বহন্ বুবু ডেকেই তোমায় জিন্দগী বীতাতে হবে।" তারপর ডাক ছাড়লো, "মা-খিন-চ্যি! মা-খিন-চ্যি য়ে—!!"

মা-খিন-চ্যি এলো। মা-য়িন-ম্যা বললো, "বড্ড গরম লাগছে। সামনের পানওয়ালার দোকান থেকে বরফ আর লেমনেড নিয়ে এসো।"

"আমি এবার যাচ্ছি," আমি বললাম।

"যেওনা, বোসো। আমার উপর রাগ করছো কেন? আমি তোমার বন্ধু নয়? ওই দেখ অমিয় এসে পড়েছে।"

মা-খিন-চ্যির হাতে শান-ব্যাগ তুলে দিয়ে অমিয় ভেতরে এলো। সঙ্গে এলো দিলওয়ার বক্স্ আর বালাজী রাও। ওদের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেছে।

"এই দেখ তোমার বন্ধু চলে যাচ্ছে," মা য়িন ম্যা বললো।

"কেন?"

"আজ আমায় তাড়াতাড়ি ফিরতে হবে," আমি বললাম, "আর শোনো। পরশু আমি আর এখানে আসবোনা, স্পার্কস-স্ট্রীটে আর মন্টগোমেরি স্ট্রীটের মোড়ে যে কাকা-শপ্ আছে সেখানে অপেক্ষা করবো। তুমি সেখানে এসো।"

দিলওয়ার তার মুখ খুশিতে ঝলমল করিয়ে আমার দিকে তাকালো। দেখলাম মা-য়িন-ম্যা তাকিয়ে আছে দিলওয়ারের দিকে। তার মুখে একটুখানি বাঁকা হাসি।

পজুনডওঙ থেকে বাস ধরলাম। নেমে পড়লাম পঞ্চাশ নম্বর গলির মোড়ে। গলি ধরে সোজা হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে চললাম দক্ষিণ দিকে। ফ্রেজার স্ট্রীট পেরিয়ে আরো এগিয়ে এসে ডেল-হাউসি স্ট্রীটে পড়লাম। ভেবেছিলাম নদীর ধারে গিয়ে বসবো। কিন্তু যাওয়া হোলো না।

পঞ্চাশ নম্বর গলি আর ডেলহাউসি স্ট্রীটের মোড়ে বাঙালীদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত একটি খুব নামকরা মস্তো বড়ো স্কুল আছে। তার উল্টোদিকের ফুটপাথে পাশাপাশি দুটো দোকান আছে, একটি গেন্নার শরবতের আর একটি পকৌড়ির, এ দেশী ভারতীয়েরা যাকে বলে পেঁয়াজো। গরম পেঁয়াজোর গন্ধ নাকে আসতে নদীর পাড়ে যাওয়ার লোভ পরিত্যাগ করলাম। সামনে স্কুলের প্রশস্ত খেলার মাঠ। একটি টিনের চেয়ার টেনে বসলাম সেখানে। একজন এসে পেঁয়াজো দিয়ে গেল এক ঠোঙা, গেন্নাওয়ালা একটি বড়ো গেলাসে করে নিয়ে এলো বরফ-দেওয়া নিংড়ানো আখের টাটকা শরবত। পেঁয়াজো খেতে খেতে শরবতের গেলাসে চুমুক দিতে লাগলাম একটু একটু করে।

খেলার মাঠে খেলা সেরে স্কুলের ছেলেরা এসে ভিড় করেছে গেন্নার আর পেঁয়াজোর দোকান দুটির সামনে। আধা ইংরেজি আধা বাংলায় শোরগোল করছে ওরা। রাস্তায় আলো জ্বলে

উঠেছে। নির্জন পথে ট্র্যাফিক নেই, শুধু একটি দুটি গাড়ি, কখনো বা একটি বিশালকায় আর-ই-টি বাস।

ঘাড়ে ভারা ঝুলিয়ে ডেকে ডেকে চলে গেল মোহেইঙ্গা-ওয়ালা।

বাপরে বাপ্,—আমি ভাবছিলাম,—কী বেঁচে গেছি আজ। এ রকম মেয়ে মা-য়িন-ম্যা? স্থির করলাম, অমিয়কে সোজাসুজি একদিন বলবো, বাঁচতে চাও তো ওই মেয়ের সঙ্গ ছাড়ো, কলকাতা কি বম্বে চলে যাও, চেষ্টা করলে একদিন নাম করতে পারবে। এখানে পড়ে থাকলে পচে মরবে, কেউ চিনবে না। ওদের বাড়িতে তো আর নয়ই, সংকল্প করলাম মনে মনে,—এবার আস্তে আস্তে দিলওয়ার বক্স্‌এর সম্পর্কও কাটাতে হবে। ওদের জটিল জীবন নিয়ে ওরা থাক, আমি ওসবের মধ্যে নেই। অমিয়কে নিয়ে শিরীনের কাছে ওই একদিন যাব, তারপর আর ওখানেও নয়। আমার পরিচিত পরিবেশের বাইরে যে জীবন তার সম্বন্ধে যা কৌতূহল ছিলো, আজ একদিনে সেটা মিটে গেছে।

সেই অল্প বয়েসে যদি ভবিষ্যৎ শুনতে পারতাম তো শঙ্কিত হতাম। আজ এই পরিণত বয়েসে এসে যখনই পুরোনো দিনের কথা ভাবি, দেখতে পাই যে যখনই সাধারণ জীবনের সহজ পরিবেশে নিরিবিলি হয়ে থাকতে চাই, তখনই এক কৌতুকপ্রিয় ভাগ্যদেবতা ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেছে কোনো অনন্য অপরিচিত জীবনের অজানা পরিবেশে, তারপর যখন তার জটিলতার জালে নিজে জড়িয়ে পড়তে গেছি, তখনই আবার এক ঝটকায় সেখান থেকে বার করে নিয়ে এসেছে। বেরিয়ে আসবার সময় বেদনাতুর হয়ে উঠেছে মায়াবদ্ধ মন, কিন্তু বেরিয়ে আসবার পর আবার সহজ জীবনের ফাঁকা হাওয়ায় নির্মল নিশ্বাস নিয়ে মন টাটকা হয়ে উঠেছে।

গেন্না আর পেঁয়াজোর দাম মিটিয়ে দিয়ে উঠে পড়লাম। সোজা হেঁটে চললাম ডেলহাউসি স্ট্রীট ধরে। অনেকটা এগিয়ে এসে জুডা-ঈজিক্যাল স্ট্রীট পেরিয়ে রেঙ্গুন সেক্রেটারিয়েটের পাশ দিয়ে ঘন গাছের আধো অন্ধকার ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে বাড়ি ফিরে গেলাম।।

কাকা-শপ্ এ বসে এককাপ চা নিয়ে আমার জন্যে অপেক্ষা করছিলো অমিয় গাঙ্গুলী। তার সঙ্গে বালাজী রাও। তবলা ভালো বাজায় এরকম কাউকে পাওয়া যায় না এই শহরে। কোথাও গান গাইবার আমন্ত্রণ এলে অমিয় বালাজীকে নিয়ে যায় সঙ্গে করে। অমিয়র সঙ্গে বসে আমিও চা খেলাম এক কাপ। তারপর তাকে আর বালাজীকে নিয়ে একটি ঘোড়ার গাড়ি চেপে চললাম মাসুদী গলিতে।

সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে আসতে অমিয় আমায় বললে, "তোমার বোন এই বাড়িতে থাকে ?"

"বোন তো বলিনি," আমি উত্তর দিলাম, "বোনের মতো বলেছি।"

সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে দেখি দিলওয়ার বারান্দায় অপেক্ষা করছে আমাদের জন্যে। নতুন পোশাকে দেখলাম তাকে। সাধারণত স্যুট পরে থাকে, নয়তো বা আচকান আর চুড়িদার পাজামা। আজ দেখলাম ঢোলা খানদানি পাজামার সঙ্গে পরেছে চিকনের কাজ করা লক্ষ্ণৌয়ি কুর্তা। মাথায় জরির কাজ করা কালো টুপি, হাতে হাতির দাঁতের কাজ করা চন্দন কাঠের ছোটো লাঠি। আতরের গন্ধ বেরোচ্ছে তার জামা থেকে।

সে আমাদের ভিতরে নিয়ে গেল। সেখানে জরি আর সিল্কের সাজে মনমোহিনী হয়ে হাঁটু মুড়ে বসেছিলো জমিলা আর শিরীন। ওরা উঠে দাঁড়িয়ে অমিয়কে তসলিম জানালো। সাকিনা,—সেই অন্য পরিচারিকা মেয়েটি, যাকে প্রথম দিন দেখেছিলাম বারান্দায় বসে হাতে মেহেদি লাগাচ্ছে,—সে এসে আতর দান থেকে আতর ছিটিয়ে দিলো আমাদের উপর।

তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলাম আমরা সবাই। সামনে গিলৌরির তসতরি সাজানো ছিলো। জমিলা সেটি এগিয়ে দিলো আমাদের দিকে দিলওয়ার এগিয়ে দিলো সিগারেটের টিন। জমিলা আর শিরীনের পেছনে সারেঙ্গি, হারমোনিয়াম, আর বাঁয়া তবলা নিয়ে বসেছিলো ওদের সপরদা। ওরা যে যার যন্ত্র মেলাতে লাগলো।

"আপনার কথা মার্জা সাহেবের মুখে অনেক শুনেছি," বললো জমিলা, "আপনার গান শোনবার খুব ইচ্ছে ছিলো। ভাইয়া-জী শুনে বললো আমি ওঁকে আসবার জন্যে অনুরোধ করবো। আমার খুব খুব-কিসমতী যে আপনি মেহেরবানি করে আমার গরীবখানায় তশরীফ এনেছেন।"

দিলওয়ার হাসতে হাসতে বললো, "ও্য মেরে ঘরপে আয়ে, খুদাকী কুদরত হৈ;—কভি হম উনকে, কভি অপনে ঘরকো দেখতে হৈ।"

শরবত আর মেওয়া দিয়ে গেল সাকিনা।

দিলওয়ার বললো,"অমিয়-জী, তোমার গান শোনানোর আগে তুমি যদি অনুমতি দাও, তাহলে আমাদের শিরীন বিবিও একটু সামান্য গান যা শিখেছে, তোমাকে শোনাতে পারে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।"

"কী গাইবো ফরমাশ করুন," বললো শিরীন।

অমিয় কিছু বলবার আগেই দিলওয়ার বললো, "এরা দিল্লির ঘরানা, ঠুম্‌রি শোনাক।"

"তাই শোনাচ্ছি," বললো শিরীন, "মুলায়েজা করুন।"

সারেঙ্গিয়া সারেঙ্গীতে সুর দিলো।

তবলায় ঠেকা দিলো তবলচি।

হাঁটু মুড়ে ভাও দিয়ে ঠুম্‌রি ধরলো শিরীন। খুব সহজ ফোয়ারার মতো তার গান। রকমারী বিস্তারের চাল শুনে মুহুর্মুহু প্রশংসাবাদ করে উঠলো সবাই।

দেখলাম অমিয় খুব তন্ময় হয়ে গান শুনছে।

ঠুমরির পর দুটো গজল গাইলো শিরীন।

"বা, গান শিখেছে," বলে উঠলো অমিয়।

"এবার আমরা সবাই তোমার গানের প্রত্যাশায় আছি," বললো দিলওয়ার।

অমিয় তানপুরো তুলে নিলো। বাঁয়া তবলা টেনে নিলো বালাজী রাও।

"কি গাইবো বলুন।"

শিরীন বললো, "এ দেশে ভালো খেয়াল শুনতে পাইনা। আপনি যদি খেয়াল শোনান তাহলে খুব খুশী হবো।"

আড়ানায় একটি খেয়াল ধরলো অমিয়। ঘন্টাখানেক ধরে একটি বিলম্বিত, তারপর একটি দ্রুত গাইলো। আড়ানার পর জয়জয়ন্তী।

সেদিনের সন্ধ্যা আমার আজো মনে আছে। মাসুদী গলিতে এমনি হট্টগোল হৈ-চৈ খুব। কিন্তু সেদিন দিলওয়ার তার চেনা লোকজনদের বলে রেখেছিলো কিনা জানিনা। পথ প্রায় নিস্তব্ধ। সামনের বাড়ির এদিক ওদিকের জানলায় দেখলাম অনেক মুখ। পরে শুনেছিলাম, গলিতে খবর ছড়িয়ে পড়েছিলো, কে এক মশুর গাওয়াইয়া গান গাইতে এসেছে জমিলা বাঈজীর বাড়িতে। লোকে তাই এখানে সেখানে ভিড় করে গান শুনছিলো।

জয়জয়ন্তী যখন শেষ হোলো তখন ন-টা প্রায় বাজে। হঠাৎ চোখ পড়লো বারান্দায়। একটি লোক সেদিক দিয়ে যাচ্ছে, হাতে তার অনেকগুলো সোডার বোতল। অমিয় আর দিলওয়ারে চোখাচোখি হোলো। একটু চোখ টিপলো দিলওয়ার, অমিয় হাসলো।

বুঝলাম যে, আরো অনেকক্ষণ চলবে অমিয়র গান। শরবতের পালা শেষ হয়েছে, এবার আরো রঙীন কিছুর আয়োজন।

আমি উঠে পড়লাম। বললাম, "আমায় এবার বাড়ি ফিরতে হবে।"

"এরই মধ্যে?" বললো অমিয়, "বোসো না আরো কিছুক্ষণ। একদিন না হয় দেরি একটু হোলোই বা।"

"ভাইয়া-জী কে রুখবেন না," বললো শিরীন, "ওকে এবার যেতে দিন।"

শিরীন নিজে উঠে এসে আমায় সিঁড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিলো।

আমি বললাম, "কথা দিয়েছিলাম অমিয়কে নিয়ে আসবো। যাক আমার কাজ করে দিয়েছি। খুশি তো? এখন দেখো ও যেন নির্বিঘ্নে বাড়ি ফিরতে পারে।"

"আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, ও নির্বিঘ্নেই বাড়ি ফিরতে পারবে।"

আমার দুর্ভাবনার কোনো কারণও ছিলো না। বেশ বুঝে গিয়েছিলাম দিলওয়ারের উদ্দেশ্য। ও অমিয়কে নতুন নেশা ধরিয়ে দিতে চায়।"

যা করবে করুক, আমি আদার ব্যাপারিও নই, জাহাজের খবর আমার তো একেবারেই প্রয়োজন নেই।

তা-ছাড়া আরেকটি কারণে আমার ভাবনা ছিলো না। বালাজী রাও আছে অমিয়র সঙ্গে। সে মায়াবীর বাচ্চা, তবলা যেরকম বাজাতে পারে, প্রয়োজন হলে সোডার বোতলও চালাতে পারে।

"ভাইয়া-জী, আপনি আবার কবে আসবেন?" শিরীন জিজ্ঞেস করলো।

"জানিনা," আমি আস্তে আস্তে উত্তর দিলাম, "তবে আগামী কয়েকদিনের মধ্যে নয়। বাৎসরিক পরীক্ষার সময় এসে যাচ্ছে। এখন প্রচুর পড়াশুনোর চাপ।"

আসলে আমার একেবারেই আসবার ইচ্ছে ছিলো না।

শিরীন কি বুঝলো কে জানে, একটু বিষণ্ণ হয়ে গেল।

আস্তে আস্তে বললো, "বেশ, যখন খুশি আসবেন। আপনার উপর তো আমার কোনো জোর নেই। তবে ছোটি বহন্‌কে যদি মাঝে মাঝে য়াদ করেন মেহেরবানী করে তো খুব খুশি হবো।"

আমি একটু হেসে তার পিঠে হাত রাখলাম কয়েক মুহূর্তের জন্যে। মনে মনে ভাবলাম, দাদা বলো ভাই বলো আমি আর

এমুখো হচ্ছি না কোনোদিন। একটু কষ্টও হোলো মনে মনে। ভাবলাম, তা হোক, ওরকম হয়ে থাকে।

সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম।

নিচের থেকে একবার উপর দিকে তাকিয়ে দেখলাম।

শিরীন তখনো দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মুখে।

আমি আস্তে আস্তে পথের জনতায় মিশে গেলাম।

সেদিন বাড়ি ফিরে পড়ায় মন দিতে পারে নি। বার বার কানে ভাসছিলো অমিয়র জয়জয়ন্তী সুর বিস্তার, কোমল ও শুদ্ধ গান্ধারে তার অপরূপ সুরে কাজ, আর তার ফাঁকে ফাঁকে মনে পড়ছিলো শিরীনের দুটো কাজল কালো চোখ, যে চোখের বিষণ্ণ চাউনি মেলে সে দাঁড়িয়ে ছিলো সিঁড়ির মুখে।

ওই সেই একদিনই মনে ছিলো। তারপর জোর করেই ভুলে গেলাম। নিজেকে ভাসিয়ে দিলাম আমার অভ্যস্ত কলেজী জীবনের রুটিন-বাঁধা দিনগুলোর মধ্যে।

সামনে পরীক্ষা ছিলো বলে দু-তিন মাস কারো সঙ্গে সংযোগ রাখবার সুযোগ হোলো না। পরীক্ষার পর একদিন মনে পড়লো অমিয়র কথা। বিকেল বেলা ওর খবর নিতে গেলাম মা-য়িন-ম্যার বাড়ি।

ওর কাছে অভ্যাগত এসেছিলো কয়েকজন। আমাকে দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। শুনলাম, অমিয় আজকাল এসময় বাড়িতে থাকেনা। কোথায় যেন গানের টিউশানি পেয়েছে। সন্ধ্যে কাটিয়ে আসে সেখানেই। ফিরতে ফিরতে ন-টা সাড়ে-ন-টা বাজে।

একটু যেন বিষণ্ণ মনে হোলো মা-য়িন-ম্যার চোখ দুটো। ম্লান হেসে বললো, "মরদ মানুষ, নিজের মেহনতে দু-চার পয়সা কামানো ভালো। শরীর মন, দুইই ভালো থাকে।"

দু-চার কথা বলে আমি চলে আসছিলাম। সে বললো, "এখনই চলে যাবে? কেন? অমিয়র ঘরটা খুলে দিচ্ছি, সেখানে বোসো কিছুক্ষণ।"

আমি বসতে রাজী হলাম না। বললাম, "ওর তো ফিরতে অনেক দেরি। এতক্ষণ কে বসবে? আমি বরং আরেকদিন আসবো।"

মা-য়িন-ম্যা হাসলো। "অতক্ষণ ওর জন্যে না হয় নাই বা বসলে। আমার সঙ্গে বসে চা খেয়ে যাও।"

"তোমার কাছে তো অন্য লোক এসেছে।"

"ওরা চলে যাবে একটু পরে।"

তবু আমি বসলাম না। "আজ থাক আরেকদিন আসবো," আমি উত্তর দিলাম।

"আচ্ছা, পরে আরেকদিন এসো," বলে সে হাসলো, "আমার সঙ্গে একলা বসে গল্প করতে তুমি যখন ভয় পাও, তখন তোমায় জোর করবো না।"

"ভয়!" আমি অবাক হয়ে তাকালাম মা-য়িন-ম্যার দিকে। সেও আমার চোখের উপর তুলে ধরলো তার আয়ত দৃষ্টি।

সে চাউনিতে যেন একটা দুঃসহ চ্যালেঞ্জ অনুভব করলাম।

হেসে আস্তে আস্তে উত্তর দিলাম, "ভয় আমি কাউকে পাইনা। তবে নিজেকে আমি একটু বেশী ভালোবাসি। যাই হোক, একদিন আসবো।"

"সত্যি আসবে তো?"

"হ্যাঁ, আসবো।"

আমি বেরিয়ে এলাম। মা-য়িন-ম্যা আমার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ির নিচে অবধি এলো।

সরু গলি পেছনে ফেলে বড়ো রাস্তায় এসে পড়লাম। বাস-স্টপের কাছে এসে দেখি ঘোড়ার গাড়ি চেপে দিলওয়ার আসছে।

আমায় দেখে সে গাড়ি থামালো, জিজ্ঞেস করলো, "কোত্থেকে আসছো? মা-য়িন-ম্যার ওখান থেকে?"

"হ্যাঁ। অমিয় তো বাড়ি নেই।"

একথা শুনে সে যে বিন্দুমাত্র হতাশ হোলো সে কথা মনে হোলো না। জিজ্ঞেস করলো, "মা-য়িন-ম্যা?"

"সে আছে।"

খুব প্রশান্তবদনে দিলওয়ার বললো, "এদ্দিন ছিলে কোথায়? শিরীন তোমার কথা জিজ্ঞেস করছিলো। ওর কাছে যেও একদিন।"

গাড়ি এগিয়ে গেল। আমি একটি বাস থামিয়ে উঠে পড়লাম।

একদিন যেতে হবে শিরীনের কাছে,—আমি ভাবলাম। কিন্তু সেদিনই যে যাবো, এরকম কোনো ইচ্ছে মনের মধ্যে ছিলো না। বাবা ওঁরই কাজে মোগল স্ট্রীটে ওঁর পরিচিত এক ভদ্রলোকের কাছে

একটু যেতে বলেছিলেন। ভাবলাম, মোগল স্ট্রীট হয়ে বাড়ি ফিরবো কিন্তু দেখা হোলো না সেই ভদ্রলোকের সঙ্গে। তখন ভাবলাম, কিছু যখন করবার নেই আজ সন্ধ্যেবেলা, শিরীনের ওখান থেকে একবার ঘুরে আসি।

রাস্তা থেকে ওপর দিকে তাকালে বোঝা যায় না যে রঙীন কাচের জানলার পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। তাই জমিলাকে দেখতে পেলাম সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসবার পর। বারান্দায় একা দাঁড়িয়ে আছে পথের দিকে তাকিয়ে। এমনি রাস্তার লোকজন দেখার আনমনা চাউনি নয়, কারো আসার প্রতীক্ষায় যেন প্রত্যাশা-ময় হয়ে আছে তার সুর্মা আঁকা নয়নের দৃষ্টি।

আমি উঠে আসতে জিজ্ঞেস করলো, "ভাইয়া-জী, আপনি একা?"

আমি ঘাড় নাড়লাম। কার প্রতীক্ষায় আছে বুঝতে অসুবিধে হোলো না, কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারলাম না যে সে আজ আসবে না।

হারমোনিয়ামের সঙ্গে গানের সুর ভেসে এলো ঘরের ভিতর থেকে। শিরীন একটি উর্দু গজল গাইছে। জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলাম, আর কেউ আছে কিনা ঘরের ভিতর। কিন্তু জিজ্ঞেস করবার দরকার হোলো না। শিরীনের সঙ্গে গলা মিলিয়ে আরেকজন গান ধরলো।

খুব চেনা গলা! অবাক হয়ে তাকালাম জমিলার দিকে।

"অমিয়?"

"হ্যাঁ।" একটু গম্ভীর শোনালো জমিলার গলা। "শিরীন ওর কাছে নাড়া বেঁধেছে।"

"শিরীন? অমিয়র কাছে?" আমি খুবই অবাক হলাম।

"হ্যাঁ। কেন, আপনি জানতেন না?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"আমি বলেছিলাম, কী দরকার। কিন্তু শিরীন জিদ করলো, অমিয়বাবুও রাজী হোলো, মীর্জা সাহেবও বললো, ভালো কথা, শিখুক না, টাকা যা লাগে আমি দেবো। আমি আর কী বলবো। মীর্জা সাহেবের কথার উপর তো আমি কথা বলি না।"

আমি একটু ভাবলাম, থাকবো না চলে যাবো। মনে হোলো, চলে যাওয়াই ভালো। শিরীন গান শিখছে, শিখুক। আমাকে এখানে দেখলে অমিয়র ভালো লাগবে না। সম্ভব হলে এখানে আমার একেবারেই না আসা উচিত। জমিলাকে যখন বলতে যাচ্ছি যে আমি আজ আর বসবো না, এমন সময় শিরীন হঠাৎ গান থামিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো।

"বুবু য়ে—!" রেঙ্গুনের ভারতীয় মুসলমানদের বাড়ির মেয়েরা অনেক সময় বাড়িতে নিজেদের মধ্যে বর্মী ভাষায় কথা বলে। শিরীন বার্মিজে বলতে শুরু করলো, "বুবু য়ে—! মীর্জা সাহেব যদি আসে তো ওকে বোলো—" কিন্তু কথা শেষ করবার আগেই চোখ পড়লো আমার উপর, সঙ্গে সঙ্গে বর্মী সংলাপ বন্ধ করে হিন্দিতে বলে উঠলো, "ভাইয়া-জী, আপনি? এদ্দিন আসেননি কেন? আমি মীর্জা সাহেবকে, অমিয় বাবুকে, কতো জিজ্ঞেস করি আপনার কথা। আসুন, ভেতরে আসুন।"

"আজ থাক। তুমি গান শেখো, আমি পরে আরেকদিন আসবো।"

"সে হবে না। এসেই চলে যাবেন, সে কি করে হয়। আসুন। আপনার দোস্তও ভেতরে আছে।"

জমিলা একটু হাসলো। বললো, "শিরীন যখন আপনাকে ধরে ফেলেছে; তখন তো আর যেতে পারবেন না। ভেতরে গিয়ে বসুন।"

"আপনি?"

"আমি পরে আসবো।"

ঘরে ঢুকতে ঢুকতে দেখলাম জমিলা আবার পথ চাওয়ায় মনোনিবেশ করেছে। ভাবলাম, মিছে এই প্রত্যাশা, সে আসবেনা।

কিন্তু একথা তাকে জানাবোই বা কি করে। থাকুক বোকা মেয়ে তার হৃদয়হীনের পথ চেয়ে। আমি ঘরের ভিতর এসে বসলাম।

যা ভেবেছিলাম। আমায় দেখে অমিয় বেশ অপ্রস্তুত হোলো, তবে তার মুখের সেই ভাবটা সে কাটিয়ে নিলো এক নিমেষেই। তার সহজ দিলখোলা হাসি হেসে বলে উঠলো, "সলিল? তুমি হঠাৎ কোত্থেকে? এসো, এসো তোমার তো একেবারে দেখাই নেই। কোথায় ডুব দিয়ে ছিলে এদ্দিন? শিরীন তো ভাইয়া-জী ভাইয়া-জী করে আমার কান ঝালাপালা করে দিলো। আমি ভাবছিলাম ইতিমধ্যে একদিন তোমার খবর নেবো। তুমি আসোনা কেন আমার বাড়ি?"

"আজ গিয়েছিলাম।"

আমার কথা শুনে অমিয়র মুখ যেন একটুখানি পাংশু হয়ে গেল। তারপর সামলে নিয়ে বললো, "যাক, এখানে এসে পড়েছো, ভালোই হয়েছে, তা নইলে দেখাই হোতো না। জানো, শিরীন আমার কাছে গান শিখছে।"

"হ্যাঁ, শুনলাম জমিলার কাছে।"

শিরীন ঠাণ্ডা লেমনেড নিয়ে এলো আমাদের জন্যে। বললো, "আজ থাক, আজ আর গান শিখবো না। ভাইয়া-জী এসেছে।"

আমি আপত্তি জানালাম। শিরীন শুনলো না, হারমোনিয়াম সরিয়ে রাখলো। হয়তো কিছুক্ষণ গল্প করে আমরা উঠে পড়তাম, কিন্তু জমিলা হঠাৎ ঘরে ঢুকে বললো, "ভাইয়া-জী আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। চলুন, আমরা ও-ঘরে গিয়ে বসি, শিরীন ততক্ষণ গান শিখুক।"

শিরীন আর অমিয় একবার জমিলার দিকে একবার পরস্পরের দিকে তাকালো। তারপর অমিয় শিরীনকে বললো, "বেশ, তাহলে বাকীটা তোমায় তুলে দি, সলিল ওঘরে বসে জমিলার সঙ্গে কথাবার্তা বলুক।"

জমিলার পেছন পেছন আমি পাশের ঘরে গিয়ে বসলাম। চার-দিকে তাকিয়ে দেখলাম, এঘর অন্য ঘরটার চাইতে আরো বেশী সাজানো। দেওয়ালে দুটো মস্তো বড়ো আয়না ঝুলছে। এককোণে একটি আয়না বসানো আলমারি, দরজার হাতলটা রঙীন কাচের। অন্য কোণে আরো দুটো কাচের আলমারি আছে। সেখানে নানারকম পুতুল, চিনেমাটির কাপ ডিশ আর কালোর উপর সোনালী কাজ করা বার্মিজ ল্যাকারের ফুলদানি, বাটি, পানের বাটা, এটা ওটা সেটা। দুদিকের দুটো দরজায় রঙীন কাচের পুঁতির পর্দা ঝুলছে। ঘর জুড়ে নানারকম ফুল পাতার রঙীন নক্সা করা সিঙ্গা-পুরী মাদুর পাতা। এক পাশে একটি কার্পেট, তার উপর তিন চারটে সাটিনের তাকিয়া। দেওয়ালে কালো ভেলভেটের উপর রূপালী জরির অক্ষরে কয়েকটি ফারসী বয়েৎ বাঁধিয়ে টাঙানো, এখানে সেখানে কয়েকটি অর্ধনগ্না মেমসায়েবের ছবি।

আমি একটি তাকিয়া ঠেস দিয়ে বসলাম। জমিলা আমার লেমনেডের গ্লাস নিজেই হাতে করে নিয়ে এসেছিলো। সেটি আমার সামনে নামিয়ে রাখলো তারপর ঘরের কোণে একটি দেওয়াল-আলমারী খুলে বার করে আনলো কয়েকটি ম্যাঙ্গোস্টিন। আমার খাওয়ার ইচ্ছে ছিলো না একেবারেই, তবু জমিলার অনুরোধে একটি ম্যাঙ্গোস্টিন খেতে হোলো।

আমি মনে মনে ভাবলাম এই আপ্যায়নের কারণটা কি। জমিলা কিছুক্ষণ চুপ করে বসেছিলো আনমনে অন্যদিকে তাকিয়ে। তারপর আমার দিকে ফিরে আস্তে আস্তে বললো, "শিরীন আপনাকে ভাই বলে মানে তাই আমিও আপনাকে ভাইয়ের মতোই দেখি। ছোটো বোনের মতো আজ একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞেস করছি, আপনি বলবেন তো?"

"কি কথা শুনি?"

জমিলা বোধ হয় একটু ভেবে নিলো যা জিজ্ঞেস করবে সেটা কি ভাবে জিজ্ঞেস করবে।

"ভাইয়া-জী আপনি তো অনেক কিছু জানেন। আচ্ছা, দিলওয়ার কি সেই জেরবাদী মেয়েটির কাছে প্রায়ই যায়?"

মনে মনে উত্তরটা ভাবছিলাম। তার আগে উল্টো প্রশ্ন করলাম, "কেন, দিলওয়ার কি এখানে বেশী আসে না?"

"গত দু-মাসের মধ্যে তিনদিন কি চারদিন এসেছে। এ মাসে আমায় টাকা দেয়নি।"

টাকা দেয়নি।—কথাটা আমার কানে বড্ড বেসুরো বাজলো। দিলওয়ারের জন্যে জমিলার এত অনুরাগ সব এই টাকাকে উপলক্ষ করে!

জমিলা বলে গেল, "মরদ বলতে আমি শুধু ওই একজনকেই জানি। ও যদি আমায় টাকা না দেয়, আমি তো আর অন্য ভাবে টাকা আনতে পারবো না। আমি মুজরা করা ছেড়ে দিয়েছি, শিরীন করে, আমি করিনা। কিন্তু ও আমাকে প্যার না করলে, আমাকে টাকা দেবে কেন?"

"তুমি নেবেই বা কেন?"

জমিলা তার চোখ দুটো তুলে আমার দিকে তাকালো। বিষণ্ণ মুখে বললো, " ওর কাছ থেকে না নেবো তো কার কাছে নেবো?"

ওর কথা শুনে আমি নির্বাক হয়ে গেলাম। আমাদের মধ্যবিত্ত জীবনের মুল্যমান নিয়ে এদের বিচার করা যায় না। জমিলা যে ভাবে তার অনুরাগ প্রকাশ করলো, সেটাই বোধ হয় তাদের ভালোবাসার মাপকাঠি। সেটা বস্তুতান্ত্রিক হতে পারে, কিন্তু তাতে যে খাদ নেই, সে যে অত্যন্ত খাঁটি, তাতে আমার কোনো সন্দেহ রইলো না।

এ কথাই বোধ হয় ভাবছিলাম, জমিলা আমার তরফ থেকে কোনো উত্তর না পেয়ে আবার জিজ্ঞেস করলো, "আপনি তো বললেন না, দিলওয়ার কি সেই জেরবাদী মেয়েটার কাছে প্রায়ই যায়?"

"মা-য়িন-ম্যার কাছে?"

আমি একটু ভেবে বললাম, "দেখ, আমি অনেকদিন ওখানে যাই নি। সুতরাং ও ওখানে যায় কি যায়না সেটা আমার পক্ষে জানা সম্ভব নয়।"

জমিলার চোখে হঠাৎ বিদ্যুৎ খেলে গেল, জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, ওই জেরবাদী মেয়েটি কি সুন্দর দেখতে? আমার চাইতেও খুব সুরত?"

আমি হাসলাম একটুখানি। বললাম, "দেখ, একটা কথা আমি তোমায় বলতে পারি মা-য়িন-ম্যার সম্বন্ধে। যারা ওকে চায়, সে তাদের চায় না। সে নিজে যাদের প্রবলভাবে চায়, শুধু তাদেরই চায়।"

জমিলা আমার দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিলো জানিনা। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা আপনি ওর ওখানে বেশী জাননা কেন?"

"অমিয়র জন্যেই যাই, তাই ও যখন থাকে তখনই যাই, তা নইলে যাইনা।"

"অমিয়-জী?" জমিলা একটু হাসলো, "ও আর মা-য়িন-ম্যার কাছে বেশীদিন থাকবে না। সব আপনার দোষ, কেন ওকে আপনি এখানে এনেছিলেন?"

আমি যে আঁচ করিনি তা নয়, তাই জমিলার মুখে শুনে এমন কিছু বিস্মিত হলাম না।

জমিলা বলে গেল, "অমিয়র মতো লোক একটু দূরে দূরে রাখাই ভালো। ওরা গানে মশ্‌গুল্‌ হয়ে থাকে, দুনিয়ার কারো মনের খবর রাখে না। নিজের গানের নেশার ঘোরে থাকে, চোট পেলে বোঝে না, আর না বুঝে অন্যকেই শুধু চোট দেয়। ওকে এত প্যার ক'রে মা-য়িন-ম্যার কী ফায়দা হোলো?"

"ফায়দার জন্যে কে কাকে প্যার করে ভাই?"

"ফায়দার জন্যেই করে," উত্তর দিলো জমিলা, "আমি প্যার করবো। কিন্তু প্যার পাবো না, এ কেমন কথা?"

জমিলার জীবনদর্শন নিয়ে বিতর্কে প্রবৃত্ত হওয়ার বাসনা আমার

ছিল না। আমি চুপ করে রইলাম। আমি বসে বসে ভাবছিলাম,—এসব যতো আজে বাজে কথা আমায় বসে শুনতে হচ্ছে কেন? আমি এখানে না এলেই হয়তো ভালো হোতো। এদের গণ্ডিবদ্ধ জীবনের ছোটোখাটো সমস্যা নিয়ে এরা থাকুক, আমি কেন জড়িয়ে পড়বো এদের জটিলতার মধ্যে? এই সামান্য এ-ওকে চাওয়া না-পাওয়ার গোলকধাঁধায় ঘুরতে ঘুরতেই এদের জীবনের সবুজ বছরগুলো হলদে হয়ে আসবে, তারপর ঝরে পড়ে সময়ের দমকা হাওয়ায় কোথায় উড়ে যাবে কেউ তার খোঁজ রাখবে না।

"দিলওয়ারকে কতো বলেছি," জমিলা বলছিলো, "এই বর্মা মুলুকে হিন্দুস্তানের লোকেরা বেশীদিন থাকতে পারবে না। বলেছি, চলো আমরা চলে যাই হিন্দুস্তানে। বললে সে গম্ভীর হয়ে যায়। বলে, হিন্দুস্তানে আমি যাবো না। যে যাবে যাক, আমি এখানে থাকবো।"

"একটি জেরবাদী মেয়ের জন্যে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না। সেজন্যে নয়," উত্তর দিলো জমিলা, "এখানে ও ব্যবসা করে মোটামুটি ভালো পয়সা কামায়। ও বলে, হিন্দুস্তানে গেলে নাকি খেতে পাবে না।"

"ও মাসে মাসে টাকা পায় না সরকার থেকে?"

জমিলা হাসলো। বললো, "তাতে চলবে না।" একটু চুপ করে রইলো, তারপর বললো, "একদিন ওকে চলে যেতে হবে। এদেশে হিন্দুস্তানের লোকেরা বেশীদিন থাকতে পারবে না। সেদিন জেরবাদী মেয়ে ওর সঙ্গে যাবে না, আমিই যাবো।"

অমিয়র সঙ্গে যখন বেরিয়ে আসছি শিরীন হঠাৎ আমায় ডেকে ঘরের ভিতর নিয়ে গেল। বললো, "ভাইয়া-জী, এটা আপনার জন্যে তৈরী করেছি।"

তার হাতে একটি পাট করা সিল্কের রুমাল। খুলে দেখি, সুন্দর সুচের কাজ করা।

"এটা করে রেখেছি অনেকদিন হোলো। আপনি এদ্দিন আসেন নি, তাই পড়ে ছিলো। মীর্জা সাহেব বলেছিলেন আপনার বাড়ি গিয়ে দিয়ে আসবেন। কিন্তু আমি ঠিক করেছিলাম, আপনি এলে নিজে দেবো। আবার কবে আসবেন?"

রেঙ্গুন শহরের সান্ধ্য-জীবনের একটা বিশেষ দ্রষ্টব্য স্থান হচ্ছে "নাইট্ মার্কেট্।" ফ্রেজার স্ট্রীটের দুপাশে দিনের বেলা পরিষ্কার ঝকঝকে ফুটপাথ, দিব্যি লোক চলাচল করছে। সন্ধ্যে হতে না হতেই দুপাশে গজিয়ে ওঠে অসংখ্য স্টল। সে সব দোকানে পশরার বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। এমন কিছু নেই যা এখানে পাওয়া যায় না। পরিবেশ একেবারে ভারতীয়। দোকানির বেশির ভাগই চোলিয়া মুসলমান, তাছাড়া অনেক উত্তর ভারতীয়ও আছে। চারদিকে কথাবার্তা যা শোনা যায়, প্রায়ই অশুদ্ধ পাঁচ-মিশালী হিন্দি। শোর-গোলে কানে তালা লেগে যায়, ভিড় ঠেলে এগোনো দায়। সব চিৎকার চেঁচামেচি ছাপিয়ে ওঠে খেলনার দোকানের পশারীদের উচ্চস্বর,—লে লো লে লো দো-আনা, জাপানী মাল দো আনা, চুনকে লে লো দো-আনা, জো ভি লে লো দো-আনা……।

সেই নাইট মার্কেটেই, ফেয়ার স্ট্রীটের মোড় ছাড়িয়ে আরেকটু এগিয়ে গেলে রাস্তার উত্তর ফুটপাথে পরপর কয়েকটি ফালুদার দোকান। এত ভিড় হয় যে বসবার জায়গা পাওয়া যায় না। সেখানে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দুজন খদ্দের উঠে যেতে আমি আর অমিয় দুটো টিনের চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। দু-গ্লাস ফালুদা এলো।

শিরীনদের ওখান থেকে বেরিয়ে আসবার পর এতক্ষণ অবধি অমিয় কোনো কথা বলেনি। আমিও চুপ করে ছিলাম। গেলাসে দু-তিন চুমুক লাগাবার পর অমিয় হঠাৎ বললো, "শিরীন বলছে আমাকে নিয়ে কলকাতায় যাবে।"

"সত্যি সত্যি?" আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম।

অমিয় মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকালো।

"বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"ওকে কি ওরা যেতে দেবে?"

"ওরা মানে?"

"ওর দিদি জমিলা, ওর ভায়েরা, তারপর দিলওয়ার—।"

"দিলওয়ারের এমন কিছু মাথাব্যথা আছে বলে মনে হয়না। আমি এদেশ ছেড়ে চলে গেলে সে খুশীই হবে। তবে হ্যাঁ, জমিলা বা ওর ভায়েরা আমায় খুব পছন্দ করে না। তবে ওদের জানতে দিচ্ছে কে?"

"কেন, পালিয়ে যাবে নাকি?"

"পালিয়ে যাবো না, না জানিয়ে যাবো।"

"একই কথা," আমি উত্তর দিলাম, "তা-ছাড়া মা-য়িন-ম্যার কি হবে?"

অমিয় একটু ভাবলো, তারপর বললো, "দেখ, মা-য়িন-ম্যার দু-চারদিন কষ্ট হবে হয়তো, কিন্তু আমি চলে গেলে ওর এমন কিছু ক্ষতি হবে না। বরং আমি ওর কাছে থেকে গেলে জীবনে কিছুই করতে পারবো না। এদেশে আমার গানের কীই বা আদর হবে? সারাজীবন তো আর কাওয়ালি গেয়ে চলবে না। বরং কলকাতা বা বম্বে কোথাও চলে গেলে অনেক উন্নতি করতে পারবো, নাম করতে পারবো। আর, এদেশের যা অবস্থা দেখছি, বেশীদিন থাকা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। একদিন না একদিন যখন যেতেই হবে, তখন সময় মতো যাওয়াই ভালো।"

"বেশ তো, যেতেই যদি হবে, তোমার মাকে বাবাকে নিয়ে যাও না। শিরীনকে কেন?"

গেলাসে আর এক চুমুক দিলো অমিয়। তারপর বললো, "বাবা আর মা কোনোদিন দেশে যাবে না। এদেশে যাই হোক, এখানেই পড়ে থাকবে। একথা মনে কোরো না যে শিরীন বলছে বলেই আমি যাওয়ার কথা ভাবছি। আমার যাওয়ার ইচ্ছে অনেকদিন থেকেই। তবে

আমি বাবা বা অন্য কারো কাছ থেকে টাকা নিতে পারবো না। তাই এদ্দিন যাওয়ার সুবিধে করতে পারি নি। শিরীন বলছে, ও কলকাতায় গিয়েও আমার কাছে গান শিখবে। তাহলে আর আমার টাকার অসুবিধে হবে না।"

"কলকাতায় গিয়ে শিরীন টাকা পাবে কোথায়?"

"ওখানে ওর চেনাজানা অনেক আছে। বলছে, মুজরা করে বেশ রোজগার করতে পারবে।"

"তুমি চলে গেলে মা-য়িন-ম্যার খুব কষ্ট হবে। ও এদ্দিন তোমার দেখাশোনা করেছে।"

"আমি কি করবো বলো? ওর বাড়িতে একজন পুরুষ অভিভাবক চাই, সুতরাং ওর জন্যে আমার যা করবার আমিও করেছি। কিন্তু ও তো আমায় বিয়ে করবে না, আমাকে নিয়ে সংসারও করবে না। এভাবে তো চিরকাল চলতে পারে না।"

"ও তোমায় ভালোবাসে খুব।"

"যে ভালোবাসা আমায় জীবনে বড়ো হতে দেবে না, সে ভালোবাসা আমার দরকার নেই।"

সে সময় অমিয়র কথাগুলো আমার খুব নির্মম মনে হোলো। একটু কষ্ট হোলো মা-য়িন-ম্যার জন্যে। বললাম, "মা-য়িন ম্যা জানে?"

"বোধ হয় জানে না। আমি অন্তত কিছু বলিনি।"

"যাওয়ার আগে ওকেও জানাবে না?"

"কাউকে জানাবো না। শুধু আমার মাকে বলবো।"

ফালুদা শেষ করে আমরা উঠে পড়লাম। ইলেকট্রিক ট্রলি বাস ধরলাম ফেয়ার স্ট্রীটের মোড় থেকে। বাসে আর কোনো কথাবার্তা হোলো না। স্পার্কস্ স্ট্রীটের মোড়ে এসে আমি নেমে পড়লাম। অমিয় যাবে আরো অনেক দূর।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অমিয় আমায় বললো, "তোমায় শুধু জানালাম। তুমি কাউকে কিছু বোলো না।"

আমি মাথা নাড়লাম। একটু বিরক্তও হলাম মনে মনে। আমার কী দরকার।

বালাজী রাওএর ছোটো ভাই ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়তো। একদিন কমন রুমে সে আমায় বালাজীর একটি চিঠি দিলো। পড়ে দেখি, আমায় জানিয়েছে যে মা-য়িন-ম্যা আমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। খুব জরুরী দরকার।

একবার ভাবলাম, যাবো না, কী এমন জরুরী দরকার আমার সঙ্গে? ওদের ওসব ব্যাপারে আমার না থাকাই ভালো। তবু কৌতূহল সামলাতে না পেরে বিকেলবেলা গিয়ে উপস্থিত হলাম মা-য়িন-ম্যার বাড়িতে।

গিয়ে দেখি দিলওয়ার বসে আছে। পরনে একেবারে বার্মিজ পোশাক। শুনলাম, মা-য়িন-ম্যা এইমাত্র পাশের বাড়ি গেছে কি একটা কাজে, এক্ষনি আসবে।

"অমিয়ও বাড়ি নেই," সে হেসে বললো, "আজকাল বড়ো একটা থাকেই না।"

"অনেকদিন অমিয়র গান শুনিনি," আমি বললাম। কিছু বলার ছিলো না, একটা কিছু বলতে হবে বলেই বললাম।

"শিরীনের ওখানে গেলেই শুনতে পাবে," বলে দিলওয়ার হাসলো। ঝিকঝিক করে উঠলো তার মুখের একপাশে দুটো সোনার দাঁত। তারপর হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। বললো, "একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে। শিরীন যে এত ছেলেমানুষী করবে আগে ভাবতে পারিনি।"

"তুমি তো তাই চেয়েছিলে," আমি বললাম।

"আমি? না, এতটা আমি চাইনি। আমি চেয়েছিলাম শিরীন ওর কাছে গান শিখুক। আর দিনরাত এখানে পড়ে থেকে অমিয় কি করবে, তাই মাঝে মাঝে ওখানেও যাক, তাতে ওর মন মেজাজ ভালো থাকবে।"

"তোমার কি ক্ষতি ?"

"ক্ষতি ? কিছু না। বরং মা-য়িন-ম্যা যদি বুঝতে পারে যে ওর উপর অমিয়র টান নেই তাতে সবারই ভালো। তবে একটা কথা কি জানো, শিরীন মুসলমানের ঘরের মেয়ে, অমিয় হিন্দু, ওদের বেশী মাখামাখি ভালো নয়।"

"ওরা তো বাঈজী।"

"হ্যাঁ, বাঈজী, কিন্তু বাসবী নয়। মুজরা করে, কিন্তু এমনি পর্দা মানতে হয়। অমিয় আমার বন্ধু বলে শিরীনের ভায়েরা ওকে কিছু বলে না, তা নইলে কবে ছুরি মেরে দিতো। ওদের গুণ্ডার দল আছে কি ভেবেছো ?"

আমি চুপ করে শুনে গেলাম।

দিলওয়ার বলে গেল, "যাই হোক ব্যাপারটা বেশীদূর গড়াতে দেওয়া হবে না। তবে এখনকার মতো যেমনি চলছে চলুক।"

আমি হাসলাম একটু। দাবার চাল চালছে দিলওয়ার। শিরীনকে উপলক্ষ করে অমিয় আর মা-য়িন-ম্যার সম্পর্ক ভেঙে যাক, এটুকুই তার স্বার্থ। বাঞ্ছিতার অনুগ্রহভাজন হওয়ার জন্যে কোনো কোনো লোক কতদূর নামতে পারে, তাই লক্ষ্য করলাম অবাক হয়ে। তবে এমন কিছু স্তম্ভিত হলাম না। নুরজাহানকে পাওয়ার জন্যে জাহাঙ্গীরের মতো লোক তার পূর্বস্বামীকে হত্যা করিয়েছে, আর এতো সামান্য এক দিলওয়ার বক্স্। আওরংজেবের পরবর্তী মোগলদের তো নীতিজ্ঞান বলে কোনো পদার্থ ছিলো না। জাহান্দার শা, ফরুখশিয়ার, মহম্মদ শা, আহমদ্ শা ভোগ বিলাসের বাসনা চরিতার্থ করতে গিয়ে নিজেদের আত্মসম্মান, নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সব কিছু বিসর্জন দিয়ে অধঃপতনের শেষ ধাপ পর্যন্ত পৌঁছুতে দ্বিধা বোধ করেনি। তাদেরই তো রক্ত দিলওয়ারের শরীরে।

মা-য়িন-ম্যা ফিরে এলো, ওর সঙ্গে দু-চারটা কথা বলে উঠে পড়লো দিলওয়ার। সে চলে যাওয়ার পর মা-য়িন-ম্যা আমায় বললো,

"তোমায় খুব জরুরী দরকারে ডেকেছি। আমার একটা কাজ করে দিতে হবে। এ ব্যাপারে তোমায় ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে চাই না।"

ওর কথা শুনে আমি একটু অবাক হলাম। এমন কি গুরুতর ব্যাপার যে আমাকে ছাড়া আর কাউকে সে বিশ্বাস করতে পারে না! ভাবলাম, শোনা তো যাক, তারপর বেশী গোলমেলে ব্যাপার মনে হলে আর এমুখোই হবো না।

মা-খিন-চ্যিকে মোড়ের দোকানে চা আনতে পাঠিয়ে মা-য়িন-ম্যা আমার কাছে এসে বসলো। কিন্তু কোনো কথা শুরু করবার আগেই শুনলাম বাড়ির সামনে একটি ঘোড়ার গাড়ি এসে থেমেছে। মা-য়িন-ম্যা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখলো।

"এরা আবার কে? এখানেই আসছে মনে হচ্ছে। কিন্তু আমি তো এদের চিনি না।"

আমিও জানলায় মা-য়িন-ম্যার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, গাড়ি থেকে দুজন বার্মিজ মহিলা নেমে ভেতরে ঢুকছে। ওদের মুখ দেখতে পেলাম না। শুনলাম, সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসছে। মা-য়িন-ম্যা আর আমি দুজনেই ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। ওরা উপরে উঠে আসতে আমি অবাক হলাম। সাকিনাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে জমিলা। পরনে তার একেবারে বার্মিজ পোশাক। তার পোশাক দেখে আমি অবাক হইনি। এদেশে ভারতীয় মুসলমান মেয়েরা বাইরে বেরোলে অনেক সময় বার্মিজ পোশাক পরে, কারণ তাহলে আর বোরখা পরতে হয়না। আমি অবাক হলাম এজন্যে যে জমিলাকে আমি এখানে আশা করিনি। মা-য়িন-ম্যার সঙ্গে তো তার চেনা নেই।

জমিলাও বোধ হয় আমায় দেখে বিস্মিত হোলো। একটু হেসে সে বললো, "ভাইয়া-জী, তাহলে আমি বাড়ি ভুল করিনি। তবে অনেক খুঁজতে হয়েছে।"

"ইনি কে?" মা-য়িন-ম্যা জিজ্ঞেস করলো আমায়।

আমি উত্তর দেওয়ার আগেই জমিলা পরিষ্কার বার্মিজে তাকে বললো, "আমি জমিলা।"

"জমিলা?" মা-য়িন-ম্যা একবার আমার দিকে, একবার ওর দিকে তাকালো।

"বেশ, দিলওয়ার তোমায় কোনোদিন আমার কথা বলেনি?"

মা-য়িন-ম্যা মাথা নাড়লো। বললো, "না তো! তবে বলবেই বা কেন, আমি তো কোনোদিন ওর কোনো কথা জানতে চাইনা। যাই হোক, এসো, ভিতরে এসে বোসো।"

জমিলা আর সাকিনা মা-য়িন-ম্যার পেছন পেছন ঘরে ঢুকে পাটির উপর পা মুড়ে বসলো। আমিও বসে পড়লাম একপাশে। মা-খিন-চ্যি ততক্ষণে ফিরে এসেছে। সে চায়ের কেটলি আর কাপ ডিশ এনে সবার সামনে রাখলো। মা-য়িন-ম্যা ল্যাকারের পানের বাটা আর এক প্যাকেট পোলো সিগারেট আর বার্মিজ চুরুটের বাক্স রাখলো জমিলার সামনে। জমিলা পান খেলো না, একটি সিগারেট ধরালো। মা-য়িন-ম্যা ধরালো একটি চুরুট।

খানিকক্ষণ মামুলী কথাবার্তা হোলো। ইউরোপে যুদ্ধ চলছে জোর, চিনির দাম বেড়েছে, এখন ছ-আনা বিশা। এক বিশা চালের দাম সাড়ে চার আনা। মাণ্ডালে চালের দাম আরো বেশী। পঞ্চাশ টিক্যাল মাছ পাঁচ আনার কমে পাওয়া যায় না। মিচিনার ওদিকে বন্যা হয়েছে। মৌলমিনের শুঁটকি মাছ বেসিনের শুঁটকি মাছের চাইতে ভালো। বিশেষ করে চিংড়ি শুঁটকি। প্রোম শহরটা খুব নোংরা। ওখানে জমিলা দু-একবার গেছে। ওর ফুফা থাকে সেখানে। জমিলার সঙ্গে একমত হোলো মা-য়িন-ম্যা। সেও ওখানে কয়েকবার গেছে। জমিলা কি টংজী গেছে? যায় নি? একবার যেন যায়। খুব সুন্দর জায়গা।

এই সাধারণ কথাবার্তাও আস্তে আস্তে থেমে গেল। কথাবার্তার মাঝখানে জমিলা আর মা-য়িন-ম্যা যে দুজনে দুজনকে মেপে নিচ্ছিলো সেটা বেশ বুঝতে পারছিলাম। দুজনেই চুপ করে রইলো

কয়েক মুহূর্ত। মা-য়িন-ম্যা নিজের থেকে কিছুতেই জিজ্ঞেস করবে না জমিলা কেন এসেছে, জমিলাও হয়তো কি ভাবে তার আসল প্রয়োজনটা জানাবে হয়তো ভেবে পাচ্ছিলো না। আমি একবার ভাবলাম, হয়তো আমার উপস্থিতিতে জমিলা কুণ্ঠিত বোধ করছে।

বললাম, "তোমরা কথা বলো। আমি কিছুক্ষণ অমিয়র ঘরে গিয়ে বসছি।"

"না, না, আপনি উঠবেন কেন," জমিলা বললো, "আপনি বসুন।" তারপর মা-য়িন-ম্যার দিকে ফিরে হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা, দিলওয়ার কি তোমার এখানে প্রায়ই আসে?"

"হ্যাঁ, প্রায়ই আসে," অবিচলিতভাবে উত্তর দিলো মা-য়িন-ম্যা।

"আমার ধারণা ছিলো সে শুধু আমার কাছেই আসে, আর কোথাও যায় না।"

"সে কেন হবে," মা-য়িন-ম্যা একটু হেসে বললো, "ওর তো দুটো বিবি আছে আর বার্-স্ট্রীটে না কোথায় একজন গুজরাতী বিবিও আছে।"

"তুমি জানো?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলে ও এখানে আসে বলে তুমি রাগ করো না?"

"কেন রাগ করবো? তোমার কাছে যায় বলে তুমি রাগ করো?"

জমিলার মুখ একটু লাল হোলো। বললো, "ও আমার দেখ্ ভাল করে।"

মা-য়িন-ম্যা হাসলো। "যার যেখানে ভালো লাগে, সে সেখানে যাবে," এক মুখ চুরুটের ধোঁয়া ছেড়ে বললো সে, "কে কাকে মানা করতে পারে বলো?"

প্রসঙ্গ পরিবর্তন করলো জমিলা। "অমিয় আজকাল বাড়িতে বেশী থাকে না?"

"কোনো পুরুষ মানুষই বাড়িতে বেশী থাকে না," সহজ ভাবে উত্তর দিলো মা-য়িন-ম্যা।

"ও আমার বোনকে গান শেখায়। প্রত্যেক সন্ধ্যেবেলাটা আমাদের ওখানেই থাকে।"

আমি ভাবলাম এ খবর শুনে হয়তো মা-য়িন-ম্যা বিচলিত হবে। কিন্তু মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে সে উত্তর দিলো, "তাই নাকি? ও একজন কাউকে গান শেখায় জানতাম, তবে তোমার বোনকে শেখায় সেটা জানতাম না।"

জমিলা বললো, "ওদের মধ্যে অন্তরঙ্গতা বেশী হয়ে যাচ্ছে। আমি চাইনা যে ও আমার বোনকে গান শেখায়। তবে আমি কিছু বলতে চাইনা। তুমি যদি ওকে আমার ওখানে যেতে মানা করে দাও তো ভালো হয়।"

"আমি কেন মানা করতে যাবো? বোন তোমার, আমার নয়।"

মা-য়িন-ম্যার উত্তর শুনে আমি হাসি চাপলাম। জমিলার মুখ লাল হয়ে গেল।

"আমার বোন খুব সুন্দর দেখতে।"

"সুন্দর তো তুমিও," মা-য়িন-ম্যা একটু হেসে বললো।

হিয়ার হিয়ার—আমি মনে মনে বললাম। সুন্দর মুখ দিয়ে যদি কাউকে বেঁধে রাখা যায় তো দিলওয়ারকে আটকে রাখোনা, কে মানা করছে? জমিলাও বুঝলো মা-য়িন-ম্যার এই সূক্ষ্ম ব্যঙ্গ।

এই অল্প কয়েকটি কথার মধ্যেই দুজনে দুজনের মনের ভাব, মতলব, সব কিছু পরিষ্কার করে দিলো।

আর বেশী কথার বোধ হয় প্রয়োজন ছিলো না। শুনলাম জমিলা বলছে, "এই বাড়ি কি তোমার নিজের?"

"হ্যাঁ, আমার মায়ের বাড়ি।"

"বাড়িতে কে কে থাকে?"

হিসেব দিলো মা-য়িন-ম্যা। এর পরবর্তী প্রশ্নগুলিও আমি মনে মনে আঁচ করে নিলাম।—আজ বাড়িতে কি রান্না হয়েছে? তোমার হাতের চুড়িগুলো কোন স্যাকরা বানিয়েছে—,কথা বলতে বলতে সংসারের আর দশজন মেয়ের মতো আস্তে আস্তে উঠে সিঁড়ির

গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াবে, নামতে নামতে কথা বলবে, রাস্তায় নেমেও কথা ফুরোবে না।

তাই হয়তো হোতো, কিন্তু কথাবার্তায় বাধা পড়লো। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ শুনলাম।

"অমিয় আসছে বুঝি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না, দিলওয়ার।"

"দিলওয়ার?" জমিলার মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

"হ্যাঁ, এটা ওর পায়ের শব্দ," মা-ম্লিন-ম্যা খুব সহজ ভাবে বললো খুব অন্তরঙ্গের মতো।

দিলওয়ার গটমট করে ঘরে ঢুকলো।

"মা-ম্লিন-ম্যা, তোমায় একটা কথা বলতে ভুলে গেছি—," বলতে বলতে জমিলাকে দেখে সে থেমে গেল, "একি জমিলা, তুমি এখানে?"

জমিলা উত্তর দেওয়ার আগেই মা-ম্লিন-ম্যা বললো, "অমিয়র খবর নিতে এসেছে।"

"খবর নিতে এসেছে? না, দিতে এসেছে?"

এবারও উত্তর দিলো মা-ম্লিন-ম্যা, "অমিয়র সম্বন্ধে আমায় কেউ এমন কি খবর দিতে পারে যা আমি জানিনা?"

দিলওয়ার জমিলার দিকে তাকালো, জমিলা তাকালো দিল-ওয়ারের দিকে। দুজনেরই শাণিত ইস্পাতের মতো দৃষ্টি। কিন্তু দিলওয়ারের ব্যক্তিত্ব অনেকটা বেশী। তার দৃষ্টির সামনে জমিলা আস্তে আস্তে নিজের চাউনি নামিয়ে নিলো।

দিলওয়ারের ঠোঁটের কোণে একটু হাসি ফুটে উঠলো। খুব শান্ত গলায় বললো, "জমিলা, তুমি বাড়ি যাবে না?"

"হ্যাঁ, যাচ্ছি। তুমিও চলো।"

"আমি?"

"হ্যাঁ। আমি একা যেতে চাইনা।"

"আচ্ছা, চলো তোমায় পৌঁছে দিয়ে আসি।"

"না," বললো মা-ম্লিন-ম্যা।

সবাই ওর দিকে ফিরে তাকালো।

মা-য়িন-ম্যা বললো, "দিলওয়ার থাক। ওর সঙ্গে আমার দরকার আছে।"

দিলওয়ার একটু অবাক হয়ে তাকালো মা-য়িন-ম্যার দিকে। জমিলার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো।

মা-য়িন-ম্যা বলে গেল, "জমিলার সঙ্গে সলিল যাক। সেও তো চলে যাচ্ছিলো।"

দিলওয়ার বলে উঠলো, "হ্যাঁ, সেই ভালো, সলিল গিয়ে পৌঁছে দেবে জমিলাকে। আর শিরীনের সঙ্গেও দেখা করে আসবে। সে তো পরশুও জিজ্ঞেস করছিলো তার ভাইয়া-জীর খবর।"

জমিলা কোনো কথা না বলে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল। সাকিনা এতক্ষণ চুপ করে বসেছিলো। সেও চললো তার মালিকানীর পেছন পেছন। আমিও তাদের অনুসরণ করছিলাম। ঘরের বাইরে আসতেই মা-য়িন-ম্যা আমাকে ডাকলো। আমি ফিরে তাকাতে সে আমার কাছে এসে নিচু গলায় বললো, "তোমার সঙ্গে কিন্তু আমার একটা জরুরী কথা আছে। এধারে এসো।"

আমরা অমিয়র ঘরের ভিতর গিয়ে দাঁড়ালাম।

মা-য়িন-ম্যা বললো, "তোমায় আমার হয়ে একটা কাজ করতে হবে।"

"কি কাজ, বলো।"

"দেখ, অমিয় বোধ হয় মুলুক যাচ্ছে।"

"তুমি কি করে জানো?" আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"সেদিন ওর বাক্সটা গুছোতে গিয়ে দেখি ভেতরে কয়েক জোড়া নতুন ধুতি ও কয়েকটা নতুন কুর্তা। ও তো ধুতি কুর্তা পরে না কখনো। এদেশে ওর ধুতি কুর্তা কি কাজে লাগে? অনেকদিন ধরে বলছিলো, কলকাতায় গেলে এই সুবিধে, ওই সুবিধে। আমি কিছু বলিনি। আমার মনে হচ্ছে ও বোধ হয় চলে যাওয়ার চেষ্টা করছে।

শিগ্‌গিরই চলে যাবে। তা যাক। তাতে যদি ওর ভালো হয় তো আমি খুশী খুব। তবে আমায় যখন কিছু বলেনি আমিও ওকে কিছু বলবো না। এখন, তোমায় একটা কাজ করতে হবে।"

"কি ?"

"ও অনেক দূর যাচ্ছে। ওর তো টাকা লাগবে। আমি জানি ওর কাছে টাকা নেই। ওর মা-বাবাও ওকে বেশী টাকা দিতে পারবে না। কতো আর দেবে, চল্লিশ কি পঞ্চাশ, তার বেশী ওরা দিতে পারবে না। আমি তোমায় দুশো টাকা দিচ্ছি, টাকাটা ওকে দিয়ে দিও,—তবে একথা জানতে দিও না টাকাটা আমি দিয়েছি।"

"তা হলে কি বলবো ?"

"বোলো টাকাটা তুমি দিচ্ছো ?"

"আমি ? আমি কোথেকে পাবো অতো টাকা ? ও বিশ্বাস করবে না।"

"তাও তো বটে! আচ্ছা, এক কাজ করো, ওর মাকে গিয়ে বলো, টাকাটা ওর বন্ধুরা ওর জন্যে চাঁদা করে তুলেছে, কিন্তু ওকে জানতে দিতে চায় না। তাই তাঁর হাতে টাকাটা দিয়ে দিও। উনি দিয়ে দেবেন অমিয়কে, নিজের নাম করে।"

আমি তাকিয়ে দেখলাম মা-য়িন-ম্যাকে। বললাম, "আচ্ছা।"

একবার মনে হোলো টাকাটা কি দিলওয়ার দিচ্ছে ? ওর মুখ দেখে সেটা মনে হোলো না।

সে আস্তে আস্তে বললো, "আরো দিতাম। কিন্তু আমার হাতে এখন টাকা নেই। আমার পায়ের সোনার মল দুটো যাচাই করে দেখলাম দুশোর বেশী পাওয়া যাবে না।"

তার পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম পা দুটো খালি। শুধু ভেলভেটের "ফানা" পরে আছে। একটু দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো, কি জানি হয়তো পায়ের সোনার মলের জন্যে। মেয়েরা প্রাণে ধরে গয়না বাঁধা দিতে পারে শুধু একমাত্র প্রিয়জনের জন্যে।

দেখলাম ওর চোখ জলে ভরে এসেছে। সে চোখ পিটপিট করে

চোখের জল ঠেকিয়ে রাখলো। একটু ধরা গলায় বললো, "আজ তুমি যাও সলিল। দিলওয়ারের সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে। তুমি পরশু এসে টাকা নিয়ে যেও।"

দিলওয়ারের সঙ্গে কাজ আছে? কি জানি, হয়তো অমিয় চলে যাওয়ার কথা ভাবছে বলে দিলওয়ারের কূটনীতি সফল হোলো।

আমি আস্তে আস্তে নিচে নেমে এলাম। দেখলাম গাড়ির ভিতর সাকিনা আর জমিলা আমার অপেক্ষা করছে।

"আসুন ভাইয়া-জী।"

আমি উঠে বসলাম গাড়ির ভিতর। গাড়ি ছেড়ে দিলো। হঠাৎ দেখি জমিলা ফুলে ফুলে কেঁদে উঠলো। সাকিনা হতভম্ব হয়ে তাকালো একবার ওর দিকে, একবার আমার দিকে। আমি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে মুখ ফিরিয়ে রইলাম।

কিছুক্ষণ পর দেখি জমিলা নিজেকে সামলে নিয়েছে। তার চোখ দুটো ফোলা, কিন্তু গম্ভীর মুখে একটা স্থির সিদ্ধান্তের দৃঢ়তা।

দুদিন পর বোধ হয় ছিলো রোববার, কি কোনো একটা ছুটির দিন। কর্টিয়েথ্ স্ট্রীট আর স্পার্কর্স স্ট্রীটের দুটো মোড়ের মাঝামাঝি জায়গায় ঠিক মণ্টগোমেরি স্ট্রীটের উপর ছিলো একটি কাকা-টী-শপ। ছুটির দিনে সকালবেলা সেখানে বসে আড্ডা দিতাম আমি আর কলেজের কয়েকজন বন্ধু। দিলওয়ার আমার সে আড্ডার খবর জানতো। হঠাৎ দেখি সে এসে উপস্থিত। পরনে সিল্কের স্পোর্টস্ শার্টের উপর একটি সিল্কের লুঙ্গি, পায়ে বার্মিজ ফানা। সে আমায় ডেকে বাইরে নিয়ে গেল।

মুখ তার খুব গম্ভীর। বললো, "অমিয় কি রকম বেইমান দেখেছো? সে শিরীনকে নিয়ে পালিয়ে গেছে।"

"পালিয়ে গেছে? কবে?" আমি খবরটা শুনে খুব বিস্মিত হলাম তা নয়, তবে এত তাড়াতাড়ি যে ব্যাপারটা ঘটবে সেটা আশা করিনি।

"আজ সকাল থেকে শিরীনকে পাওয়া যাচ্ছে না।"

আমি আর কি বলবো, চুপ করে রইলাম।

"তোমায় একটা কাজ করতে হবে," বললো দিলওয়ার।

কি কাজ, সেকথা শুনবার আগ্রহও আমার ছিলো না। বললাম, "আমি পারবো না।"

"খুব সামান্য কাজ, ওর বাড়ি গিয়ে একটু দেখে এসো— ।"

"দেখ," কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে বললাম, "আমি কিছু করতে পারবো না। তোমাদের কিছু করতে হয় তো পুলিসে খবর দাও।"

"পুলিস!" দিলওয়ারের চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, "কার পুলিস? ইংরেজের পুলিসে খবর দেবো আমি, মীর্জা মুহম্মদ দিলওয়ার বক্স্? যা করবার আমি নিজেই করবো।"

"করো, কিন্তু আমায় এসবে জড়িয়ো না।"

দিলওয়ার একটু শান্ত হয়ে গেল, "হ্যাঁ, তা ঠিক। তুমি করবে কেন? তুমি তো অমিয়রও বন্ধু," তারপর একটু শ্লেষের সঙ্গে বললো, "আর শিরীনের ভাইয়া-জী।"

দিলওয়ার চলে গেল। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, কাছে দাঁড়িয়ে ছিলো দুজন ষণ্ডামার্কা মুসলমান। তারাও হাঁটতে শুরু করলো দিলওয়ারের পেছন পেছন।

আমি ফিরে এলাম আমার কলেজের বন্ধুদের আড্ডায়। কিন্তু মন বসলো না। বাইরে এমন মিষ্টি রোদ্দুর, দূরে শোনা যাচ্ছে চলতি রেল গাড়ির আওয়াজ,—আর এমন দিনে অমিয় পালিয়েছে শিরীনকে নিয়ে?

চুপচাপ চা খেলাম এক কাপ, তারপর এক কাপ দুধ-চিনি বিহীন চায়ের পাতলা লিকার, রেঙ্গুনের রেস্তরাঁর পরিভাষায় যাকে বলে "সাদা।" সাদার কোনো দাম নেই, চায়ের পর সাদা ফ্রী। সাদা ছাড়া রেস্তরাঁ-বিলাসীর মৌজ হয় না। যারা একটু আয়েস করবার জন্যে রেস্তরাঁয় যায়, চা খেয়ে হাঁক ছাড়ে এই কাকা, সাদা লাও। তারপর সাদায় একটু একটু করে চুমুক দিতে দিতে হাতের সময় কাটিয়ে দেয়। যাদের সাদা খাওয়ার অভ্যেস আছে, তারা জানে

সাদার একটা নেশা আছে। সাদা খেতে খেতে বুঁদ হয়ে থাকা যায় অনেকক্ষণ।

সাদায় চুমুক দিতে দিতে আমার মনে পড়ছিলো বারবার, না অমিয়র কথা নয়, শিরীনের কথা। ওর দেওয়া রুমালখানি পকেটেই ছিলো। বার করে দেখলাম। খুব মনে হোলো, যদি একবার দেখা হয়ে যায়।

বাড়ি এসে দেখি, একটি ছেলে বসে আছে আমার জন্যে। তার হাতে একটি চিঠি। অমিয় লিখেছে। পড়লাম, তারপর তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কোথায় সে ?"

"বোটাটং।"

অমিয়র সঙ্গে এসে দেখা করলাম। এক সুরতী মুসলমান বন্ধুর বাড়িতে সে আশ্রয় নিয়েছে আজকের মতো। শিরীনকে রেখেছে অন্য এক জায়গায়, কোথায় সে বললো না। আমিও জিজ্ঞেস করলাম না। শুনলাম, কাল সকালের জাহাজে ওরা কলকাতা যাচ্ছে।

"শিরীনকে নিয়ে যাবে কি করে ? যদি ধরা পড়ো।"

"আমরা যে কলকাতা যাচ্ছি এটা সন্দেহ করবে না। সবাই ভাববে আমি শিরীনকে নিয়ে কোথাও জঙ্গলে চলে গেছি।" রেঙ্গুনের ভারতীয়দের পরিভাষায় মফস্বলকে বলে জঙ্গল। একেবারে বার্মিজের হুবহু অনুবাদ, কারণ বার্মিজ ভাষায় শহরের বাইরের অঞ্চল হোলো "ট", অর্থাৎ বন বা জঙ্গল, গ্রাম্য লোক হোলো ট-দা, অর্থাৎ জঙ্গলের সন্তান।

অমিয়র কাছে ওর প্ল্যান শুনলাম। তার সুরতী মুসলমান বন্ধুর পরিবারের মেয়েরাও কলকাতা যাচ্ছে। তাদের সঙ্গে শিরীনও যাবে। শিরীনের আসল পরিচয় অমিয় দেয়নি, বলেছে সে জেরবাদী মেয়ে। সুতরাং ওরা বেশী প্রশ্ন করেনি। সে যে প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ে, নাবালিকা নয়, তাকে অমিয় বিয়ে করে নিয়ে যাচ্ছে, শুধু এটুকু শুনেই নিশ্চিন্ত হয়েছে। তবে কেন লুকিয়ে যাওয়া, এ প্রশ্ন যে ওঠে নি, তা-নয়। অমিয় ওদের বুঝিয়ে দিতে পেরেছে যে শিরীনের

আত্মীয়স্বজন জাহাজঘাটায় এসে গণ্ডগোল করতে পারে, শুধু সেই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়ানোর জন্যেই এই ব্যবস্থা। ওদের দায়িত্ব শুধু শিরীনকে সঙ্গে নিয়ে জাহাজে ওঠা। অমিয় একটু পরে একা যাবে। জাহাজে ওঠবার পর থেকেই সমস্ত দায়িত্ব অমিয়র।

ওরা অমিয়কে খুব ভালোবাসতো। ওর জন্যে এটুকু করতে রাজী হোলো।

"ঝুঁকি নিচ্ছিই," বললো অমিয়, "এসব তো একেবারে নির্ঝঞ্ঝাটে হয়না।"

"শিরীনের জন্যে তুমি এতো করছো?"

"সে আমার জন্যে কম কি করছে?"

আমার খুব ইচ্ছে করছিলো একবার শিরীনের সঙ্গে দেখা করবার। কিন্তু অমিয় কিছু বললো না, আমিও মুখ ফুটে বলতে পারলাম না। কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে উঠে এলাম।

পরে হঠাৎ মনে হোলো মা-য়িন-ম্যা বলেছিলো ওর কাছ থেকে টাকা এনে অমিয়কে দিতে। একবার ভাবলাম, যাই, টাকাটা নিয়ে আসি ওর কাছ থেকে, কিন্তু তারপর মনে হোলো, এখন যাওয়া হবে না। আগে হলে হোতো। এখন গেলে দিলওয়ারের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে, জানাজানি হয়ে যেতে পারে। অমিয় বলেছিলো কলকাতায় পৌঁছে ওর ঠিকানা জানিয়ে আমায় চিঠি দেবে। ভাবলাম, টাকাটা ওর কাছে পরে পাঠিয়ে দেবো।

সকাল আটটায় জাহাজ ছাড়বে স্যুলে প্যাগোডা হোয়ার্ফ থেকে। সকালে ঘুম ভাঙবার পর থেকেই মনে পড়ছিলো শিরীনের কথা। হঠাৎ উঠে পড়লাম। জাহাজঘাটায় গিয়ে ওকে একবার দূর থেকে দেখবার ইচ্ছে রোধ করতে পারলাম না।

স্ট্র্যাণ্ড রোড থেকে বাস ধরে স্যুলে-প্যাগোডা হোয়ার্ফে যখন গিয়ে পৌঁছালাম তখন সাড়ে সাতটা বাজে। হোয়ার্ফের গায়ে কলকাতার জাহাজ নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে। ধোঁয়া উঠছে ফানেল

থেকে। চারদিকে যাত্রী, কুলি আর কাস্টমের লোকের ভিড়। পুলিস দাঁড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। মোটর, ট্যাক্সি, রিক্শ, ঘোড়ার গাড়ি আসছে কাতারে কাতারে। চারদিকে হৈ চৈ, হট্টগোল, চিৎকার চেঁচামেচি।

সামনে বয়ে যাচ্ছে রেঙ্গুন নদী। আশেপাশের সাম্পানের ঘাটে সাম্পানের ভিড়। চাটগেঁয়ে মুসলমান মাঝিরা চিৎকার করে সংগ্রহ করছে নদীর ওপারে ডালা-র যাত্রী। আস্তে আস্তে এদিক ওদিক ভেসে যাচ্ছে একটি দুটি স্টিমলঞ্চ। দূর ওপারে ডালার স-মিলগুলোর কার্নেস থেকে ধোঁয়া উঠে মিশে যাচ্ছে আকাশে।

এমন সুন্দর সকাল,—আর শিরীন এদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তার সঙ্গে অমিয়। ভাবতে বেদনাবোধ করলাম। তাকিয়ে দেখলাম চারদিকে, যদি শিরীন বা অমিয়কে দেখতে পাওয়া যায়।

ইওরোপে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে হোয়ার্ফের ভিতরে শুধু যাত্রীদের ছাড়া আর কাউকে ঢুকতে দেওয়া হয় না। খুব কড়াকড়ি এ ব্যাপারে। হোয়ার্ফে ঢোকার মুখে এক জায়গায় কাঠের রেলিং দিয়ে ঘেরা। যারা নিজের লোকজনকে বিদায় দিতে এসেছে, তারা এসে ভিড় করেছে সেখানে। জনতার বেশির ভাগ ভারতীয়,—মাদ্রাজী, বাঙালী, পার্শী, মাড়ওয়ারি, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান। কিছু ইংরেজ যাত্রী দাঁড়িয়েছে একপাশে। সে সময় ওরা রাজার জাত, তাই উদ্ধত মুখ করে সবার ছোঁয়া বাঁচিয়ে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঢোকার মুখে জাহাজ কোম্পানির একজন লোক দাঁড়িয়ে যাত্রীদের টিকিট পরীক্ষা করছে। তার পাশে নীল সার্জের প্যান্ট আর সাদা কোট পরে একজন পুলিস-সার্জেণ্ট। কাছে দাঁড়িয়ে কুলিদের ধমকাচ্ছে নীল সার্জের ইউনিফর্ম পরা দুজন পুলিস।

চারদিকে তাকিয়ে দেখলাম। দু-তিন দল মহিলা চলে গেল। আমি দাঁড়িয়েছিলাম রেলিং ঘেঁষে, যাতে চেনা কেউ এদিক দিয়ে যাওয়ার সময় আমায় দেখতে পায় সহজেই। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবার পর আরেক দল এলো। শিরীন তাদের মধ্যেও নেই।

হঠাৎ চেনা গলা শুনলাম পেছনে। ফিরে তাকিয়ে দেখি অমিয়।

"শিরীন কোথায়?"

"দেখতে পাওনি? সে তো গেল একটু আগে। তুমি কোন দিকে তাকিয়েছিলে? সে তো বার বার পেছন ফিরে ফিরে তোমায় দেখছিলো।"

শুনে মন ভারী হয়ে গেল।

আটটা বাজতে পাঁচ মিনিট।

"চলি ভাই। কলকাতা পৌঁছে তোমায় চিঠি লিখবো," বলে সে আমার হাত ধরে একটা চাপ দিলো।

সে চলে যাচ্ছিলো। এমন সময় একটি বাচ্চা ছেলে এলো তার কাছে, মুখ দেখে মনে হোলো জেরবাদী, বার্মিজও হতে পারে। অমিয়র কাছে এসে বার্মিজে বললো, "আপনাকে এক মিনিটের জন্যে ডাকছে।"

একটু দূরে একটি গাড়ি দাঁড়িয়ে। ভেতরে কে আছে বোঝা গেল না। ছেলেটি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলো।

"কে ডাকছে?" জিজ্ঞেস করলো অমিয়।

"মা-য়িন-ম্যা।"

অমিয় এক মুহূর্তের জন্যে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালো। তারপর সামলে নিলো নিজেকে। আমায় বললো, "যাক এসেই যখন পড়েছে, তখন এক মিনিটের জন্যে দেখা করে আসি।"

মালসুদ্ধ কুলিকে আমার কাছে দাঁড় করিয়ে সে এগিয়ে গেল ভিড়ের বাইরে গাড়িটার দিকে। আমি তাকিয়ে দেখছিলাম। সে কাছে যেতেই গাড়ির দরজা খুলে গেল। ভিড়ের মধ্যে থেকে এক নিমেষে তার পেছনে এসে দাঁড়ালো একজন জেরবাদী, সে পেছন থেকে অমিয়কে ঠেলে দিলো গাড়ির ভেতর, আর ভেতর থেকে দুটো সবল হাত তাকে গাড়ির অভ্যন্তরে টেনে নিলো। অন্য লোকটিও উঠে পড়লো সঙ্গে সঙ্গে। আর চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই

গাড়ি হোয়ার্ফ অঞ্চল থেকে বেরিয়ে পড়ে স্ট্র্যাণ্ড রোড ধরে উধাও হয়ে গেল।

এত তাড়াতাড়ি ঘটে গেল ব্যাপারটা যে বিশেষ কেউ টেরও পেলো না। আমিও কি করবো ভেবে পেলাম না প্রথমটা। এদিকে জাহাজে হুইস্‌ল্ দিয়েছে। প্রচুর আওয়াজ করে সিঁড়ি নামানো হচ্ছে। আমি তাড়াতাড়ি ছুটে গেলাম একজন পুলিস সার্জেণ্টের কাছে, তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম ব্যাপারটা। হয়তো খুব উত্তেজিতই হয়েছিলাম, ঠিক মতো বোঝাতে পারছিলাম না।

সার্জেণ্টের কাছে দাঁড়িয়েছিলো লুঙ্গির উপর ইউনিফর্মের কোট পরা একজন বার্মিজ এস-আই। ডিউটিতে লুঙ্গি পরা বিধান নয়, কিন্তু ওরা অনেক সময় পরতো, কেউ কিছু বলতে সাহস করতো না। সে একটু হেসে জিজ্ঞেস করলো, "বাঙালী বাবু? গাড়িতে তুলে নিয়ে গেছে কয়েকজন জেরবাদী?" সার্জেণ্টের দিকে ফিরে সে চোখ টিপে একটু হাসলো। এরকম ব্যাপার যে রেঙ্গুনের জাহাজ-ঘাটায় হয় না মাঝে মাঝে তা নয়। বর্মী বা জেরবাদী মহিলার ভারতীয় স্বামীরা অনেক সময় ওদের সঙ্গে এদেশে ফূর্তি করে কাটিয়ে, পয়সা-কড়ি কিছু জমিয়ে, তারপর তাদের না জানিয়ে দেশে চলে যায়। এ একটা জাতীয় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। চলে যাওয়ার সময় এদেশীয় স্ত্রীর আপনজনেরা খবর পেলে অনেক সময় জাহাজঘাটায় এসে ছলে বলে কৌশলে ভারতীয় স্বামীর জাহাজ ধরবার প্রচেষ্টা ব্যর্থ করবার চেষ্টা করে। বর্মী পুলিস, বিশেষ করে অফিসারেরা তাকিয়েও তাকায় না, জোর করে আটকে রাখা বা তুলে নিয়ে যাওয়া যতোই বেআইনী হোক, চেষ্টা করে যতদূর সম্ভব হস্তক্ষেপ না করবার। এই এস-আইও হয়তো ভাবলো ওরকমই একটা ব্যাপার। জিজ্ঞেস করলো, "তোমার চেনা লোক?"

"হ্যাঁ।"

"একলা ছিলো?"

"হ্যাঁ।"

"ওর মালপত্র ?"

দেখিয়ে দিলাম। একজন পুলিস এসে সেগুলো নিজের হেপাজতে নিলো।

"তুমি ভেবো না। ওকে ওরা ঠিক জায়গায় পৌঁছে দেবে", বললো সেই বার্মিজ এস-আই, "ইউ হ্যাভ সীন নাথিং। আই হ্যাভ হার্ড নাথিং। ফরগেট ইট।"

আমারও আর কিছু করবার ছিলো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

জাহাজ ছেড়ে দিলো। রেলিঙের এধারে যাত্রীদের আপনজনেরা হাত নাড়ছে, রুমাল নাড়ছে। তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে ঘাড় উঁচু করে আমি দেখবার চেষ্টা করলাম। ডেকের যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যে অনুসন্ধান করতে লাগলাম শিরীনের মুখখানি। যখন একজনকে দেখে মনে হোলো সে শিরীন, ততক্ষণে জাহাজ হোয়ার্ফ থেকে অনেকখানি সরে গেছে।

আস্তে আস্তে নদীর মাঝখানে সরে গেল কলকাতার জাহাজ, তারপর এগিয়ে চললো পূব দিকে।

রেঙ্গুন-নদীর ঘোলাটে জল তখন চিকচিক করছে সকালবেলার প্রখর রোদ্দুরের আলোয়। আকাশে চিল উড়ছে। স্ট্র্যাণ্ড রোডের ধারে রেল লাইনের অন্য পাশে কুরঙ্গী শ্রমিকেরা তাদের ভাষায় একঘেয়ে গান গেয়ে শাবল দিয়ে পাথর ভাঙছে। পাশের আরেকটি হোয়ার্ফে প্রচণ্ড আওয়াজ করে একটি মস্তো বড়ো ক্রেন মাল নামাচ্ছে একটি বিশালকায় বিদেশী জাহাজ থেকে। মাল বোঝাই অগুনতি লরি দ্রুতগতিতে ছুটে যাচ্ছে এদিক থেকে ওদিকে। জনাকীর্ণ বন্দরের অবিরাম কর্মব্যস্ততার মাঝখানে একলা নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। একটা অব্যক্ত বেদনায় মন ভার হয়ে গেল।

শিরীন একলা ভেসে চলে গেল।

আস্তে আস্তে বাড়ির পথ ধরলাম। কয়েক পা এগোতেই দেখি দিলওয়ার বেরোচ্ছে একটি ট্যাক্সি থেকে। তাকে দেখে

অবাক হলাম। চুল উস্কোখুস্কো পরনে শুধু একটি হাফ শার্ট আর ফিকে সবুজ শান-বাওন্দি।

"জাহাজ ছেড়ে দিয়েছে ?"

"অনেকক্ষণ," আমি বললাম।

"অমিয়র সঙ্গে দেখা হয়েছে ?"

"হ্যাঁ।" এর বেশী কিছু বলতে আমার ইচ্ছে করলো না।

"আর কাউকে দেখেছো ?"

আমার সন্দেহ হোলো। কার কথা জানতে চাইছে সে? কি করেই বা জানলো যে অমিয়র আজকের জাহাজ ধরবার কথা ?

আমি কোনো উত্তর দেওয়ার আগেই দিলওয়ার বললো, "আজকের জাহাজে জমিলাও চলে গেল ওর এক ভাইকে সঙ্গে নিয়ে।"

"জমিলা ?" আমি অবাক হয়ে গেলাম। "এই জাহাজে ?"

"হ্যাঁ।"

মোটে আধ ঘণ্টা আগে খবর পেয়েছিলো দিলওয়ার। ওর চেনা কে একজন চাকরি করতো সিন্ধিয়া কোম্পানিতে। সে অমিয়কে দু-তিনদিন আগে দেখেছিলো কলকাতার টিকিট কিনতে। আজ সকালে মোগল স্ট্রীটে হঠাৎ দিলওয়ারের সঙ্গে দেখা হতে বললো, "অমিয় বাবু তাহলে কলকাতা চললো শেষ পর্যন্ত ?"

দিলওয়ার তার বিস্ময়ের ভাব গোপন করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানা কথায় জেনে নিলো সে কবে যাচ্ছে, কটা টিকিট কিনেছে, কটায় জাহাজ। আটটায় জাহাজ শুনে একটা ট্যাক্সি করে তক্ষুনি ছুটে গেল জমিলার কাছে, কারণ তার বুঝতে বাকী ছিলো না অন্য টিকিটটা কার জন্যে। সেখানে গিয়ে দেখে বাড়ি ফাঁকা। শুধু জমিলার অন্য এক ভাই একলা বসে আছে। জমিলার চাচা গেছে জমিলাকে জাহাজে তুলে দিতে।

শুনে দিলওয়ারের বিস্ময় আরো বেড়ে গেল। জমিলাকে

জাহাজে তুলে দিতে? কেন? তখন জানলো যে জমিলাও চলে যাচ্ছে, কলকাতা।

সে একটি চিঠি রেখে গিয়েছিলো দিলওয়ারের জন্যে। লিখেছে, —এদেশে ছিলাম শুধু তোমারই জন্যে। যখন দেখলাম, শুধু আমায় নিয়ে তোমার মন ভরলো না, তখন মনে হোলো এদেশে আর কিসের জন্যে থাকবো। আমি আর ফিরবো না। তুমি সুখে থেকো। তাহলে আমিও সুখে থাকবো।

"মেয়েটা একেবারে বোকা," বললো দিলওয়ার, "যাক গেছে, ভালোই হয়েছে। এখানে থেকে আর কি করতো? ও যখন সঙ্গে আছে তখন শিরীনের জন্যেও আমার ভাবনা নেই। একলা অমিয়র সঙ্গে চলে যাওয়াটা আমার ভালো লাগতো না।"

আমি ভাবলাম, অমিয়র কি হয়েছে দিলওয়ার কি জানে না? কিন্তু ওকে বলি বলি করেও বলতে পারলাম না।

"অমিয় নিশ্চয়ই মা-য়িন-ম্যাকে বলে যায়নি। যাই, এবার ওকে খবরটা দিয়ে আসি। মা-য়িন-ম্যা বুঝুক ওর উপর কতো টান অমিয়র।"

বেচারা দিলওয়ার!—আমি মনে মনে ভাবলাম—ওর এখনো আরো একটি হতাশা বাকী আছে।

"তুমি এখন কোথায় যাবে?"

"বাড়ি," আমি উত্তর দিলাম।

"তাহলে ঢোকো ট্যাক্সিতে। আমি তোমায় বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে যাবো।"

এরপর আমি আর অমিয়র খোঁজ করিনি, খোঁজ করবার ইচ্ছেও ছিলো না। দিলওয়ারের সঙ্গেও দেখা হয়নি মাসখানেক। তদ্দিনে গরমের ছুটি শেষ হয়ে আবার কলেজ শুরু হয়েছে। অনার্সের প্রথম বছর শেষ হয়ে দ্বিতীয় বছর পড়েছে। বেড়ে গেছে পড়াশুনোর চাপ।

একদিন মেঘলা সন্ধ্যায় দেরী করে ফিরছিলাম ইউনিভার্সিটি থেকে। সুলে-প্যাগোডা রোডের মোড়ে এসে কোকাইনের ময়ূর-মার্কা আর-ই-টি বাস থেকে নেমে পড়লাম। এখানে বাস বদল করতে হবে। এদিক দিয়ে চিংড়ি-মাছ মার্কা বাস যাবে ডেলহাউসি স্ট্রীটের দিকে, সেই বাস ধরে বাড়ি ফিরবো।

দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ পেছন থেকে এসে একজন কাঁধে হাত রাখলো। ফিরে তাকিয়ে দেখি দিলওয়ার।

"কোথায় চললে ?"

"কলেজ থেকে ফিরছি।"

"তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই হোলো। তোমার কথা ভাবছিলাম কয়েকদিন ধরে। আজ দেখা না হলে দু-একদিনের মধ্যেই তোমার বাড়ি যেতাম। তোমার নিশ্চয়ই খুব ক্ষিধে পেয়েছে। চলো কোথাও চা খেয়ে নিই।"

"আজ থাক," আমি বললাম, "আরেকদিন হবে—।"

"আরে চলো ইয়ার, চলো, চলো। কোথায় যাবে ? চলো, কন্টিনেণ্ট্যালে যাই।"

ওর সঙ্গে কন্টিনেণ্ট্যালে ঢুকলাম। বেয়ারা এলো চা আর স্যাণ্ডুইচ নিয়ে। খানিকক্ষণ এটা ওটা সেটা নানারকম মামুলী কথাবার্তা হোলো। ইউনিভার্সিটি ইউনিয়ান স্ট্রাইক করবে ভাবছে। বার্মায় সমস্ত জাপানী সম্পত্তি সরকার বাজেয়াপ্ত করেছে। যুদ্ধ হবে নাকি ? জাপানীরা কি সাহস করবে ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে ? জেরামার নেতারা একজনের পর একজন ফেরার হয়ে যাচ্ছে। ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়নের প্রেসিডেণ্ট অওঙ-সানও ফেরার হয়েছে। সরকার এদের গ্রেপ্তার করতে চাইছে কেন ? ইণ্ডিয়ান ইমিগ্রেশান এনকোয়ারি কমিটির রিপোর্ট বেরোবার সময় হয়ে এলো। শোনা যাচ্ছে গভর্ণমেণ্ট ভারতীয়দের সম্বন্ধে নানারকম কড়া ব্যবস্থা করবে। এম-এ রশীদ, সি-এ সুর্মা, মিস্টার রসূল, মিস্টার তায়াবজী, কে-সি বোস, এরা সবাই নাকি এর বিরুদ্ধে

ভারতীয় জনমত সৃষ্টি করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু তাতে কি কিছু হবে? ইণ্ডিয়ানদের চলে যেতে হবে এদেশ থেকে। তবে যেই যাক্, দিলওয়ার যাবে না। তার বাপ-দাদা এদেশে জন্মেছে, এদেশে মাটি পেয়েছে, সেও থেকে যাবে। তার কে আছে হিন্দুস্তানে?

এই ধরণের সব নানারকম কথাবার্তা।

আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, "অমিয়র কি খবর? ওর সঙ্গে দেখা হয়?"

দিলওয়ার তাকালো আমার দিকে। তারপর খুব জোরে হেসে উঠলো। অনেকক্ষণ হেসে তারপর জিজ্ঞেস করলো, "তুমি বুঝি জানতে যে, অমিয় কলকাতায় যেতে পারে নি?"

"হ্যাঁ জানতাম। জাহাজঘাটায় মা-য়িন-ম্যার লোকেরা ওকে আমার চোখের সামনেই গাড়িতে তুলে নিয়ে চলে গিয়েছিলো।"

"মা-য়িন-ম্যার লোক?" দিলওয়ার চোখ কপালে তুললো।

"তাই তো মনে হোলো। একজন এসে অমিয়কে বললো, ট্যাক্সিতে মা-য়িন-ম্যা বসে আছে। অমিয় দেখা করতে গেল, ব্যস, আর জাহাজ ধরতে পারলো না।"

দিলওয়ার আবার হেসে উঠলো। হাসি থামতে বললো, "তাহলে শোনো ব্যাপারটা।"

সেদিন আমাকে বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে দিলওয়ার কিন্তু মা-য়িন-ম্যার বাড়ি যায় নি। তার মনে হোলো শুধু শার্ট আর বাওম্বি পরে এলোমেলো চুল আর রুক্ষ চেহারা নিয়ে ওর ওখানে যাওয়া শোভন নয়। সে গেল সন্ধ্যেবেলা, বেশ ফিটফাট ধোপদুরস্ত হয়ে। হয়তো আতরও মেখেছিলো একটুখানি।

মা-য়িন-ম্যা তখন ঘরের ভিতর মেঝের উপর বসে তানাখা পিষছিলো। দিলওয়ারকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, "কি ব্যাপার? খবর দিতে এসেছো না খবর নিতে এসেছো?"

এই সোজাসুজি প্রশ্নে দিলওয়ার একটু বিচলিত হোলো। সে

ভেবেছিলো, খবরটা আস্তে আস্তে ভাঙবে, সহানুভূতি প্রদর্শন করবে, মা-য়িন-ম্যার চোখ অশ্রুসিক্ত হলে চিরন্তন পুরুষের যথাবিহিত কর্তব্য করবার চেষ্টা করবে। কিন্তু তার সমস্ত পরিকল্পনা মা-য়িন-ম্যার একটি প্রশ্নে যেন বানচাল হয়ে গেল।

সে ভালো করে তাকিয়ে দেখলো মা-য়িন-ম্যাকে। মনে হোলো সে যেন একটু বিষণ্ণ। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "তুমি তাহলে অমিয়র খবর জানো।"

"হ্যাঁ, জানি," উত্তর দিলো মা-য়িন-ম্যা।

দিলওয়ার নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী সংলাপ শুরু করবার চেষ্টা করলো। বললো, "অমিয়র এমন কাজ করা উচিত হয়নি।"

"ঝোঁকের মাথায় অনেকে অনেক কিছুই করে। আমাকে আগে বললেই হোতো। ওর কোনো অসুবিধে হোতো না। তবে অমিয়কে কেন দোষ দিচ্ছো? জমিলার কি উচিত হয়েছে তোমায় না জানিয়ে চলে যাওয়া? কিছু দরকার ছিলো না।"

"তুমি জানো?"

"হ্যাঁ।"

দিলওয়ার একটু চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "দেখ, যা হবার হয়ে গেছে। তোমারও কিছু করবার নেই, আমারও কিছু করবার নেই। এখন তুমিও একা, আমিও একা। তাই ভাবছিলাম, তুমি যদি ভেবে দেখ একবার, তোমায় সেদিন যা বলছিলাম—"

"আমি একা কে বললে?" কথার মাঝখানে বাধা দিয়ে মা-য়িন-ম্যা হেসে বললো।

দিলওয়ার একটু থতমত খেয়ে গেল। "মানে, আমি বলছিলাম, অমিয় যখন নেই, সে যখন আর আসবেনা—"

"তুমি একটু ও ঘরে গিয়ে বোসো। তানাখা পিষে আমি আসছি একটু পরে।"

অমিয়র ঘরটা খোলা পড়ে ছিলো। দিলওয়ার আস্তে আস্তে ঘরে ঢুকলো। ঢুকেই তার চক্ষু স্থির।

ঘরের মেঝেতে পাটি পেতে অমিয় লম্বা হয়ে শুয়ে আছে একটি সিল্কের লুঙ্গি পরে।

"এসো," ক্লান্তকণ্ঠে অমিয় বললো।

"তুমি! তুমি যাওনি?"

"না, যেতে পারলাম না। সব গোলমাল হয়ে গেল।"

"তাহলে তুমি আর কলকাতা যাচ্ছো না?" আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো দিলওয়ার।

মা-য়িন-ম্যা ঘরে ঢুকছিলো, শুনতে পেলো দিলওয়ারের কথা। অমিয় উত্তর দেওয়ার আগে সেই বলে উঠলো, "কে বললো যাচ্ছে না? চারদিন পর ইংলিশ মেল যাচ্ছে, সেই জাহাজটা ধরবে অমিয়।"

দিলওয়ার অবাক হয়ে মা-য়িন-ম্যার দিকে তাকালো। মা-য়িন-ম্যা হেসে বলে গেল, "অমিয়কে আমিই পাঠাচ্ছি। ও আমায় আগে বললে আমিই টাকাকড়ির ব্যবস্থা সব করে দিতাম। যাই হোক, দেরী যা হওয়ার হয়ে গেছে। তবে ওকে যেতেই হবে। নিজের ভবিষ্যত তৈরী করবার চেষ্টা ওকে করতেই হবে। ওখানে রেডিওতে চেষ্টা করতে হবে, গ্রামোফোন কোম্পানিতে চেষ্টা করতে হবে, ফিল্ম কোম্পানিতে চেষ্টা করতে হবে। বর্মা মুল্লুকে থেকে ওর কোনো লাভ হবে না।"

দিলওয়ার মা-য়িন-ম্যার কাছ থেকে এটা প্রত্যাশা করেনি। সে চুপ করে শুনে গেল মা-য়িন-ম্যার কথা।

মা-য়িন-ম্যা আস্তে আস্তে বসে পড়লো অমিয়র পাশে, তার চুলে হাত বুলোতে বুলোতে বললো, "আর সেই মুসলমান ছুক্রীটার কথা ভুলে গেলেও তো চলবে না। সে এত ভালোবেসে, এত আশা করে নিয়ে যাচ্ছিলো অমিয়কে, অমিয় কেন জাহাজ ধরতে পারলো না, সে কথা জানতে না পেরে সে যদি মনে করে যে অমিয় শেষ মুহূর্তে তার সঙ্গে যেতে সাহস করলো না, তাহলে ওর দিল্‌এ খুব চোট

আসবে না? ওর জিন্দগী বরবাদ হয়ে যাবে না? ওকে যেমন করেই হোক খুঁজে বার করতে হবে। এত প্যার, তাকে তুচ্ছ করতে নেই।"

দিলওয়ার ভাবলো, হয়তো এখনো আশা যায়নি। অমিয় যদি চলে যায়, তাহলে মা-য়িন-ম্যা হয়তো দিলওয়ারকে একেবারে প্রত্যাখ্যান নাও করতে পারে। আস্তে আস্তে তার মুখ আশা আলোয় একটুখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

মা-য়িন-ম্যার মেয়েমানুষের মন। দিলওয়ারের মুখভাব থেকে তার মনের কথা বুঝে নিতে দেরি হোলো না। তার মুখের উপর অবিচলিত দৃষ্টি স্থাপন করে আস্তে আস্তে বললো, "আর তোমাকেও একটা কথা বলে রাখছি দিলওয়ার সাহেব, তুমি এখানে আর এসো না। এসে কোনো লাভ হবে না।"

দিলওয়ার রেস খেলে নিয়মিত, ঘোড়া জিততে না পারলে ক্ষতির কথা ভেবে মন খারাপ করে না। সে বুঝলো এটা মা-য়িন-ম্যার শেষ কথা, এর এদিক ওদিক হবে না, সে হাসি মুখে মেনে নিলো তার এতদিনকার উদ্যম, এতদিনকার কূট কৌশলের ব্যর্থতা।

"থাক, ঠিক আছে," আমায় বলছিলো দিলওয়ার, সেই কন্টিনেন্ট্যালে বসে, "তুনিয়ায় কতো ছুক্‌রী আছে মা-য়িন-ম্যার মতো। দশজনকে চেষ্টা করলে তিনজনকে পাওয়া যায়। সবই সমান।"

আমি একটু হাসলাম। এই হোলো মোগল-বংশাবতংশের জীবনদর্শন। তুনিয়া বদলে যাচ্ছে, ইওরোপে যুদ্ধ চলছে তুবছর ধরে, সুদূর প্রাচ্যেও ঘনিয়ে আসছে যুদ্ধের মেঘ, অকস্মাৎ দ্রুত হয়ে উঠেছে এশিয়ার সাধারণ মানুষের মন্থর জীবন,—আর সে এখনো তার জীবনের ক্ষুদ্রগণ্ডির ছোটোখাটো ভোগবিলাসের স্বপ্নে মশগুল হয়ে আছে।

চা শেষ করে জিজ্ঞেস করলাম, "অমিয় তাহলে এখন কলকাতায়?"

"হ্যাঁ, চলে গেছে অনেকদিন। মাস দেড়েক হোলো।"

আমি একটা কথা ভাবছিলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "মা-য়িন-ম্যা যদি নিজেই অমিয়র কলকাতায় যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেবে, তাহলে সে লোক পাঠিয়ে অমিয়কে জোর করে জাহাজঘাটা থেকে তুলে নিয়ে এলো কেন ?"

দিলওয়ার অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো, তারপর হেসে ফেললো, জিজ্ঞেস করলো, "তুমি জানো দেখছি। কিন্তু জানলে কি করে ?"

"ব্যাপারটা যে আমার চোখের সামনেই হোলো।"

"তাই নাকি ? হ্যাঁ, তাও তো বটে, তুমি তো ছিলে সেখানে। কিন্তু তুমি আমায় তো কিছু বলোনি তখন ?"

"বলে কি লাভ হোতো ?"

দিলওয়ার চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর হেসে ফেললো। "কয়েকজন লোক এসে মা-য়িন-ম্যার নাম করে অমিয়কে ভুলিয়ে গাড়িতে তুলে নিয়ে পালালো বটে, কিন্তু ওরা মা-য়িন-ম্যার লোক নয়। মা-য়িন-ম্যা ব্যাপারটার কিছুই জানতো না," বললো দিলওয়ার।

"মা-য়িন-ম্যার লোক নয় ?" আমি বিস্মিত হলাম, "তাহলে ?"

"ওরা জমিলার লোক। জমিলাই ওর ভায়ের সহায়তায় লোক ঠিক করেছিলো অমিয়র কলকাতা যাওয়ায় বাধা দিতে। ওরা অমিয়কে গাড়িতে তুলে নিয়ে পরে পজুনডওঙে মা-য়িন-ম্যার বাড়ির কাছে নিয়ে ছেড়ে দেয়।"

"জমিলার লোক !" শুনে আমি স্তম্ভিত হলাম।

দিলওয়ার আস্তে আস্তে বলে গেল, "জমিলা বড্ড বোকা। একটু ধৈর্য ধরে চুপ করে থাকলেই হোতো। ওর কোনো ক্ষতি হোতো না। আমি কি আর ওকে ত্যাগ করতাম। যাক গে, যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। দুনিয়ায় কতো আউরত আছে জমিলার মতো।"

একটু চুপ করে থেকে আমি বললাম, "ও তোমায় খুব ভালোবাসতো।"

দিলওয়ার সোজা হয়ে বসলো। "ভালোবাসতো? জমিলা! ও প্যার মহব্বতের কি জানে? সে শুধু জানে এই মরদটা আমার, আমি ওর মালিকান, ও আমায় মাসে মাসে ঘর খরচা দেবে, সুখে স্বচ্ছন্দে রাখবে, আর কোনো আওরতের দিকে আঁখ উঠিয়ে দেখবে না,—ব্যস, এরই নাম প্যার, এরই নাম মহব্বত।"

আমি কোনো উত্তর দিলাম না, চুপ করে রইলাম।

দিলওয়ার হয়তো বুঝতে পারলো যে আমি তার কথা মেনে নিইনি। বলে উঠলো, "সত্যিকারের প্যার কাকে বলে দেখতে চাও? চলো আমার সঙ্গে।"

বাপ্‌স্! আবার? কে যায় এদের এসব ফ্যাসাদের মধ্যে। আমি তাড়াতাড়ি উত্তর দিলাম, "না, না, থাক। আজ আমায় সকাল করে বাড়ি ফিরতে হবে।"

"আরে চলো ইয়ার। বেশী দূরে যেতে হবে না, হাতের কাছেই আছে।"

মীর্জা দিলওয়ার বক্‌স্‌এর জীবনের সত্যিকারের প্রেমও হাতের কাছেই, ঘাড় উঁচু করলে দেখা যায়! ওর কথাটা আমার খুব মজার লাগলো।

আমার কোনো আপত্তি সে শুনলো না, হাত ধরে টেনে বার করে আনলো কন্টিনেন্ট্যাল থেকে।

বার স্ট্রীটের মিড্‌ল্ ব্লকে একটি সাদাসিধে ফ্ল্যাট বাড়ির সামনে আমি দিলওয়ারের পেছন পেছন গাড়ি থেকে নামলাম। যুদ্ধের আগে এ সময় সেন্ট্র্যাল রেঙ্গুন ছিলো প্রধানত ভারতীয় পাড়া। এ অঞ্চলের একটি প্রধান রাস্তা বার-স্ট্রীট। এখানে রাস্তার দুপাশে সব ফ্ল্যাট বাড়ি, একতলায় বেশির ভাগ দোকান, অন্যান্য ফ্ল্যাটে সচ্ছল মধ্যবিত্তদের বাস। ফ্ল্যাটগুলো অধিকাংশই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, অনেক বারান্দাই নানারকম ফুলের টবে আর অর্কিডের ঝোলানো চারায় সাজানো।

তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। জ্বলে উঠেছে রাস্তার আলো। রেডিও চলছে এপাশে-ওপাশের বাড়িতে। পথে নানারকম লোক, অন্ধ্রের কুরঙ্গী রিকশওয়ালা, হিন্দুস্তানী গাড়িওয়ালা, বিহারী মুসলমান শরবতওয়ালা, উড়িয়া প্লাম্বিং মিস্ত্রী, আর মাদ্রাজী, বাঙালী, গুজরাতি, মাড়ওয়ারি, চাটগেঁয়ে মুসলমান মেশানো দিনান্তের কর্মক্লান্ত বাড়ি-মুখো জনতা।

রাস্তা থেকে কাঠের সিঁড়ি সোজা চলে গেছে তেতালায়, দিলওয়ারের পেছন পেছন উপরে উঠে এলাম। দরজা বন্ধ ছিলো। কড়া নাড়তে একজন মাদ্রাজী আয়া দরজা খুলে দিয়ে দিলওয়ারকে দেখে একপাশে সরে দাঁড়ালো। দিলওয়ার আমায় ভেতরে এনে বসালো। দুটো রুমের ফ্ল্যাট, পেছনের "কাছরা-গলির" দিকে একটি ছোটো রান্নাঘর। বাইরের ঘরে সামনে ফুলের টব সাজানো একটু-খানি বারান্দা। আশ্চর্য পরিষ্কার ফিটফাট, কোথাও এক কণা ধুলো নেই। আসবাব পত্রও কিছু নেই। শুধু বাইরের ঘরে একটি আয়না বসানো আলমারি। দেওয়ালের গায়ে কয়েকটি তাক। সেখানে ঝকঝকে স্টেনলেস স্টীলের থালা বাটি গেলাস আর অসংখ্য আচারের বোতোল সাজানো। মেঝে শুধু পাটি পাতা। সেখানেই বসলাম আমি আর দিলওয়ার।

এককোণে দেওয়ালের গায়ে ছোট্টো তাকের উপর রাধাকৃষ্ণের ছোটো যুগল মূর্তি। একপাশে রুপোর রেকাবীতে কয়েকটি ফুল। সেদিকে আমার চোখ পড়তে দিলওয়ার হেসে বললো, "আমার এই বিবি হিন্দু, তোমার চাইতে অনেক বেশী গোঁড়া হিন্দু। দুবেলা পুজো না করে পানি খায় না।"

"ঘরদোর খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন", আমি বললাম।

"গুজরাতী মেয়ে তো। তাই ঘর দোর সব সময় সাফ-সুতরা রাখে।"

সাদা মিলের পরিষ্কার শাড়ি পরে একটি মহিলা বেরিয়ে এলো। ফর্সা দুহাতে শুধু তিনগাছি কাচের ও এক গাছি পাতলা সোনার

চুড়ি। দেহের গড়ন খুব সুন্দর যদিও মুখের ছাঁদ একটু নীরস। কিন্তু আশ্চর্য সুন্দর চোখদুটো। নারীহৃদয়ের সমস্ত মায়া মমতা স্নেহ করুণায় যেন ঘন হয়ে আছে সেই গভীর দুটো কটা চোখ।

"ইনি সুশীলা-বেন," পরিচয় করিয়ে দিলো দিলওয়ার, "এ আমার বাঙালী দোস্ত সলিল।"

সুশীলা-বেন হাত জুড়ে নমস্তে জানালো। জিজ্ঞেস করলো, "চা খাবেন?"

মশলা দেওয়া গুজরাতী চা এলো, আর সেই সঙ্গে পিঠা আর ভুজিয়া।

"আপনি স্নান করে নিন," সুশীলা বললো দিলওয়ারকে, "আমি গোসলখানায় আপনার জন্যে পাজামা, কুর্তা, গেঞ্জি আর গামছা রেখে দিয়েছি।"

অনুরোধ নয়, একটা শান্ত আদেশ। দিলওয়ার নিঃসহায়ের মতো হাসলো।

"আপনারা খেয়ে যাবেন তো," আমাদের জিজ্ঞেস করলো সুশীলা বেন।

"খেয়ে যাবো!" আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

দিলওয়ার হেসে বললো, "সুশীলা তো আমাদের না খাইয়ে ছাড়বে না। খেয়েই যাও ইয়ার, কি আর করবে।"

খুব ভালো লাগলো এই ঘরোয়া পরিবেশ। কোনো উগ্রতা নেই, কোনো বিলাস বিহ্বলতা নেই, অশান্ত যৌবনের চপলতা নেই। একটা শান্ত, পবিত্র স্নিগ্ধ মাধুরী।

হঠাৎ মনে পড়লো মোগল হারেমেও হিন্দু স্ত্রী থাকতো। সেখানে নিশ্চয়ই অনেক বেশী ঐশ্বর্য, তবু যেন মনে হোলো হয়তো মুসলমান বেগমদের চাইতে হিন্দুবেগমদের মহল নিশ্চয়ই অনেক বেশী শান্ত ও মাধুর্যময় ছিলো। মোগলেরা বিলাস ব্যসনের চরম পরিতৃপ্তি পেতো অন্য বেগমের মহলে, কিন্তু হিন্দু বেগমদের মহলে গিয়ে পেতো শান্তি ও অবসর।

দিলওয়ার আস্তে আস্তে বললো, "আমার মুসলমান বিবিও আছে। সেও আমাকে খুব প্যার করে, আমিও প্যার করি তাকে। কিন্তু আমার এই বিবির প্যার অন্যরকম। আমার অন্য বিবি বুড়ী হলে বুড়ীই হয়ে যাবে। কিন্তু এই বিবি জোয়ানও নয়, বুড়িও নয়, এ শুধু বিবি। এখন যেরকম আছে আর বিশ তিরিশ সাল পরেও এরকমই থাকবে।"

আমি রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহের দিকে তাকিয়ে একটু হাসলাম।

দিলওয়ার তাকিয়ে দেখলো আমার দিকে। তারপর বললো, "তুমি বলছিলে না, জমিলা আমায় খুব ভালোবাসতো? ভালোবাসা কাকে বলে এই ঘরে বসে মনের চোখ খুলে সমঝে নাও। আসল প্যার এরকম সহজ, এরকম সাদাসিধে, এরকম পরিচ্ছন্ন, এরকম সুন্দর।"

অমিয় কলকাতায় বেশীদিন থাকতে পারলো না, আবার ফিরে এলো। আমি জানতাম না। ওর কথা মাঝে মাঝে মনে পড়তো কিন্তু ওর খবর নিইনি কোনোদিন, কারণ যাদের কাছে ওর খবর নেওয়া যায় তাদের সঙ্গে আমার কোনো যোগাযোগ ছিলো না। তাই জানতে পারিনি।

ফর্টিয়েথ্ স্ট্রীট আর ফ্রেজার স্ট্রীটের মোড়ে একটি ভারতীয় সিনেমাহল ছিলো, তার নাম দোসানী-টকিজ। সেখানে হিন্দি ছবি দেখানো হোতো, আর প্রত্যেক মাসের প্রথম হপ্তায় একটি করে বাংলা ছবি। সেবার কানন আর সায়গলের একটি বাংলা ছবি এলো, সেটা দেখতে গেলাম একদিন ম্যাটিনি-শো'তে। শো-ভাঙবার পর বাইরে পানের দোকানে সিগারেট কিনতে এসে দেখি অমিয় দাঁড়িয়ে পান খাচ্ছে। তার পোশাক দেখে অবাক হলাম। ওকে সাধারণত দেখতাম বার্মিজদের মতো শার্টের উপর কষে বাঁধা বার্মিজ লুঙ্গিতে নয়তো বা শান-বাওম্বিতে। কখনো কখনো নীল শার্জের শর্টসও পরতো, আর কোনো গানের আসরে যাওয়ার সময়

ঢোলা পাজামা আর চিকনের কাজ করা লক্ষ্ণৌয়ি কুর্তা। ধুতি পাঞ্জাবি পরতে ওকে বড়ো একটা দেখেছি বলে মনে হয়না। আজ দেখলাম, গায়ে সিল্কের পাঞ্জাবি, পরনে মালকোচা মারা তাঁতের ধুতি। পায়ে পেটেন্ট লেদারের পামশু। পাঞ্জাবিরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। তার হাই-নেক কলার, বোতাম কাঁধের উপর, রাশিয়ান-কফ্ হাতা। এই পোশাক আমার চোখে নতুন। রেঙ্গুনের বাঙালী-দের মধ্যে দেখিনি কোনোদিন। চুলের ছাঁটও বদলে গেছে। আগে ছিলো বার্মিজদের মতো ঘাড় আর মাথার দুপাশ ছাঁটা, সামনে আর মাঝখানে ছোটো ছোটো চুল ভেজলিন মেখে ব্যাক্ব্রাশ করা। এখন দেখলাম সে চুল লম্বা হয়ে নেমে এসেছে ঘাড় পর্যন্ত, এক পাশে লম্বা টেরি, দু কানের পাশ দিয়ে জুলপি নেমেছে, তৈলাক্ত চুল ঢেউদার হয়ে চিকচিক করছে পানের দোকানের আলোয়।

"আরে, তুমি কোত্থেকে ?"

"সিনেমা দেখে বেরোচ্ছি। ফিরলে কবে ?"

"দিন সাত আট হোলো। আমি ভাবছিলাম তোমায় কি করে খবর দেওয়া যায়। মা-য়িন-ম্যা বললো, তুমি আজকাল নাকি ওখানে আর যাওই না।"

"মা-য়িন-ম্যার ওখানেই ফিরে এলে ?"

"কোথায় আর যাবো ?" তাম্বুল-রক্তিম হাসি হেসে অমিয় উত্তর দিলো।

"কেন ? তোমার মা-বাবার কাছে ?"

"ওখানে ? না ভাই, ওখানে আর ফিরে যাওয়া যায় না। ভাই বোনেরা বড়ো হয়ে গেছে, জায়গার বড্ড অভাব। ছোটো ভাই বিয়ে করেছে, সংসারের ধরণধারণ অনেক বদলে গেছে।"

একটু যেন ব্যথার সুর অনুভব করলাম তার কথায়। প্রসঙ্গ পালটে জিজ্ঞেস করলাম, "ফিরে এলে কেন ? কলকাতায় কোনো সুবিধে করতে পারলে না ?"

"কলকাতায় !" অমিয় যেন আঁৎকে উঠলো। "ওখানে শুধু

ওখানকার লোকই থাকতে পারে। বাইরের লোক পারে না। ওরে বাপরে বাপ। পালিয়ে বেঁচেছি।"

"কেন ?" আমি হেসে ফেললাম ওর মুখভঙ্গি দেখে।

"আশ্চর্য শহর ভাই, কেউ কাউকে চেনে না, কেউ কাউকে চিনতে চায় না। কারো সঙ্গে দেখা করতে গেলে বাইরে দাঁড় করিয়ে রাখে, কিরকম চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলে, কি বলতে চাইছে বুঝে ওঠা দায়। কারো উপর নির্ভর করবার উপায় নেই, কারো কথায় বিশ্বাস করবার উপায় নেই। পথের নিশানা চাইলে তিনজন তিনদিক দেখিয়ে দেয়।"

আমি হাসতে লাগলাম ওর কথা শুনে। বললাম, "সব শহরেই তাই। বাইরের লোক নতুন এলে খুব নিঃসঙ্গ আর হতাশ বোধ করে। বোম্বে যাও, দিল্লি যাও, সব জায়গায় তাই। যারা রেঙ্গুনে নতুন আসে, তাদের একবার জিজ্ঞেস করে দেখো দিকি ? ওই একই কথাই বলবে।"

"যাই হোক ভাই, আমি দেখলাম ওখানে আমার পোষাবে না। অনর্থক রেডিও-স্টেশনে আর দু-তিনটি গ্রামোফোন কোম্পানিতে ঘোরাঘুরি করলাম। কেউ পাত্তাই দিলো না। অবনী পাকড়াশী নামে একজন খুব নামকরা ওস্তাদের কাছে গিয়েছিলাম। নানা জায়গায় ওর খুব হাত আছে। দেখি, আমায় সে তার সাকরেদ বলে পরিচয় দিতে চায় কিন্তু কাজের বেলা কিছু করতে চায় না। কয়েক জায়গায় গান শুনিয়েছি, যারা শুনলো মুখ দেখে মনে হোলো খুব ভালো লেগেছে, কিন্তু মুখ ফুটে সেকথা বলবে না। এক ব্যাটার এমন আস্পর্ধা, বললে কিনা, গলা সুরে নেই। শালাকে তিন লাথি মারতে ইচ্ছে হোলো। আরেক ব্যাটা বললে, গান শিখেছো বর্মায়, সে গান এখানে চলবে না। এখানে কিছুদিন শেখো তারপর দেখা যাবে। বললাম আমার ওস্তাদের নাম, সে বিশ্বাসই করতে চাইলো না। বলে কিনা, ওঁকে তুমি বার্মায় পেলে কি করে ? এমন রাগ হোলো, কি গাইছি তাই শোন বাপু, কার কাছে শিখেছি,

কোন দেশে শিখেছি, সে খোঁজে কি কাজ বাপু? তা নয়, আগে কাগজে কলমে কোয়ালিফিকেশান চাই, তারপর অন্যকথা। এক-জায়গায় একজনকে সত্যি মার লাগাতে গিয়েছিলাম। বললাম, ঠুম্‌রি শিখেছি মায়ের কাছে। সে বললে ঠাট্টা করে, মায়ের কাছে শেখা গান বৌকে গিয়ে শুনিও, সব জায়গায় সে গান চলে না। আস্পর্ধা দেখ। তোদের অমুক বাঈয়ের ঠুম্‌রিতে এত নাম, মা তাকে দশ বচ্ছর শেখাতে পারে।" বলতে বলতে অমিয় উত্তেজিত হয়ে উঠলো।

"প্রথম প্রথম সবাইকেই ওরকম নানা কথা শুনতে হয়", আমি বললাম।

"কাজ নেই ভাই ওরকম কথা শুনে। আমি ধুত্তোর বলে চলে এলাম। আর আমি বাবা ইণ্ডিয়ায় যাচ্ছি না। আমার এই দেশই ভালো।"

আমি একটু হাসলাম। এদেশে যে সব ভারতীয় ছেলে জন্মায়, বড়ো হয়, ওদের কারোই হিন্দুস্তান ভালো লাগে না। তাকে বিদেশ বলে মনে করে। এদেশের উগ্রজাতীয়তাবাদীদের সাম্প্রতিক ভারতীয়-বিদ্বেষী আন্দোলন পর্যন্ত তাদের বিচলিত করে না। অথচ এদেশকেও সবাই ঠিক আপন বলে ভাবতে পারে না, অকুণ্ঠিত ভাবে গ্রহণ করতে পারে না এদেশের রীতিনীতি সংস্কার আচার ব্যবহার। এরা অন্য একটা জাত, আর দশটা বিদেশের ভারতীয় অধিবাসীর মতো না ভারতীয়, না এদেশী,—এরা "ওভারসীস্ ইণ্ডিয়ান।" সেই উনিশ শো একচল্লিশে অনেকরই চিন্তাধারা ছিলো এ ধাঁজের। আগামী কয়েক বছরের বিপুল ঐতিহাসিক পরিবর্তন মনের চোখ দিয়ে দেখবার ক্ষমতা তাদের ছিলো না।

আমি ভাবছিলাম একটা কথা জিজ্ঞেস করবো কিনা। অমিয় একটি সিগারেট ধরালো। আমি চারপাশে তাকিয়ে দেখলাম। অনেক বাঙালীর ভিড়, কেউ বাংলা ছবি দেখে সবে ভেতর থেকে বেরোলো, কেউ সন্ধ্যের শোর টিকিট কিনতে এসেছে। কিউ-এর

রেওয়াজ তখনো হয়নি, কাউন্টারের সামনে মস্তো ভিড়, ঠেলাঠেলি আর ধস্তাধস্তি চলছে। সিনেমাহলের সামনে ট্যাক্সি, ঘোড়ার গাড়ি আর রিকশর ভিড়। ফ্রেজার স্ট্রীট দিয়ে হু-হু করে ছুটে চলেছে গাড়ি, লরি আর ইলেকট্রিক ট্রলি-বাস। চুলিয়া মুসলমানের চায়ের দোকানে খুব জোরে রেডিও ছেড়ে দিয়েছে। হিন্দি গান হচ্ছে রেডিওতে।

একেবারে বিদেশ বলে মনে হয় না। সম্পূর্ণ ভারতীয় পরিবেশ। তারই মাঝখানে দাঁড়িয়ে অমিয়র মুখে শুনলাম—আর আমি বাবা ইণ্ডিয়ায় যাচ্ছি না। আমার এই দেশই ভালো।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, "শিরীনের সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

অমিয় গুম হয়ে রইলো অনেকক্ষণ। তারপর একটু ধরা গলায় বললো, "না। ওর কোনো খোঁজ পাই নি। কোনোদিন পাবোও না।"

অমিয় আমায় বলেছিলো, মা-খিন-ম্যা আমার কথা প্রায়ই বলে, কেন যাই না জিজ্ঞেস করে। সে নিজেও আমায় খুব করে বলেছিলো ওর ওখানে যাওয়ার জন্যে। কিন্তু আমি স্থির করে-ছিলাম মা-খিন-ম্যার বাড়িতে আর যাবো না। আমার মনে হোতো, ওদের যা জীবন যাত্রার ধরণ, তাতে ওদের সঙ্গে আমার যোগাযোগ বেশী না রাখাই ভালো। তাই অমিয়র সঙ্গে আর দেখা হোতো না বড়ো একটা। কখনো কখনো মোগলস্ট্রীটে বা স্কট-মার্কেটে দেখা হয়ে যেতো দিলওয়ারের সঙ্গে। পাঁচ-দশ মিনিট দাঁড়িয়ে সাধারণ দু-চারটা মামুলী কথা বলতে হোতো। প্রথম প্রথম সে আমায় রেস্তরাঁয় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, একবার তার বাড়িতেও নিয়ে যেতে চেয়েছিলো। কিন্তু আমি এড়িয়ে গেছি। পরে পরে সে আর বলতো না।

তদ্দিনে মনসূন এসে গেছে দক্ষিণ বার্মায়। আকাশে প্রায় দিনই মেঘের ঘনঘটা, সকাল দুপুর সন্ধ্যা পশলা পশলা বৃষ্টি। এক

একদিন প্রবল বৃষ্টি হয়ে নগর কেন্দ্রের নিচু জায়গাগুলোতে জল জমে যায়। শীল্ডের সীজন শুরু হয়ে গেছে বি-এ-এ গ্রাউণ্ডে। জুলাই পড়তে না পড়তে বর্ষা আরো প্রবল হয়ে এলো। পর পর কয়েকদিন ধরে একটানা বৃষ্টি। কলেজ করে এসে প্রায়ই আর বাড়ির বাইরে বেরোনোর অবকাশ থাকতো না। ছুটির দিনে বড়জোর কোনো কলেজের বন্ধুর বাড়ি বসে আড্ডা, বিকেলের দিকে একটি সিনেমা, এর বেশী প্রোগ্রাম বড় একটা হোতো না। সন্ধ্যেবেলা আকাশ পরিষ্কার থাকলে বেড়াতে যেতাম নদীর ধারে, কখনো লুইস স্ট্রীট জেটির দিকে, কখনো বা বোটাটং-এর দিকে। হয়তো বা এক একদিন চলে যেতাম রয়্যাল লেকে, নয়তো বা কলেজ ছুটির পর বাড়ি না ফিরে ইউনিভার্সিটি কলেজের ভারতীয় ছাত্রনিবাস টাগাওঙ-হল্‌এ গিয়ে আড্ডা জমাতাম সহপাঠীদের সঙ্গে, সেখান থেকে কাউকে ডেকে নিয়ে চলে যেতাম কোকাইন লেকে সাঁতার কাটতে নয়তো বা নৌকা বাইতে। টাক্‌-শপ্‌এ অনেকে মিলে আসর জমাতাম কোনো কোনো দিন। আর কখনো বা বিকেলে একলা চুপ করে বসে থাকতাম ছাতের এককোণে, উঁচু বাড়ির ছাত থেকে চোখে পড়তো চারপাশে রঙ-ছবি শহরের প্রশস্ত বিস্তার। দক্ষিণ-পূবে ঝলমলো বোটাটং-কায়া, আর দক্ষিণে রেঙ্গুন নদীর বুকে জাহাজ আর লঞ্চের হুইস্‌ল্‌। অনেক উত্তরে, যেখানে আকাশের মেঘলা কাজলিমা আর দূরের গাছপালার ঝাপসা শ্যামলিমা মিশে একাকার হয়ে গেছে, সেখানে নিচু আকাশের গায়ে ধ্যানমৌন প্রশান্ত স্তব্ধতায় দাঁড়িয়ে আছে শোয়ে-ড্যাগন প্যাগোডা।

তখন মাঝে মাঝে মনে পড়তো শিরীনের কথা। সেই সঙ্গে অন্য সবার কথাও মনে পড়তো। বেশীক্ষণ ভাবতাম না। কয়েকদিন তাদের যেরকম কাছাকাছি এসে পড়েছিলাম, সেরকম ভবিষ্যতে আবার হওয়ার কোনো কারণ নেই বলেই আমার মনে হোতো, সেরকম কোনো ইচ্ছেও আমার ছিলো না।

ছাত্রজীবনের নানারকম সাধারণ ভাবনা নিয়ে মন তখন পরিব্যাপ্ত। প্রফেসার বার্নার ডেলির ক্লাস, ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ানের ইলেকশান, ইকনমিক্স সোসাইটির বিতর্কসভা, সাম্প্রতিক রুশ-সীমান্তে জার্মান আক্রমণ, এটা ওটা সেটা অনেক কিছু। এর বাইরে অন্য কিছুতে মন দেওয়ার সময় ছিলো না, প্রবৃত্তিও ছিলো না।

তবু আবার কি করে দিলওয়ার আর অমিয়র সঙ্গে জড়িয়ে পড়লাম, আজ সেকথা মনে পড়লে সত্যি আশ্চর্য লাগে।

সেই উনিশ শো একচল্লিশ সালের জুলাই মাসের কোনো এক শনিবারের অপরাহ্ণ বেলা। কলেজ ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। ইংলিশ-উইঙ-এর একটি খালি ঘরে ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ানের কমিটি মিটিং ছিলো। সেটা শেষ হতে যে যার মতো এদিক ওদিক বেরিয়ে গেল। আমি কিছুক্ষণ বসে ভাবলাম কি করা যায়। শনিবার এত সকাল করে বাড়ি ফেরা যায় না। তিনটে প্রায় বাজে। এখান থেকে বেরিয়ে সময় মতো শহরকেন্দ্রে পৌঁছে সিনেমা দেখার সময় নেই, কারণ বাসে যেতে প্রায় কুড়ি-পঁচিশ মিনিট লাগবে। একা একা টাক-শপ্‌এ গিয়ে চা খেতে ইচ্ছে করলো না। শনিবার বিকেলে রোয়িং ক্লাবে জনতা বেশী। সেখানে যেতে মন চাইলো না। ইউনিভর্সিটির সুইমিং-পুল্‌এ সেদিন শুধু মেয়েরা। সুতরাং সেখানে যাওয়াও সম্ভব নয়। ট্যাগাওভ হলএ গিয়ে বোর্ডারদের সঙ্গে গল্প করা চলবে না, কারণ এই শনিবার বিকেলে ধারে কাছের ইন্‌সিন, কামায়ুট, ওচ্যান বা থিঙ্গানজ্যুন অঞ্চলে যারা যাবে, তারা যাবে বাড়ি, আর অনেকে যাবে সিনেমায় নয়তো বা শহরে কোনো বন্ধু বা আত্মীয়ের বাড়ি।

এ্যাসেম্‌ব্লি হলের পাশ দিয়ে এসে প্রশস্ত ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে চলে এলাম কমন রুমে। সেখানেও একেবারে ফাঁকা। কেউ নেই। বাইরে বেরিয়ে এসে, লন্ পেরিয়ে চ্যান্সলার রোড ধরে এগিয়ে গেলাম কনভোকেশান হলের দিকে। ময়ূর মার্কা আর-ই-টি বাস কনভোকেশান হলের পোর্টিকোর নিচে এসে দাঁড়ায়। ভাবলাম কোথাও যখন যাওয়ার নেই তখন বাড়িই ফিরবো। কনভোকেশান হলের কাছাকাছি আসতে মনে

পড়লো, আজ তো শনিবার, ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ, এখন আর বাস এ-পর্যন্ত আসবে না, বাস ধরতে হলে অনেকটা পথ হেঁটে যেতে হবে চ্যান্সলার রোডের শেষ প্রান্তে, ইউনিভার্সিটি লাইব্রেরি, স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ান বিল্ডিং সব ছাড়িয়ে। কি করবো ভেবে না পেয়ে আরো একটু এগিয়ে গেলাম। ইউনিভার্সিটি-কলেজের পাশ থেকে কোকাইন লেক শুরু। উঁচু লোহার রেলিংএর একজায়গায় একটি রড্ বাঁকানো। একজন লোক অনায়াসে তার ভেতর দিয়ে গলে লেকের চৌহদ্দির ভিতর ঢুকতে পারে। সোজা পথে যেতে হলে অনেকটা ঘুরে যেতে হয়। ছাত্রদের যাওয়া আসার সুবিধের জন্যে কয়েকজন পূর্বসূরী এই শর্টকার্টের ব্যবস্থা করেছে।

জঙ্গলের ভিতর দিয়ে সরু পথ বেয়ে খানিক এসে লেকের পাড়ে বসলাম। কাছাকাছি এদিক ওদিক ইউনিভার্সিটি কলেজ ও জাডসন কলেজের অনেক ছাত্রছাত্রী এসে বসেছে, তবে প্রায় সবাই আমার অচেনা। সবুজ গাছগুলোর ফাঁকে ফাঁকে জুলাই অপরাহ্নের স্নিগ্ধ রোদ্দুর জলের বুকে এসে নেমে পড়েছে ইনয়া হলের মেয়েদের মতো। দূরে জলের বুকে দু-একটি ছোটো নৌকো, কোনোটায় ছেলে আর মেয়ের ভিড়, কোনোটায় বা শুধু দুজনে মিলে একা। লেকের মাঝখানে সুদূর দ্বীপগুলোর ঘন ডালপালার আড়াল থেকে কোনো এক নিঃসঙ্গ পাখির তীক্ষ্ণ সুরেলা ডাক এধারের অলস কাক আর ময়না আর চড়ুই পাখির অপরাহ্ণ-গুঞ্জনে অদ্ভুত খাপ খেয়ে মিশে যাচ্ছে। দূরান্তের মেঘ-ভাস-ভাসা আকাশের চিলের চিৎকার ক্ষুব্ধ অপরাহ্নের বিপুল স্তব্ধতা মেঘলা ছায়া ফেলেছে কোনো এক নিঃসঙ্গ ছেলের মুখের উপর যে এখন ঘাসের গালচে পাতা লেকের পাড়ে কনুয়ের উপর ভর দিয়ে আধোশোয়া ভঙ্গিতে নির্লিপ্ত পরিতৃপ্তির সঙ্গে সিগারেট টানছে আর লেকের বুকে নৌকোর আরোহী আরোহিণীদের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে, আর মেঘ হয়ে দূর আকাশে মিলিয়ে যাচ্ছে তার সিগারেটের ধোঁয়া।

"তুমি এখানে একলা বসে কি করছো?"

ফিরে তাকিয়ে দেখি কো-চ্য-থেইন পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে।

"তুমি কোত্থেকে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"মা-লা-লার খোঁজে এসেছি। দেখেছো তাকে?"

"না তো!"

"ওর এখানে আসবার কথা। আমি ইসমাইল আর এ্যাঙ্গাসের সঙ্গে নৌকো বাইছিলাম। তুমি এখানে একলা বসে আছো কেন?"

"কিচ্ছু করবার নেই, তাই?"

"শনিবার কিচ্ছু করবার নেই?"

আমি মাথা নাড়লাম।

"সন্ধ্যেবেলা কি করছো?"

"কিচ্ছু না।"

চ্য-থেইন একটু চুপ করে ভাবলো, তারপর বললো, "খুব একঘেয়ে লাগছে, না?"

"বড্ড।"

মা-লা-লা এসে উপস্থিত হোলো ইতিমধ্যে।

"কোথায় ছিলে? তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি চারদিকে," সে বললো তাকে, তারপর আমার দিকে ফিরে বললো, "হ্যালো রয়। তুমি এখানে কি করছো?"

"শুনেছো, রয়ের কিছু করবার নেই। এমন একটি সুন্দর শনিবার, পুওর রয়, ওর কিছু করবার নেই। কী ছেলে তুমি, এখন পর্যন্ত একটি গার্ল খুঁজে বার করতে পারো নি তোমার জন্যে।"

"তুমি ওকে একটি খুঁজে দাও না," বললো চ্য-থেইনের মেয়ে-বন্ধু মা-লা-লা।

চ্য-থেইন চারপাশের সবুজ গাছগুলো পর্যবেক্ষণ করলো। তারপর কপট হতাশায় মুখ বিষণ্ণ করে বললো, "এখনো ফলে নি, মরসুম আসেনি বোধ হয়। অপেক্ষা করতে হবে।"

চ্য-থেইনের রসিকতা এমন কিছু সূক্ষ্ম নয়, কিন্তু মা-লা-লা হেসে গড়িয়ে পড়লো।

চ্য-থেইন বললো, "যাক তোমার যখন কিছু করবার নেই, তুমি আমাদের সঙ্গে চলো।"

আমি একটু ইতস্তত করলাম।

"কেন?" জিজ্ঞেস করলো চ্য-থেইন।

"দুজন হলে সঙ্গ," আমি উত্তর দিলাম, "তিনজনে জনতা।"

"তিনজনে?" হাসলো চ্য-থেইন, "আজ আমরা অন্তত কুড়িজন। পঁচিশজনও হোতে পারে।"

আমি বুঝতে পারলাম না, ওর দিকে তাকালাম অবাক হয়ে।

"পরে বলছি। আগে টাক-শপে চলো। বড্ড গরম। লাইম জুস খেতে ইচ্ছে করছে।"

চ্যান্সলার রোডের উপর ইউনিভার্সিটি কলেজের ঠিক উল্টো দিকে জাডসন কলেজ। ভেতরের প্রশস্ত উঠোনে একজন চৈনিকের টাকশপ,—ছাত্রমহলে জন্‌স্ টাকশপ্ নামে সুপরিচিত। পুরু ঘাসে ঢাকা উঠোনের এখানে সেখানে চেয়ার টেবিল পাতা। সাধারণত জায়গা পাওয়া যায় না। শনিবার বলে বেশির ভাগ টেবিলই খালি, অল্প কয়েকজন বার্মিজ, ভারতীয় আর ফিরিঙ্গী ছাত্রছাত্রী বসে আছে দু-চারটা টেবিল ঘিরে।

একধারে সরু চীনে-বাঁশের একটি ঝাড়। তার পাশে চেয়ার টেনে বসলাম আমি, মা-লা-লা আর চ্য-থেইন।

সেখানে বসে লাইম্ জুসের গেলাসে চুমুক দিয়ে চ্য-থেইন বললো, "তুমি তো আমার বোন মা-খিন-স'কে চেনো না?"

"না।"

"জাডসনে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়ে। সে আজ তার কয়েকজন স্কুলের বন্ধুকে বাড়িতে ডেকেছে। একটা ছোটো খাটো পার্টি বলতে পারো। আমি আর মা-লা-লাও থাকছি। রোজমারী মেহতাও আসছে। তুমিও চলো। মা-খিন-স খুশি হবে।"

"আমি? অনাহুত হয়ে গিয়ে পড়বো, সে কি ঠিক হবে?"

"হোয়াট-দি-হেল্। চলো, ম্যান্। আহুত অনাহুত আবার কি, কোনো ফর্ম্যালিটি নেই।"

মা-লা-লাও পীড়াপীড়ি করলো। খানিকটা কুণ্ঠার সঙ্গেই রাজী হলাম।

"কটায় যেতে হবে? হাতে তো বেশী সময় নেই, বাড়ি গিয়ে জামাকাপড় বদলে আসতে হবে তো।"

"বাড়ি যাওয়ার কিছু দরকার নেই। মাথা খারাপ? এখান থেকে শহরে যাবে, শহর থেকে আবার কোকাইন ফিরবে, ক্ষেপেছো নাকি?"

"এ পোশাকে তো যাওয়া যাবে না?"

"কে বলছে এ পোশাকে যেতে। শোনো, এটা ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি।"

আমি হেসে ফেললাম। "আমার পোশাকটা কি ফ্যান্সি ড্রেস বলে চালিয়ে দেওয়া যায় না কি?"

"আমি তো সে কথা বলি নি। তুমি এখনই আমার বাড়ি চলো, ওখানে চান টান করে নেবে, তারপর তুমি আমি নিরিবিলি বসে একটু চা খেয়ে নেবো। ইতিমধ্যে মা-লা-লা ইনয়া হলে গিয়ে কাপড় বদলে আসবে। ও আসবে ইণ্ডিয়ান লেডি সেজে। ইনয়া হলের একজন ইণ্ডিয়ান মেয়ে ওকে একটি ভারী সুন্দর শাড়ি দিয়েছে। আমি চাইনীজ ম্যাণ্ডারিন সাজবো।"

"আমি?"

"তোমার ব্যবস্থা আমিই করে দেবো। তুমি সাজবে বনেদী বার্মিজ ভদ্রলোক, সিল্কের পাসো, এন্-জ্যি আর সিল্কের গাওন্-বোন পরে তোমাকে এত জমকালো দেখাবে যে সব মেয়েরা তোমার দিকে তাকিয়ে থাকবে," বলে মা-লা-লার দিকে আড়চোখে তাকিয়ে জুড়ে দিলো, "শুধু আমার মা-লা-লা তাকাবে না।"

মা-লা-লা হেসে ফেললো। খুব সহজ হাসি বার্মিজ মেয়েদের। হাসির তোড়ে চিনে-বাঁশের সরু সরু পাতাগুলো দুলে দুলে উঠলো।

"ও হ্যাঁ, আরেকটি খুব সুন্দর ইণ্ডিয়ান মেয়ে আসছে। বলা যায় না, তোমার সঙ্গে ভাব হয়ে যেতে পারে। কিন্তু আগের থেকে সাবধান করে দিই, খুব শক্ত মেয়ে।"

"কে?" হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

"মা-লা-লার একজন স্কুলের বন্ধু।"

চ্যান্সলার রোড ধরে অনেকটা হেঁটে এলে পড়ে ইউনিভার্সিটি এ্যাভিনিউ। বাসে চেপে অনেকখানি গিয়ে নেমে পড়তে হয় কোকাইন রোডের ধারে। তারপর বাঁয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেই চ্য-থেইনের বাড়ি।

সন্ধ্যের পর বাড়ির পেছনের উঠোনে সম্মিলিত হোলো এক-দঙ্গল ছেলে মেয়ে,—ভারতীয়, বার্মিজ, সিনো-বার্ম্যান, এ্যাংলো বার্ম্যান। সবারই পরনে ফ্যান্সি-ড্রেস। মা-লা-লা পরেছে বেনারসী শাড়ি, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তাকে। রোজমারী মেহতা এসেছে রাজ-স্থানী পোশাক পরে। মা-খিন-স সালোয়ার কামিজের উপর একটি বোরখা চাপিয়েছে, যদিও মুখ খুলে রেখেছে। পেগি আরভিন সেজেছে বার্মিজ রাজকন্যা। সিল্কের ঢোলা জামা পরে চ্য-থেইন সেজেছে চাইনীজ ম্যাণ্ডারিন। নাগা মেয়ের পোশাক পরেছে লুসি হান্ নামে একজন সিনো-বার্মান মেয়ে। আমেরিকান কাও-বয় সেজেছে অর্জুন শ্রীবাস্তব। হাঙ্গেরিয়ান চাষী মেয়ে হওয়ার চেষ্টা করেছে আরেকজন অ্যাংলো বার্ম্যান। এমনিতরো নানারকম সব পোশাক। হাসি গল্প আর বসনের বর্ণবিন্যায় অত্যন্ত রমণীয় হয়ে উঠলো কোকাইন অঞ্চলের ঝিরঝিরে সন্ধ্যা।

একটি মেয়ে সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। শ্যামলা রং, কিন্তু দুটো মস্তো বড়ো টানাটানা চোখ। লম্বা একহারা চেহারা, শরীরের গঠনে পরিপূর্ণ লাবণ্য। দেখেই বোঝা যায় উত্তর-ভারতীয় মেয়ে।

পোশাকের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য আছে। সেজেছে মোগল-মিনিয়েচারের অন্তঃপুরিকার মতো।

"ও কে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম চ্যা-থেইন্‌কে।

"আলাপ করিয়ে দেওয়ার আগে একটা কথা বলে দিই," সে হেসে বললো, "ওর সঙ্গে বেশী ভাব করবার চেষ্টা কোরো না, কষ্ট পাবে, দুঃখও পাবে। ওরকম অনেক হয়েছে। ওদের বাড়ি খুব গোঁড়া, ওরা পর্দা মানে, এমনি বাইরে বেশী বেরোয় না। যায় শুধু নিজের পুরোনো সহপাঠিনীদের বাড়ি। তাও গাড়ি চেপে। ট্রামে বাসে চড়ে না।"

"এখন তো দেখে খুব রক্ষণশীল মনে হচ্ছে না।"

"ও নিজে তা নয় মোটেও। বাইরে বেশী না বেরোক, শুধু কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের বাড়ি গিয়ে মাঝে মাঝে যা ঝড় তুলেছে, তাইতেই ধরাশায়ী হয়েছে আমার চেনা অত্যন্ত পাঁচ-ছ জন। তাছাড়া, মা-দা-দার কাছে যা গল্প শুনি, তাতে মনে হয় সে সেকালে জন্মালে ক্যাথারিন দি গ্রেট বা কুইন্ ক্রিস্টিনা বা মেসালিনা হতে পারতো।"

"মনে হচ্ছে, ঈসপ্ যদি তাকে নিয়ে গল্প লিখতো, গল্পের শেষে বলতো, পরিবার যতোই রক্ষণশীল হোক, যে বড় হয়ে জন্মায়, সে বড়ই থাকবে। বাগানের পাঁচিল যতোই উঁচু করো ফুল ঠিক টেনে আনবে ভ্রমরকে।"

আমার উপমায় চ্যা-থেইন হাসলো, বললো, "অভিজ্ঞ লোকেরা বলে অমন মেয়ের অনুরাগী হওয়ার চাইতে ভ্রমর হয়ে জন্মানো অনেক বেশী সুখের। একটি ঘটনা শোনো।—একদিন সে একজনকে লুকিয়ে নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে গল্প করছিলো। সেটা জেনে গেল ওর বড়ো ভাই। সে এসে বন্ধ দরজায় টোকা দিয়ে ওকে বললো দরজা খুলে দিতে। সে ভিতর থেকে জিজ্ঞেস করলো কেন। বড়ো ভাই বললো,—আমি উপরের জানলা থেকে দেখলাম একটি লোক পেছনের দরজা দিয়ে কাছড়া গলির ওদিক থেকে ভেতরে ঢুকছে।

অচেনা লোক। প্রত্যেক ঘর খুঁজে এলাম। তোমার ঘরে লুকিয়ে নেই তো?"

—না, আমার ঘরে কেউ লুকিয়ে নেই,—সে উত্তর দিলো ভেতর থেকে।

—তবু একবার ভালো করে খুঁজে দেখি, দরজা খোলো।

সে দরজা খুলে দিলো। ওর ভাই ভেতরে গিয়ে এখানে সেখানে খুঁজলো। কেউ কোথাও নেই।

—কিরকম দেখতে লোকটা?—জিজ্ঞেস করলো মেয়েটি।

—দেখতে তো ভদ্রঘরের ছেলের মতো। সিল্কের শার্টের উপর সিল্কের লুঙ্গি পরেছে। পায়ে ভেলভেটের ফানা, চোখে চশমা। তবে, আজকালকার চোর তো, দেখতে যদি ভদ্রলোকের মতো না হয় তো ভদ্রলোকের বাড়ি চুরি করবার সুবিধে হবে কি করে?

কথা বলতে বলতে সে ঘরের এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলো, হঠাৎ মনে হোলো এক কোণে ময়লা কাপড়ের বাক্সের ডালাটা তুলে দেখলে হয়। সে এগিয়ে গেল সেদিকে। মেয়েটি তাকে আটকাতে পারলো না। সে গিয়ে ডালাটা তুলে দেখে আমাদের শ্রীমান ওখানে লুকিয়ে।

ভাই তো চেঁচিয়ে উঠলো,—এই চোর ধরেছি।

সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে বললো,—না, ও চোর নয়, ওকে ছেড়ে দাও, ওকে এঘরে আমি এনেছি।

ভাই অবাক হয়ে তাকালো তার দিকে। সে যে বোঝেনি তা নয়, কিন্তু এতখানি সাহসের সঙ্গে বোন স্বীকার করবে সে ভাবতে পারে নি। কিন্তু ভাই চালাক লোক, সামলে নিয়ে হেসে বললো,—এই তোমার দোষ, কাউকে বিপদে পড়তে দেখলে নিজের কথা না ভেবে তাকে বাঁচাতে যাও। মানলাম, চোর অভাবে পড়ে চুরি করতে এসেছে, তাই বলে ওর জন্যে তোমার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু ওকে এমনি ছেড়ে দিলে তো ও সুধরোবে না, ওকে পুলিসে দিতে হবে।

বোন বললে,—না, না, খবরদার, ওকে পুলিসে দিতে পারবেনা বলছি—ওকে আমি এখানে এনেছি।

ভাই বললে,—আচ্ছা ওকেই জিজ্ঞেস করছি। ওই বলুক, ও এখানে চুরি করতে এসেছে, না তুমি ওকে এখানে নিয়ে এসেছো?

ওই বেচারা মুখ লাল করে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রইলো।

লোকজন জড়ো হোলো। সবাই জানলো, চোর এসেছিলো বাড়িতে। ভাই তাকে ধরে পুলিসে দিতে চেয়েছিলো, কিন্তু বোনের দয়ার শরীর, সে পুলিস ডাকতে দিলো না। অনেকে চোরকে উত্তম-মধ্যম দিতে চেয়েছিলো, কিন্তু বোনের জন্যে তাও পারলো না।

ছেলেটি ওর জন্যে এত সইলো, কিন্তু ওর আর তেমন আগ্রহ রইলো না তার জন্যে। কোনোদিন কারোজন্যেই ওর বেশী আগ্রহ নেই।"

চ্য-থেইনের কথা শুনে আমি হাসলাম। বললাম, "ছেলেটি খুব বেঁচে গেছে। ইতিহাসে একটি ঘটনা ঘটেছিলো এরকম, কিন্তু তার ফল হয়েছিলো আরো মর্মান্তিক। এক মোগল রাজকন্যা,—যদ্দুর মনে পড়ে, বোধহয় আওরংজেবের মেয়ে জেবুন্নিসা,—তার প্রণয়ীকে এনেছিলো হারেমের ভিতর। এমন সময় বাদশা এসে পড়লো। সে তাকে লুকিয়ে রাখলো স্নানাগারের গরম জলের কড়াইয়ের মধ্যে। বাদশা এসে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে আর কিছু না বলে জল গরম করবার হুকুম দিলো। শাহজাদীকে মুখ বুঁজে চুপ করে থাকতে হোলো। আর ওই বেচারা উত্তপ্ত কড়াইতে সেদ্ধ হয়ে প্রাণ দিলে।"

চ্য-থেইন চোখ কুঁচকে তাকালো আমার দিকে। বললো, "কার গল্প বললে, মোগল রাজকন্যা? দেখ, এই মেয়েটিও মোগল। ওরা মোগল স্ট্রীটে থাকে।"

মোগল! আমার ভুরু দুটিও কুঁচকে গেল।

গল্প করতে করতে আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। চ্য-থেইন আমায় নিয়ে একটু একটু করে এগিয়ে যাচ্ছিলো সেই মেয়েটির দিকে।

কিছুক্ষণ পরে তার সামনা সামনি হতেই চ্যু-থেইন তাকে বললো, "আমার এই বন্ধুর সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিই। রয়, এ মা-লা-লার বন্ধু মিমি।—এ আমার বন্ধু সলিল রয়।"

আমি সামনে ঝুঁকে পড়ে হাত নেড়ে তিনবার কুর্নিস করলাম। মিমিও হাত কপালে ঠেকালো, তারপর হেসে ফেললো।

"এটা আবার কি?" বুঝতে না পেরে জিজ্ঞেস করলো চ্যু-থেইন।

"আগেকার দিনে মোগল শাহজাদীদের এভাবে অভিবাদন করা হোতো।" আমি বললাম।

"ও।" চ্যু-থেইন হেসে ফেললো, "মিমি মোগল প্রিন্সেস্-এর পোশাক পরে এসেছে বলে বুঝি তুমি ওকে এভাবে অভিবাদন করলে? কিন্তু তুমি তো বার্মিজ কোর্ট-ড্রেস পরেছো, তোমার 'শেকো' করা উচিত ছিলো। যাই হোক,—তোমরা গল্প করো, আমি তোমাদের জন্যে দুটো কোল্ড-ড্রিংক নিয়ে আসি।"

চ্যু-থেইন চলে গেল। আমি বললাম, "দেড়শো বছর আগে দেখা হলে হয়তো এত কাছে থেকে কুর্নিস করবার সুযোগ হোতো না।"

মিমি তার গভীর দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো, "মনে হচ্ছে আমি কে, তুমি তা জানো।"

"জানি না, আঁচ করেছি। কো-চ্যু-থেইন্ বলছিলো, তোমরা মোগল, মোগলস্ট্রীটে থাকো।"

"মোগল স্ট্রীটে অনেকেই থাকে—।"

"হ্যাঁ, আমার খুব চেনা একজনও থাকে। মীর্জা দিলওয়ার বক্স্।"

"উনি তোমার খুব চেনা?"

"হ্যাঁ, খুব চেনা। তুমি ওকে জানো নাকি?"

"উনি আমার বড়ো ভাই।"

এরকম একটা সম্ভাবনার কথা আমি যে মনে মনে ভাবছিলাম

না তা নয়। "ওর সঙ্গে আজকাল আর আমার বড় একটা দেখা হয় না। তবে এক সময় প্রায়ই দেখা হোতো।"

"তোমায় দেখে কিন্তু মনে হয় না যে বড়ো ভাই-সাহেবের সঙ্গে তোমার বেশীদিন বনতে পারে।"

একটু অদ্ভুত মনে হোলো মিমির কথাটা। কি বলতে চাইছে, ঠিক বুঝতে পারলাম না। উত্তর দিলাম, "আমার একজন বন্ধু ওরও খুব অন্তরঙ্গ বন্ধু। তারই মারফতে আলাপ।"

"দাদার বন্ধু? কে?"

"অমিয় গাঙ্গুলি।"

"ও, সেই গাইয়ে? আমি ওর গান শুনিনি, তবে কয়েকজনের কাছে শুনেছি যে ও খুব ভালো গায়। ম্, তাই বলো। তোমার নাম শুনে আমি ভাবছিলাম কোথায় আগে যেন শুনেছি। এখন মনে পড়লো। তুমিই শিরীনের ভাইয়া-জী?"

আমি তার দিকে তাকালাম। বললাম, "তুমি কি করে জানো?"

সে হাসলো। বললো, "বড়ো ভাই-সাহেবের সঙ্গে আমার খুব ভাব। সে আমায় সব গল্প করে।"

শিরীনের কথা কি জানি কেন, আমায় একটু ব্যথা দেয়। আমি আর এ প্রসঙ্গের আলোচনা চাইলাম না। কথা ঘোরালাম।

"চ্য-থেইন বলছিলো, তুমি মা-লা-লার সঙ্গে পড়তে।"

"হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গে কনভেন্ট থেকে হাইস্কুল ফাইন্যাল পাস করেছি।"

"তুমি কলেজে এলে না কেন?"

"বড়ো ভাই সায়েব চান না যে আমি কলেজে পড়ি। যদি মেয়েদের কোনো আলাদা কলেজ এখানে থাকতো, তা হলে হয়তো পড়তে পারতাম। বড়ো ভাই সায়েব মেয়েদের পড়াশুনোই পছন্দ করে না। আমার বাবা খুব উদারপন্থী লোক ছিলেন, তাই এটুকু পেয়েছি।"

"উনি তোমায় কলেজে পাঠালেন না কেন?"

একটু থেমে মিমি বললো, "উনি এখন অসুখে শয্যাশায়ী। সংসারের কোনো ব্যাপারে কিছু আর বলেন না। যা করবার বড়ো ভাইসায়েবই করে।"

"তুমি কি করো?"

"আমি?" মিমি হাসলো, "আমি বাবার দেখাশুনো করি। দু চারজন স্কুলের বন্ধু আছে, তাদের বাড়ি যাই মাঝে মাঝে। রান্না করি কখনো সখনো।"

চ্য-থেইন কোল্ড-ড্রিংক্‌স্ নিয়ে এলো। বেশীক্ষণ একলা গল্প করা হোলো না। ভিড়ে যেতে হোলো অন্যান্য সবার মধ্যে। তবু মন পড়ে রইলো ওর উপর। ওর সম্বন্ধে আরো জানবার জন্যে দুর্নিবার ইচ্ছে জাগলো মনের মধ্যে। দুশো বছর আগে যারা দিল্লির হারেমে শাহ্-ইন-শাহ শাহাজাদাদের আদরে সোহাগে বিলাসে লাস্যে অসূর্যম্পশ্যা রহস্যময়ী হয়ে থাকতো, তাদেরই একজনকে আজ কোকাইন রোডের ধারে, এখানে এক উচ্চ মধ্যবিত্ত পাশ্চাত্যভাব প্রভাবিত বার্মিজ বাড়ির ফ্যান্সি-ড্রেস পার্টিতে দেখে ইতিহাসের অমোঘ কাল-বিবর্তনের মুখোমুখি মনে হোলো নিজের মনকে। রাজবংশ এসেছে, জয় করেছে, তারপর ইতিহাসের প্রগতির কাছে হার মেনে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, অনন্য সাধারণ তার রক্তের আভিজাত্য বিস্মৃত হয়ে বিলীন হয়ে গেছে সাধারণের মধ্যে। সামন্ততন্ত্র, রাজতন্ত্র গত দুই শতাব্দীর মধ্যে মিছিল করে চলে গেছে ফ্যাশান-শোর বিভ্রমময়ী ক্ষণিকা মডেলদের মতো, প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার কয়েক বছরের মধ্যে ইওরোপে জাপানে দেখা দিয়েছে জঙ্গী একনায়কতন্ত্র, এশিয়ায় আফ্রিকায় শিকড় গেড়ে বসে আছে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ। এদেরও কি পরিণতি হবে কে জানে? সেই উনিশশো একচল্লিশে তখন ইওরোপে যুদ্ধ চলছে, বৃটেনের উপর জার্মান ব্লিৎজ্, রাশিয়ার উপর সবে আক্রমণ শুরু করেছে জার্মান বাহিনী, আফ্রিকায় ইতালীয় সেনার সঙ্গে শক্তি পরীক্ষা হচ্ছে

জেনারেল মন্টগোমেরির বাহিনীর সঙ্গে। সুদূর প্রাচ্যেও যুদ্ধের ঘন ঘটা, জাপান যে কোনোদিন যুদ্ধে নেমে পড়তে পারে। রেডিওতে হুংকার শোনা যায় হিটলার মুসোলিনি, তোজোর। তাদের সদম্ভ পদক্ষেপে ধরণীর বুক যে টলমল করে ওঠে সেটা বোঝা যায় রোম-বার্লিন-টোকিও থেকে হাজার হাজার মাইল দূরে রেঙ্গুন নগরীতে বসে। সেদিন উনিশ-শো-একচল্লিশের জুলাই মাসের সেই সন্ধ্যায় চ্য-থেইনের বাড়িতে অন্য সবার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা গল্প করতে করতে ভাবছিলাম, আজ থেকে কয়েক বছর পরেও এমনি শোনা যাবে ওদের সদৃপ্ত ভাষণ, নাকি ওরাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে মিমি আর দিলওয়ারের পূর্বপুরুষদের মতো।

মিমি একসময় পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো। হঠাৎ বললো, "তোমায় একটু আনমনা দেখাচ্ছে। কি ভাবছো?"

"হীরা মুক্তা মাণিক্যের ঘটা," আমি আস্তে আস্তে বল্লাম রবীন্দ্রনাথের ইংরেজী অনুবাদ, "যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা, যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক—।"

"তা হলে কি হবে?" সে হেসে জিজ্ঞেস করলো,

"—শুধু থাক," আমি বলে গেলাম।

"কি?"

"তুমি, যার নাম শুধু সাধারণ একটি মিষ্টি মিমি—।"

মিমি হেসে ফেললো, হেসে সরে গেল সেখান থেকে। একটু পরে এসে বললো, "এ তো তোমার ভাষা বলে মনে হচ্ছে না। এটা কার লেখা?"

"রবীন্দ্রনাথের।"

"রবীন্দ্রনাথ? হু ইজ হি? সে আবার কে?"

সে যুগ হলে, আর তুমি যদি হতে সম্রাট নন্দিনী, তাহলে নিজের গলার মুক্তোর মালা তুমি নিজের হাতে যার গলায় পরিয়ে দিয়ে ধন্য হতে, তিনি সেই। মুখে বললাম, "রবীন্দ্রনাথ টেগোরের নাম শোনো নি?"

"টেগোর? ও হ্যাঁ," বললো মোগল-নন্দিনী, "ইণ্ডিয়াতে টেগোর নামে একজন বড় পোয়েট আছে বলে শুনেছি। কিন্তু ওর কোনো লেখা পড়িনি। খুব বড়ো কবি? গালিবের চাইতেও বড়ো?"

আমি ভাবছিলাম; এ প্রশ্নের কি উত্তর দেবো। কলেজের কমনরুমে জুনিয়ার ভারতীয় ছাত্রদের বিভিন্ন প্রদেশীয়দের মধ্যে মাঝে মাঝে বাকবিতণ্ডা হয়, কে বড়ো, রবীন্দ্রনাথ না ইকবাল না সুব্রহ্মণ্য ভারতী। বলা বাহুল্য সে আলোচনা সাহিত্য সম্পর্কিত নয়, শুধু প্রদেশ প্রেমের একটা উদাত্ত আত্মপ্রকাশ মাত্র। সেখানে টেবিল চাপড়ে গর্জন করে বলা যায়, হে বেংকটরামন, কি হে আব্দুল কাদের, কি হে শংকর চাটুজ্যে, তুমি কি জানো, অমুক তমুক...। সেখানে রবীন্দ্রনাথ কি সুব্রহ্মণ্যভারতী কি ইকবাল কারো সম্বন্ধেই কারো কোনো জ্ঞান নেই। শুধু যে যার নিজের প্রদেশকে জাহির করবার জন্যেই একটা সাময়িক তর্ক। মাঝে মাঝে পরিস্থিতি গুরুতরও হয়ে উঠতো, রাজাগোপালাচারি যেদিন এক বক্তৃতায় সুভাষ বোসকে ফুটো নৌকো সঙ্গে তুলনা করেছিলেন, সেদিন কমন-রুমে মাদ্রাজী আর বাঙালী ছাত্রদের মধ্যে কিছুক্ষণ মুষ্টিযুদ্ধ চলেছিলো, প্রিন্সিপ্যাল উ-কে-মং-টিন নিজে যতোক্ষণ এসে পড়েননি ততক্ষণ কেউ থামাতে পারেনি এই কুরুক্ষেত্র।—সেই কমনরুমের তর্কসভায় যে উত্তর দিতাম মিমির প্রশ্নের সে উত্তর নিশ্চয়ই এখানে এই পরিবেশে মিমির মতো একটি মেয়েকে দেওয়া যায় না।

আস্তে আস্তে বললাম, "গালিব অষ্টাদশ শতাব্দীর, রবীন্দ্রনাথ বিংশ শতাব্দীর। কিন্তু দুজনেই চিরকালের কবি। একজন তোমার মনের কথা বলে, আরেকজন আমার।"

মিমি আবার হাসলো, তারপর বললো, "বাহাদুর শাও মস্ত বড়ো কবি ছিলেন। জফরের নাম শুনেছো? ওটা তাঁরই ছদ্মনাম। কোনো একদিন একটা কথা আমি তোমায় বলবো বলে উনি একটি শের লিখে গিয়েছিলেন,—

কহ্‌ দো ইন হসরতোঁ সে
কহীঁ ঔর জা বসে
ইতনী জগহ্‌ কঁহা হৈ
দিল-এ দাগদার মে—

এসব বাসনা কামনাকে বলে দাও ওরা যেন অন্য কোথাও চলে যায়, কারণ আমার দাগ্‌দার মনে আর এত জায়গা কোথায়?"—বলেই সে আবার অন্যদিকে চলে গেল।

আমি অবাক হয়ে ভাবছিলাম, ও হঠাৎ আমায় একথা বলে চলে গেল কেন। পাশে চ্য-থেইনের গলা শুনলাম।

"কি ব্যাপার? দুজন যে প্রায়ই কাছাকাছি হয়ে পড়ছো, চুপচাপ দুটো চারটে কথা বলছো, আবার সরে যাচ্ছো? সাবধান করে দিচ্ছি ভাই, পরে আমায় দোষ দিও না।"

চায়ের পাট চুকে গিয়ে ততক্ষণে খেলার ধুম পড়ে গিয়েছে। আমি কোনো খেলায় যোগ দিইনি। চারদিকে হাসি হুল্লোড়। আমি থেকে থেকে আনমনা হয়ে পড়ছিলাম। ট্রেশার-হাণ্ট খেলা শেষ হোলো। রোজমারী মেহতা একবাক্স রুমাল প্রাইজ পেলো। চারদিকে হাততালি। সবাই সার বেঁধে উঠোনের দুদিকে বসলো। শুরু হোলো পাসিং-দি-পার্সেল। একটি প্রাইজের চারদিকে র‍্যাপারের পর র‍্যাপার। একটি র‍্যাপার খুলতে আরেকটি নতুন র‍্যাপার। তার উপরে একটি নাম লেখা,—সব-চাইতে-মিশুক-মেয়ে, খুব-বোকা-বোকা-দেখতে-একটি-ছেলে, এরকম একটা না একটা কিছু। যার হাতে পার্সেল পড়ছে, সে নাম দেখে চারদিকে তাকিয়ে, যার সঙ্গে র‍্যাপারের উপর লেখা বর্ণনার মিল আছে বলে মনে করছে, তার হাতে গিয়ে তুলে দিলে পার্সেলটি। সে র‍্যাপার খুলতে বেরিয়ে পড়ছে আরেকটি র‍্যাপার। এমনি করে র‍্যাপার খুলতে খুলতে শেষবার গিয়ে পড়লো মিমির হাতে। সে উঠে দাঁড়িয়ে বর্ণনা পড়লো,—যার নতুন করে জীবন শুরু করা উচিত। চারদিকে তাকিয়ে দেখলো। তারপর দেখলাম আস্তে আস্তে এগিয়ে আসছে

আমার পাশে একজন এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছেলের দিকে তাকাতে তাকাতে। সবার চোখ পড়লো তার উপর। তার সামনে এসে মিমি আচমকা আমার দিকে ফিরে পার্সেল তুলে দিলো আমার হাতে। সবাই হৈ হৈ করে উঠলো। আমি শেষ র‍্যাপারটা খুললাম। ভেতরে প্রাইজ,—একটি ফিডিং-বট্‌ল্। হেসে গড়িয়ে পড়লো সবাই।

চ্য-থেইন আস্তে আস্তে আমার পেছনে এসে ফিশ ফিশ করে বললো, "গুডলাক। নতুন করে জীবন শুরু করো।"

তারপর শুরু হোলো নতুন খেলা,—মিউজিক্যাল আর্মস্। এ খেলা মিউজিক্যাল চেয়ারের একটা অন্য সংস্করণ। ছেলেরা সার বেঁধে একজনের পেছনে একজন দাঁড়ালো, একটি হাত কোমরে রেখে। যত জন ছেলে, তার চাইতে একজন বেশী মেয়ে বাজনার সঙ্গে সঙ্গে সার বেঁধে ঘুরতে লাগলো ছেলেদের চারদিকে। আচমকা থেমে গেল বাজনা, যে যেখানে ছিলো সবচাইতে কাছের ছেলেটির হাতের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো। মেয়েরা সংখ্যায় একজন বেশী বলে, একটি মেয়ে হোলো 'আউট্।' তারপর ছেলেদের একজন কমিয়ে আবার শুরু হোলো বাজনার সঙ্গে পরিক্রমা। এমনি করে একজন ছেলে একজন মেয়ে কমতে কমতে শেষ পর্যন্ত যে মেয়ে রইলো তারই হোলো খেলায় জিৎ। শেষ হতে, উল্টো করে খেলা শুরু হোলো, মেয়েরা কোমরে হাত রেখে দাঁড়ালো সার বেঁধে। এবার পরিক্রমা ছেলেদের। এটা শেষ হতে নতুন করে শুরু হোলো আবার, একজন মেয়ের পেছনে একজন করে ছেলে। পরিক্রমাতেও তাই। এ খেলা আরো একটু শক্ত। বাজনা থামার সঙ্গে সঙ্গে সবাই যখন দাঁড়িয়ে পড়ে নিকটবর্তীর হাতের ভিতর হাত ঢুকিয়ে দেবে, তখন মেয়ের হাতের ভিতর মেয়ের হাত বা ছেলের হাতের ভিতর ছেলের হাত হলে চলবে না। ছেলের হাতের ভিতর মেয়ের হাত বা মেয়ের হাতের ভিতর ছেলের হাত ঢোকাতে হবে, তা নইলে, যারা ভুল করেছে, তারা আউট, যে "অড্-ম্যান" সেও আউট।

প্রত্যেক পরিক্রমাতেই দেখলাম মিমি এসে হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে আমার হাতের ভিতর। আর কারো চোখে তেমন পড়লো না, তবে চ্য-থেইন লক্ষ্য করলো, মা-খিন-স লক্ষ্য করলো, মা-লা-লা লক্ষ্য করলো।

রাত হয়ে আসছে। বাড়ি ফিরতে হবে। পার্টি শেষ হোলো। সবাই যখন বেরিয়ে আসছে, আমি মিমিকে বললাম, "তুমি কার সঙ্গে ফিরবে? চলো আমি তোমায় বাড়ি পৌঁছে দিই।"

"সে হয়না", মিমি বললো, "কারো সঙ্গে আমার বাড়ি ফেরা অসম্ভব, আমার বাড়ির লোক পছন্দ করবে না। মা-খিন-স গিয়ে আমায় নিয়ে এসেছে, সেই আমায় পৌঁছে দেবে।"

দুজনে একটু চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। তারপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, "আবার কবে দেখা হবে।"

"জানিনা," মিমি আস্তে আস্তে বললো, "যদি এমনি হঠাৎ কোথাও দেখা হয়ে যায় তো হয়ে যাবে।"

সে দাঁড়িয়ে রইলো। আমি বেরিয়ে চলে এলাম।

মা-লা-লা থাকতো আলোন্‌এ। একদিন চ্য-থেইন এসে আমায় ওর বাড়ি নিয়ে গেল। সেখানে দেখলাম মিমিও এসেছে। অনেকক্ষণ সবার সঙ্গে গল্পসল্প করে বাড়ি ফিরে এলাম।

পেগি আরভিন আর ওর ভাই বার্টি থাকতো স্পার্কস্ স্ট্রীটে। পেগি একদিন আমায় কলেজ থেকে ধরে ওদের বাড়ি নিয়ে গেল। সেখানে মা-খিন-স'র সঙ্গে এসে উপস্থিত হোলো মিমি। আমায় দেখে যেন বিস্মিত হোলো। বললো, "কি খবর সলিল, তুমি কোত্থেকে?"

গল্পসল্প করে চা খেয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

আরেকদিন শনিবার কলেজ ফেরৎ কো-মং-জীর সঙ্গে ওদের চার্চহিল রোডের বাড়িতে গেলাম। সেখানে এসে জুটলো কো-চ্য-থেইন। তারপর এলো মা-লা-লা, মিমি আর মা-খিন-স একসঙ্গে।

গল্পসল্প করে বাড়ি ফিরে এলাম।

জুলাই কেটে গিয়ে আগস্ট এসে পড়লো।

"আজ আমাদের বাড়ি চলো," একদিন বললো চ্য-থেইন।

"মিমি আসছে বুঝি?" আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম।

চ্য-থেইন হেসে ফেললো।

"কি ব্যাপার বলো তো?"

চ্য-থেইন একটু হাসলো। বার্মিজ ছেলেরা সরল হয় খুব। সোজাসুজি বললো, "দেখ, মিমিদের বাড়িতে খুব পর্দা মানে। ও কোথাও একা যেতে পারে না। তবে ওর সঙ্গে যারা স্কুলে পড়তো, ওদের এসে নিয়ে গেলে ওদের বাড়ি যেতে পারে। আজকাল ও যখনই কোনো বন্ধুর বাড়ি যায়, তখনই আমরা তোমায় ডেকে নিয়ে যাই সেখানে। ও যে কিছু বলে, তা নয়। প্রথম দুএকদিন বলেছিলো মা-খিন-সকে। তারপর আর বলতে হয় না।"

আমি চুপ করে শুনে গেলাম কিছু বললাম না।

একটু থেমে চ্য-থেইন বলে গেল, "তবে একটা কথা, এমনি দেখা হচ্ছে, গল্পসল্প হচ্ছে, খুব ভালো। তবে বেশীদূর যেও না। এরকম ওর জীবনে নতুন নয়। আরো তিন চার জনের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি। ও খুব ভালো, বন্ধুত্বই রাখে, বেশীদূর এগোয় না। কিন্তু অন্যজন প্রায়ই বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়ে ফেলে। ও সরে যায়। ওরা দুঃখ পায়, কষ্ট পায়। ওদের পরিবার এত বেশী রক্ষণশীল যে এরকম কিছু ওর জীবনে সম্ভব নয়। একথা সে জানে। অন্য সবাই যে সেকথা ভুলে যায়, সেটাই সবার ব্যথা পাওয়ার কারণ। কখনো ভুলে যেও না যে, মিমি খুব ভালো বন্ধু, কিন্তু খুব নিঃসহায় বান্ধবী।"

আমি চুপ করে শুনে গেলাম।

চ্য-থেইন আমার দিকে তাকিয়ে একটু হাসলো, বললো, "কেন যে তোমাদের ইণ্ডিয়ান ফ্যামিলিরা এত পর্দা মানে, বুঝি না। মেয়েরা মেয়ে, ওদের পর্দার ভেতরেই রাখো আর জেলখানাতেই

রাখো, ছেলে বন্ধু ওরা খুঁজে বার করবেই। আমাদের মধ্যে তো এত স্বাধীনতা, কিন্তু তোমাদের রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েরা আমাদের মেয়েদের চাইতে কিছু কম যায় না। এসব পর্দা, এসব রক্ষণশীলতা থেকে কি হয় জানো, কেউ না কেউ কোথাও না কোথাও একদিন না একদিন খুব ব্যথা পায়। রক্ষণশীলতা একরকমের স্বাধীনতার খর্বতা। মানুষকে ব্যথা দেওয়া ছাড়া এর আর কোনো অবদান নেই। কোনো ঐতিহাসিক বা পারিবারিক দুঃসময়ে আত্মসংরক্ষণের জন্যে হয়তো রক্ষণশীলতা খুব সুবিধেজনক, কিন্তু তার পরিণতি খুব ভালো নয়, খুব বেশী দাম দিতে হয় তার জন্যে। তোমাদের দেশের উপর দিয়ে যে সব ঐতিহাসিক বা সামাজিক বিপর্যয় গেছে, আমাদের দেশের উপর দিয়ে তার চাইতে কিছু কম যায়নি। আমরা টিকেও আছি, আত্মসংরক্ষণের জন্যে আমাদের রক্ষণশীল হতে হয়নি।"

ওর বক্তৃতা শুনে আমি হেসে ফেললাম।

চ্য-থেইন খানিকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "তুমি হয় তো ভাবছো কোনো সামান্য কথাকে উপলক্ষ্য করে আমি এত বড় বড় কথা বলছি। তুমি জানো না। এ দেশে তোমরা ইণ্ডিয়ানেরা চোখ বুজে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছো, ভাবছো সব যেমনি চলছে, তেমনি চলবে। তা নয় কিন্তু। একটা ঝড় আসছে। সব কিছু উপড়ে নিয়ে যাবে। এখন আমায় আর কিছু জিজ্ঞেস কোরো না। একদিন আমার কথা বুঝতে পারবে।"

চ্য-থেইন দোবামা পার্টির একজন কর্মী, সে কথা জানতাম। মনে মনে ভাবলাম, কি ইঙ্গিত করতে চাইছে সে। আমরা নিজেরা তো নিজেদের ছোটো খাটো স্বার্থ ও সমস্যা নিয়ে ব্যস্ত, এ দেশ যে একটা বিরাট রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবর্তনের প্রত্যাশায় বসে আছে, সেটা চোখ খুলে উপলব্ধি করবার মতো শক্তি না থাকলেও মনে মনে যে একটু আঁচ করতে পারি না, তা নয়।

যাই হোক, এ সব হয়তো রাজনৈতিক কর্মীর অলসমুহূর্তের আর দশটা ভাবপ্রবণ কথার মতো আরেকটি কথা।

চ্য-থেইনের বাড়িতে মিমির সঙ্গে দেখা হোলো। খুব হৈ চৈ, খুব গল্পগুজব করে সন্ধ্যের পর বাড়ি ফিরে এলাম।

এমনি করে এর ওর তার বাড়ি পর পর কয়েকবার দেখা হোলো মিমির সঙ্গে।

কেটে গেল আগস্ট মাস।

সুলে প্যাগোডার উল্টোদিকে সিটিহল্‌এর সামনে একদিন বিকেলবেলা দাঁড়িয়ে আছি, রাস্তা পেরিয়ে ফেয়ার স্ট্রীটের দিকে যাবো এই সংকল্প, এমন সময় একটি ঘোড়ার গাড়ি সামনে এসে থেমে গেল। সেদিন, যদ্দুর মনে পড়ে, বৃহস্পতিবার। কি একটা উপলক্ষে কলেজ বন্ধ ছিলো।

গাড়ি থেকে মুখ বাড়ালো মা-খিন-স, বললো, "এসো, এসো। তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গিয়ে ভালোই হোলো। কো-চ্য-থেইন বা কো-মং-জ্যীকে তোমায় ডাকতে পাঠাতে হবে না।"

দেখলাম, মা-খিন-সর পাশে মা-লা-লাও বসে আছে। গাড়িতে উঠে পড়লাম। সুলে প্যাগোডার পাশ কাটিয়ে ডেলহাউসি স্ট্রীট ধরে গাড়ি এগিয়ে চললো, কিছুক্ষণ পরে মোড় ফিরে এসে পড়লো মোগল স্ট্রীটের মোড়ে। একধারে মোগল স্ট্রীটের মস্তো বড়ো মসজিদ, ভারতের শেষ মোগল সম্রাট রেঙ্গুনে নির্বাসিত বাহাদুর শার তৈরী। তার চারদিকে ঘিরে বিরিয়ানীর দোকান। মোগল স্ট্রীট ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে ঢুকে পড়লো একটি সরু গলিতে। এখানে এলে বোঝাই যায় না বিদেশে আছি। চারদিকে গুজরাটি, মারওয়াড়ি, ভাটিয়া আর সুরতী মুসলমানদের দোকান। অন্যান্য বাড়ির বাসিন্দাও সব উত্তর ভারতীয়। দোতলা তেতলার বারান্দা থেকে ঝুলছে ধুতি শাড়ি আর নোংরা চটের পর্দা। গলিময় হিন্দিভাষার শোরগোল। পরিবেশ একেবারে কলকাতার বড়বাজার বা দিল্লির চাঁদনী চৌকের মতো। সেখানে একটি বাড়ির সামনে গাড়ি এসে

থামলো। মা-লা-লা ও মা-খিন-স আমায় বললো, "তুমি গাড়িতে বসে থাকো। আমরা গিয়ে মিমিকে নিয়ে আসছি।"

ওরা ভেতরে চলে গেল। আমি বসে রইলাম গাড়ির ভেতর। তাকিয়ে দেখলাম বাড়িগুলোর দিকে। এসব বাড়ির স্থাপত্যও একেবারে উত্তর ভারতীয়, এদেশে শহরের অন্যান্য অঞ্চলে দেখা যায় না। মাঝখানে চৌক, সেই উঠোন ঘিরে দালান উঠেছে। সদর দরজা ভেজানো। দরজায় টুলের উপর বসে আছে এক বুড়ো মুসলমান। তার মাথায় আধময়লা চিকনের টুপি।

বসে আছি তো বসেই আছি, অনেকক্ষণ কারো দেখা নেই। একঘেয়ে লাগলো। গাড়ির দরজা খুলে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

হঠাৎ দেখি, একটি রিকশ চড়ে দিলওয়ার আসছে। আমি ভাবলাম, তার সঙ্গে দেখা না হলেই ভালো। তাড়াতাড়ি গাড়িতে উঠে পড়তে গেলাম। কিন্তু দিলওয়ার আমায় দেখে ফেললো।

"আরে সলিল, তুমি কোত্থেকে?"

রিকশ এসে থামলো গাড়ির পাশে। কুরঙ্গী রিকশওয়ালাকে এক আনা পয়সা দিলে দিলওয়ার। সে আর দুটি পয়সা চাইলো। দিলওয়ার দিলো ধমক। সে পয়সা ট্যাঁকে গুঁজে, রিকশ ডাণ্ডি তুলে নিয়ে চলে গেল।

"তুমি এখানে কি করছো?"

"কিছু না। সুলে প্যাগোডার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলাম, হঠাৎ আমাদের কলেজের দুজন বার্মিজ মেয়ের সঙ্গে দেখা। ওরা আমায় তাড়াতাড়ি গাড়িতে তুলে নিলো। তারপর এখানে এসে গাড়ি থামলো। বললো, ওদের কে একজন বন্ধু থাকে এখানে, তাকে তুলে নেবে।"

"এখান থেকে কোথায় যাবে?"

"ঠিক জানি না। যাবো হয়তো মা-খিন-স'দের বাড়ি। সেখান থেকে ওর ভাই চ্য-থেইনকে নিয়ে সিনেমায় যাবো।"

"হুঁ। শুধু তুমি আর চ্য-থেইন?"

"হ্যাঁ। আর কাকে নেবো?

দিলওয়ার আমার দিকে তাকিয়ে একটু ভাবলো কি যেন। তারপর বললো, "চলো বাড়ির ভেতর। এখানে দাঁড়িয়ে কি করবে?"

"বাড়ির ভেতর?" আমি অবাক হওয়ার ভান করলাম। ভেতরে ভেতরে ঘামতে শুরু করেছি তখন।

"হ্যাঁ। ওটা তো আমার বাড়ি। চলো। তুমি তো আসো না কোনোদিন। আজ যখন গরীবখানার সামনে এসেই পড়েছো তখন মেহেরবাণী করে ভেতরে এসে একটু তশরীফ রাখো।

গেলাম ভেতরে। চৌক পেরিয়ে পেছন দিকের বারান্দায় উঠে এলাম। তারপর ডানদিকে খানিকটা গিয়ে ঢুকে পড়লাম একটি ঘরে।

সাদাসিধে ঘর। ছোট ছোট জানলা, নানা আকারের কাঠের ফ্রেমে লাল নীল সবুজ কাচ বসানো। ঘরের দেওয়াল মোজইকে বাঁধানো, ছোট ছোট রঙীন মার্বেলের টুকরোতে নানারকম ফুল পাতা পাখির ডিজাইন। ঘর জুড়ে ডিজাইনদার লাইনোলিয়াম পাতা। একপাশে একটা ছোট্টো ফরাশ, তাতে দুটো তিনটে মসনদ।

জুতো বাইরে ছেড়ে ভেতরে এসে বসলাম। দিলওয়ার গড়গড়ার নল তুলে নিলো। আমার দিকে এগিয়ে দিলো সিগারেটের টিন। ভেতরে খবর পাঠালো। এক বুড়ো মুসলমান চাকর দু কাপ চা নিয়ে এলো।

তাকে দিলওয়ার বললো, "বিবিজীরা বাইরে যাওয়ার সময় এখানে একবার আসতে বলবে, বুঝেছো।"

"জী", বলে চলে গেল সেই বুড়ো মুসলমান চাকর।

খুব আন্তরিক ভাবে আগেরই মতন কথা বলতে লাগলো দিলওয়ার। অমিয়র কি খবর, মা-য়িন-ম্যার সঙ্গে দেখা হয় কি না, এই সব।

আমি হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, "শিরীনের কোনো খবর জানো?"

"না", উত্তর দিলো দিলওয়ার, তারপর বললো, "দুনিয়ার এর ওর

তার খবর রাখবার ওঅখ্‌ত্ কোথায়? সব সামানের দাম বাড়ছে, কারবার খুব জোর চলছে এখন। বোধ হয় জাপানের সঙ্গে লড়াই লেগে যাবে।

নিজের মনে বকে চললো দিলওয়ার। তার কিছু কথা আমার এক কান দিয়ে ঢুকে অন্য কান দিয়ে বেরিয়ে গেল, আর কিছু কথা পেরিয়ে গেল মাথার উপর দিয়ে।

আমি তখন ভাবছি, মিমির সঙ্গে দেখা হয়ে গেলে কি ভাব দেখাবো।

বেশীক্ষণ ভাববার অবসর হোলো না। হঠাৎ একসময় বাইরে তিন জোড়া কানার কটকট আওয়াজ হোলো। মিমির সঙ্গে মা-খিন-স আর মা-লা-লা ঘরের ভিতর এসে ঢুকলো।

মিমির পরনে বার্মিজ পোশাক,—সিল্কের লোন্‌জ্যি আর ভয়ল্‌এর এন্‌জ্যি। আগেও তাকে দেখেছি এ পোশাকে, সুতরাং খুব বিস্মিত হলাম না। এদেশের পর্দানশীন ভারতীয় মুসলমান মেয়েরা যখন পর্দা না করে বাইরে বেরোতে চায়, তখন ওরা পরে বার্মিজ পোশাক। তাতে কারো নজরে পড়ে না। চেনা কারো নজরে পড়লেও এ পোশাকে দেখলে কেউ কিছু বলে না। এটা একরকম রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমায় দেখে মিমি বললো, "হালো রয়, তুমিও এসেছো?"

"হ্যাঁ, আমাদের সঙ্গে পথে দেখা হয়ে গেল," বললো মা-খিন-স, "শুনলাম সে যাচ্ছে চ্য-খেইনের কাছে। তাই গাড়িতে তুলে নিলাম।"

দিলওয়ার বললো, "তুমি সলিলকে চেনো দেখছি। আগে তো বলোনি আমায়?"

"এ যে তোমার বন্ধু সেই সলিল সেটা আমি জানতাম না", বললো মিমি।

"ওর সঙ্গে বুঝি তোমার প্রায়ই দেখা হয়?" আমায় জিজ্ঞেস করলো দিলওয়ার।

"দু-একবার চ্য-থেইনদের বাড়ি দেখা হয়েছে।"

"ও আমার কি হয় জানো?"

আমি তাকালাম দিলওয়ারের দিকে।

"ও আমার বোন, লৎফুন্নেসা।"

"তোমার বোন হয় একথা জানতাম না। আমি ওকে আমার বন্ধু চ্য-থেইনের বোন মা-খিন-স'র বন্ধু মিমি বলেই জানি।

"তোমরা চা খাবে না?" দিলওয়ার জিজ্ঞেস করলো মা-খিন-স'কে।

"চা বাড়ি গিয়ে খাবো। তাড়াতাড়ি যেতে হবে।"

"হ্যাঁ। আজ জুম্মাবার, মিমিও তো বেশীক্ষণ থাকতে পারবে না," বললো দিলওয়ার, "সলিল কি করবে? আরেকটু বসবে, না ওদের সঙ্গে যাবে?"

"আমার চ্য-থেইনের সঙ্গে সিনেমায় যাওয়ার প্রোগ্রাম।"

"আচ্ছা। বাড়ি তো চিনলে। আরেকদিন জরুর আসবে। আমি খুব খুশী হবো। তোমার সঙ্গে তো দেখাই হয় না আজকাল।"

আমরা বেরিয়ে এসে গাড়িতে উঠে পড়লাম। পেছন পেছন একটি চাকর এসে মিমির হাতে একটি ছোটো স্যুটকেস তুলে দিলো।

মিমিদের বাড়ি থেকে আমরা এলাম মা-লা-লাদের আহলোন্‌এর বাড়িতে। আমি একবার বলেছিলাম, "আমি বরং এখানে নেমে কোকাইন চলে যাই কো-চ্য-থেইন্‌এর কাছে।"

মা-লা-লা আর মা-খিন-স হেসে উঠলো। মিমিও হাসি মুখে তাকিয়ে রইলো বাইরের দিকে। আমি আর কিছু বললাম না।

সেদিন আমি আর মিমি একলা বসে গল্প করলাম অনেকক্ষণ। আমাদের পেছন দিকের বারান্দায় একলা রেখে ওরা বসেছিলো ঘরের ভিতর। চ্য-থেইন্‌ও এসে পড়েছিলো। সেও বারান্দায় আসেনি, ঘরের ভিতর বসেছিল মা-খিন-স আর মা-লা-লার সঙ্গে।

খানিকক্ষণ সাধারণ দু-চার কথার পর মিমি হঠাৎ বললো, "দেখ, দিলওয়ার আমার বড়ো ভাই, তবু আমি তোমায় বলছি, ওর সঙ্গে বেশী মেলামেশা কোরো না। ও সংসারের কাউকে বিশ্বাস করে না, কাউকে বন্ধু বা আপন বলে মানে না। কারো সঙ্গে যখন ও বেশী মাখামাখি করে তখন ধরে নিতে হয় যে ও কোনো স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তার সঙ্গে অন্তরঙ্গতা দেখাচ্ছে। ও লোক ভালো নয়।"

খানিকটা যে আমিও বুঝিনি তা নয়, তবু বললাম, "আমাকে দিয়ে ও আর কি স্বার্থসিদ্ধি করবে? আমার সঙ্গে খুব বেশী দেখা হয় না।"

সেদিন মিমির কাছ থেকে ওদের পরিবারের সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনলাম, রেঙ্গুনে যে সব মোগল এসে বসতি করেছিলো গত শতাব্দীর মাঝামাঝি, তাদের বংশধরদের অনেকের অবস্থা খুব খারাপ। অনেকে জেরবাদীদের মধ্যে বিয়ে থা করে তাদের মধ্যে মিশে গেছে। বাহাদুর শার নিজের বংশধরদের মধ্যে মেয়েদের প্রায়ই বিয়ে হয়ে গেছে বড়ো বড়ো ঘরে, এক প্রপৌত্রীর বিয়ে হয়েছে লক্ষ্ণৌর নবাববংশে, কিন্তু পুরুষদের অবস্থা ভালো নয়, সরকারের কাছ থেকে যে মাসোহারা পায়, তাতে অনেক কষ্টে চলে। রোজগার করবার কোনো প্রচেষ্টা নেই, চাকরি করা বা ব্যবসা করার কথা ভাবতেও চায় না, তাতে নাকি বংশমর্যাদায় বাধে। যাদের নিজের বাড়ি জমিজমা আছে, তাদের কিছুকিছু উপরি রোজগার আছে, তা নইলে বেশির ভাগ লোকেরই সরকারী মাসোহারাই সম্বল। লেখাপড়ার চর্চা নেই, পরিবর্তিত যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শান্ত জীবন যাপন করার প্রচেষ্টা নেই, কিন্তু সাবেককালের খানদানী বদ অভ্যেসগুলো সবই আছে।

তাদের মধ্যে একটু অন্যরকম ছিলো মীর্জা উসমান আলী, দিলওয়ার আর মিমির বাবা। নিজের চেষ্টায় কিছু লেখাপড়া শিখেছিলেন, মেলামেশাও করতেন শিক্ষিত সমাজের সঙ্গে, অশিক্ষিত সমাজের স্বার্থান্বেষী মোসায়েবদের এড়িয়ে চলতেন। খুব ধর্মভীরু

লোক ছিলেন, একটির বেশী বিয়ে করেন নি। খুব ভালোবাসতেন নিজের স্ত্রীকে। মিমি যখন বেশ ছোটো তখন ওর মা মারা যান। মীর্জা উসমান আলী অনেক পয়সা খরচা করে স্ত্রীর কবরের উপর একটি ছোট্টো সুন্দর মখবরা তৈরী করিয়ে দেন। নিজে রোজগারও করতেন ভালো। চালের এবং কাপড়ের ব্যবসা করতেন এবং এজন্যে নিজের রিশতাদের মধ্যে সালাতিনদের মধ্যে সবাই তাঁকে একটু অবজ্ঞার চোখে দেখতো, যদিও সময়ে অসময়ে এসে টাকা ধার চাইতে তাদের বাধতো না, শহরে দু তিনখানা বাড়িও করেছিলো।

মীর্জা উসমান আলীর তিন ছেলে। তাদের মধ্যে দিলওয়ার বক্স্ মেজো, সবার ছোটো লুৎফু-উন্-নিসা, আমাদের মিমি। স্ত্রী মারা যাওয়ার পর মীর্জা উসমান আলী আর দার পরিগ্রহণ করেনি, নিজের হাতে ছেলেমেয়েদের মানুষ করেছে। ছেলেমেয়েদের যত্ন করে লেখাপড়া শেখাবার চেষ্টা করেছিলো, ছেলেদের পড়তে দিয়েছিলো সেণ্ট পল্স্এ, মেয়েকে কনভেণ্টে। মেয়েকে পড়তে দিয়েছিলো বলে আলোড়ন উঠেছিলো আত্মীয়মহলে, কিন্তু তাদের কথা মীর্জা সায়েব কানে তোলেনি, দিলওয়ার টেন্থ্ স্ট্যাণ্ডার্ড পর্যন্ত উঠে পড়া ছেড়ে দেয়। অন্য ছেলে দুজনও বেশী পড়াশুনো করেনি। ভায়েদের মধ্যে দিলওয়ারই ছিলো সব চাইতে বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ। বড়ো ছেলে করিমবক্স্ মিশনারি স্কুলে পড়ে একটু খৃষ্টান ঘেঁষা হয়ে পড়েছিলো, বিয়ে করেছিলো এক এ্যাংলো-বার্মিজ মেয়েকে। ছোটো ছেলে নাজির হুসেন একটু বোকা। সে সব সময় নিজের ইয়ার বন্ধু আর মদের বোতল নিয়েই ছিলো। মীর্জা উসমান আলী বড়ো ছেলেকেই ভালোবাসতো খুব, তাকে আস্তে আস্তে নিজের ব্যবসার মধ্যে লিপ্ত করেছিলো। দিলওয়ারকে মীর্জা সাহেব খুব পছন্দ করতো না।

উসমান আলী মীর্জা যদ্দিন কর্মক্ষম ছিলো তদ্দিন সংসারে কোনো ঝামেলা গণ্ডগোল ছিলো না, মিমিও ছিলো পরম শান্তিতে। সে

হাইস্কুল ফাইন্যাল পাশ করলে পরে তাকে কলেজে পড়তে দেওয়া হবে এমন একটা ইচ্ছেও ছিলো মীর্জা সায়েবের মনে।

কিন্তু মানুষ যা ভাবে, তা তো হয় না। চোখে ছানি পড়ে প্রায় অন্ধ হয়ে পড়লো মীর্জা সায়েব। তার উপর বাত, পঙ্গু হয়ে তাকে শয্যাশায়ী হতে হলো। মিমির আর পড়াশুনো হোলো না। দিলওয়ারের প্রবল আপত্তি তাকে বেশী পড়তে দেওয়ায়। তা ছাড়া অসুস্থ বাবাকেও দেখাশোনা করতে হয়। দিলওয়ার ওর বিয়ে দিয়ে দিতে চেয়েছিলো। কিন্তু মিমি পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দিলো, যদ্দিন বাপ বেঁচে আছে তদ্দিন সে বিয়ে করতে পারবে না। সে একটা কঠিন মেয়ে, তাকে দিলওয়ার বেশী ঘাঁটালো না।

সে পড়লো অন্য ভায়েদের নিয়ে।

বড়ো ভাই করিম বক্স বাপের সঙ্গে ব্যবসা দেখাশোনা করতো বটে, কিন্তু সে ছিলো সোজা প্রকৃতির লোক। সংসারের প্যাঁচ কূটনীতি বেশী বুঝতো না। দিলওয়ার নানারকম চক্রান্ত করে তাকে এক জালিয়াতির মামলায় ফাঁসিয়ে দিলো। অনেক চেষ্টা করেও তাকে বাঁচানো গেল না। তার জেল হোলো। জেলে গিয়ে সে বেশীদিন বাঁচলো না; রক্ত আমাশা হয়ে জেলের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়।

করিম বক্সকে সরানোর পর দিলওয়ার লাগলো ছোটো ভাই নাজির হুসেনের পেছনে। সে ভীরু প্রকৃতির লোক, তার পেছনে গুণ্ডা লাগিয়ে, তাকে এমন ভাবে নাজেহাল করা হোলো যে, শেষ পর্যন্ত সে রেঙ্গুন ছেড়ে পালিয়ে গেল আকিয়াবে।

সম্পত্তি এবং ব্যবসা, সবটা চলে এলো দিলওয়ার বক্স্-এর কবজায়।

শুনতে শুনতে আমার মনে হোলো কেউ যেন আমায় ইতিহাসের পুরোনো পাতা থেকে পড়িয়ে শোনাচ্ছে।

"তোমায় এত সব কথা বলতে পেরে আজ আমার মন একটু

হাল্কা হোলো", মিমি বললো আস্তে আস্তে, "কাকেই বা বলবো। বাড়িতে দুই ভাবী নিজেদের ঝগড়া নিয়ে নিজেরা আছে। দিলওয়ার আছে তার কাজ নিয়ে। রিশতাদের বাড়ি আমি যাই না। বাড়িতে বাবার কাছেই থাকি সব সময়। মাঝে মাঝে স্কুলের বন্ধুরা এসে নিয়ে যায় ওদের বাড়ি। আমায় তো একা বেরোতে দেওয়া হয় না।"

সে সময় আমার কলেজে-পড়া বয়েস, ভাবপ্রবণ হয়ে উঠতে বেশীক্ষণ লাগে না। হঠাৎ খুব আপন মনে হোলো মিমিকে। আস্তে আস্তে বললাম, "মিমি, তুমি আমার বন্ধু হবে?"

মিমি তার বড় বড় চোখ দুটো তুলে তাকালো আমার দিকে। উত্তর দিলো, "তোমায় খুব বন্ধু মনে করি বলেই তো তোমায় এত কথা বললাম। তোমায় প্রথম দিন থেকেই আমার খুব ভালো লেগেছিলো। তাই তো তোমায় খবর দিয়ে দিয়ে ডাকিয়ে আনতাম তোমার সঙ্গে বসে গল্প করবার জন্যে। জানো, স্কুলের বন্ধু আমার কয়েকজন আছে, ওরা খুব ভালোবাসে আমায়, কিন্তু ওদের তো সব কথা বলা যায় না। ওরা বিদেশী, কিই বা বুঝবে আমাদের কথা। ওদের বাড়িতে ইণ্ডিয়ান যাদের যাদের সঙ্গে চেনা হয়েছে ওদেরও ধরণ ধারণ বিদেশীদের মতো। তাদের ভালো লাগতো না, ওরা যে ভাবে আমার দিকে তাকাতো তাও ভালো লাগতো না। তোমায় প্রথম দেখে আমার নিজের দেশের লোক মনে হয়েছিলো। তুমি দুষ্টুমি করে আমায় কুর্নিস করলে, কি জানি কেন হঠাৎ আমার সারা শরীর শিউরে উঠেছিলো।"

চায়ের সময় অন্য সবাই এসে যোগ দিলো আমাদের সঙ্গে, খানিকক্ষণ গল্পসল্প করবার পর, মিমি ভেতরে চলে গেল।

চ্য-থেইন হেসে বললো, "রয়, কলেজে তো তোমায় খুব গুডি-গুডি ভালোমানুষ মনে করতাম।"

"ও যে ভালোমানুষ নয় এখন সে কথা ভাবছো কেন?" জিজ্ঞেস করলো মা-লা-লা।"

"মিমি ওকে যে রকম পছন্দ করে—,"

"মিমি পছন্দ করলে বুঝি কেউ ভালোমানুষ হতে পারে না," বলে উঠলো মা-খিন-স।

"এর আগে আর কেউ তো—"

"দেখ, বাজে বোকো না," বললো মা-লা-লা, "আগে যাদের দেখেছো ওদের সঙ্গে রয়ের অনেক তফাত। ওরা মিমির বয়-ফ্রেণ্ড হতে চেয়েছিলো। কিন্তু মিমি বয়-ফ্রেণ্ড চায় না। ও শুধু বন্ধু চায়। রয় আর ও খুব বন্ধু হয়ে গেছে। ওদের ঘাঁটিও না।"

মিমি যখন ফিরে এলো তাকে দেখে আমি একটু অবাক হলাম। এতক্ষণ সে ছিলো বার্মিজ পোশাকে সে পোশাক পাল্টে ফেলেছে। এখন পরেছে রেশমী গারারা আর কুর্তি, কাঁধের উপর শিফনের দুপাট্টা।

"এ পোশাক কোত্থেকে এলো?"

"একটি স্যুটকেস সঙ্গে ছিলো দেখনি?"

"কোথাও যাচ্ছো?"

"হ্যাঁ, বেরুতে হবে আমায়। চলো, তুমিও সঙ্গে যাবে। তারপর আবার ফিরে আসবো এখানে। তখন মা-খিন-স আমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে।

ঘোড়ার গাড়ি ডেকে আনা হয়েছিলো ইতিমধ্যে। মিমির পেছন পেছন গাড়িতে উঠে বসলাম। আহ্‌লোন্‌ একেবারে বার্মিজ অঞ্চল, রাস্তার দুপাশে কাঠের আর বাঁশের বেড়ার সব ছবির মতন বাড়ি। কিছুক্ষণের মধ্যে আহ্‌লোন ছাড়িয়ে এসে চায়না স্ট্রীটে পড়লাম। তারপর গাড়ি চললো উত্তর মুখে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম অনেক উত্তরে শোয়ে ড্যাগন প্যাগোডার সিংহদ্বার।

তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। জ্বলে উঠেছে রাস্তার আলো। পথের দুধারে নানাজাতির জনতা,—বার্মিজ, চিনে, ভারতীয়। ঠুন ঠুন করে বেল বাজিয়ে ট্রাম চলে যাচ্ছে রাস্তার মাঝখান দিয়ে।

আনমনা ছিলাম অনেকক্ষণ। অনেকটা পথ গিয়ে গাড়ি যখন থামলো, তখন তাকিয়ে দেখি বর্মী অঞ্চলের একটি নিস্তব্ধ সরু পথ। সে পথের নাম আজ এত বছর পরে মনে নেই, বোধ হয় জফর রোড। এখানে আগে কোনো দিন আসিনি।

সামনে একটি জীর্ণ সমাধি মন্দির, সাধারণ আর দশটা পীরের দরগার মতো দেখতে।

আমি আগে নামলাম গাড়ি থেকে। আমার পেছন পেছন মিমিও নেমে এলো।

আমার কেমন যেন একটা সন্দেহ হচ্ছিলো। এখানে কোনদিন আসিনি, কিন্তু এর সম্বন্ধে শুনেছি অনেক। জিজ্ঞেস করলাম মিমিকে।

সে একটু হেসে বললো, "হ্যাঁ, এটাই বাদশাহ বাহাদুর শার মখবরা। এখানেই শুয়ে আছেন সম্রাট-কবি জফর। জানো, বাহাদুর শা জফর একটা সুন্দর শের লিখেছিলেন,—

হৈ কিতনা বদ-নসীব জফর
দফন্ কে লিয়ে
দো গজ জমীন ভি ন মিলী
কুএ য়ার মে।

জফর কতো দুর্ভাগা যে তার সমাধির জন্যে বন্ধুর সড়কে দু'গজ জমিও পাওয়া যায় নি।—ওঁর কবরের দিকে তাকিয়ে আমার যখনই এই শের মনে পড়ে, তখনই আমার চোখে জল আসে। তৈমুর বংশের সবাই নিজের দেশে মাটি পেয়েছে, এই হতভাগ্য বাহাদুর শাকে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে এই সুদূর বিদেশে।"

কিছুক্ষণ চুপ করে ছিলাম। ভারতের শেষ মোগল সম্রাটের অবজ্ঞাত জীর্ণ সমাধির সামনে তারই বংশের একটি মেয়ের পাশে দাঁড়িয়ে অভিভূত না হয়ে পারলাম না।

আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি আমায় আবার এখানে নিয়ে এলে কেন?"

"আজ বৃহস্পতিবার," মিমি উত্তর দিলো, "প্রত্যেক বৃহস্পতিবার আমি এখানে আসি।"

কেন, সে কথা জিজ্ঞেস করলাম না। ভাবলাম, বলবার যদি হয় তো মিমি নিজেই বলবে।

নিজেই বললো মিমি। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেবেলা এখানে কবর জিয়ারত করতে আসে মোগল কন্যা লুৎফ-উন-নিসা। মৃত্যুর আগে বাহাদুর শা নাকি বলে গিয়েছিলো হিন্দুস্তানের আজাদীর প্রথম লড়াই শুরু হবে এই বর্মা মুলুকে। যদ্দিন সে সময় না আসে, তদ্দিন প্রত্যেক বৃহস্পতিবার রাত্তিরে এ বংশের কোনো না কোনো মেয়েকে কবর জিয়ারত করতে হয়, আর আরজি জানাতে হয় খোদাতালার কাছে যেন আবার আজাদ হয় হিন্দুস্তান, ফিরিঙ্গী যেন চলে যায় আমাদের দেশ থেকে। যেদিন দিল্লীর লাল্ কেল্লায় আবার কায়েম হবে আমাদের আপনার রিয়াসত, সেদিন যেন তার বংশধরেরা ভুলে যায় তাদের শিরায় তৈমুর বংশের রক্ত বইছে। সেদিন ওরা যেন হিন্দুস্তানের অন্য সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাধীন হিন্দুস্তানী হয়ে মিশে যায়, সেদিন যেন এরা ফিরে যায় হিন্দুস্তানে।

"কিন্তু সে যদ্দিন না হয়," মিমি বললো আমায়, "তদ্দিন যেন আমরা ভুলে না যাই যে আমরা মোগল সম্রাটের বংশধর। সেদিন পর্যন্ত হিন্দুস্তানে ফিরে যাওয়া আমাদের মানা। সেদিন পর্যন্ত এদেশে আমাদের নির্বাসন।—কিন্তু জানো সলিল, আমাদের অন্য সবাই বাহাদুর শাকে ভুলে গেছে। মনে রেখেছে শুধু খানদানী আর শাহী কায়দার স্মৃতিটুকু। তাদেরই বা কি করে দোষ দিই? আজ হিন্দুস্তানও বাহাদুর শাকে ভুলে গেছে। কিন্তু আমি পারিনি। এ দায়িত্ব আমার উপর এসে পড়েছে। আমার শুধু একটি আশা,—যেদিন এদেশে হিন্দুস্তানের আজাদীর লড়াই শুরু হবে, তাতে যোগ দেবো।"

রুপোর প্রদীপ জ্বালিয়ে অস্ফুট প্রার্থনা শুরু করলো মিমি। আমার চোখ ঝাপসা হয়ে এলো সন্ধ্যার কুহেলীতে।

ফেরার পথে মিমি আমার হাত ধরে ওর পাশে বসালো। তারপর বললো, "জানো সলিল, জানিনা কেন তোমায় আজ অনেক কথা বললাম। জীবনে এই প্রথম আমি কারো কাছে মন খুলে কথা বলতে পারছি। কারো সঙ্গে কোনোদিন অন্তরঙ্গ হইনি। আজ প্রথম তোমার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতালুম। কি জানি কেন, মন হাল্কা করে আজ বড় ভালো লাগছে।"

আমার বুক দুলে উঠলো। ভূমিকম্পের সাড়া জাগলো মনের সিস্‌মোগ্রাফে। কানের কাছে প্রসাধনস্নিগ্ধ একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো।

খুব আস্তে আস্তে কবি বাহাদুর শার রচনা একটি শের আবৃত্তি করলো সে,—

উমড়ে দরাজ মাংকে
লায়েথে চার রোজ,
দো আরজু মে কট গয়ে,
দো ইন্তেজারমে।

চারদিনের লম্বা আয়ু আমি চেয়ে এনেছিলাম। দুটোদিন কামনা করে কেটে গেছে, আর দুটো দিন প্রতীক্ষায়।

আমি তার দিকে ফিরে তাকালাম। দেখলাম তার দুটো চোখ ছলছল করছে। গাড়ির জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো মোগল নন্দিনী।

তিন চারদিন পর একদিন স্কটমার্কেটে গিয়েছিলাম কিছু সওদা করতে, হঠাৎ দিলওয়ারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

"সলিল, তোমার কথা ভাবছিলাম। চলো, কোথাও বসে চা খাই।"

যখনই ওর সঙ্গে দেখা হয় তখনই কোথাও বসে চা খাওয়ার আমন্ত্রণ। বললাম, "আজ নয়, অনেক কিছু কেনাকাটা করতে হবে, তারপর বাড়ি ফিরতে হবে তাড়াতাড়ি।"

"এসোই না দশ পনেরো মিনিটের জন্যে।"

"আজ নয় দিলওয়ার, আরেকদিন।"

"একদিন আমার বাড়ি এসো।"

"আচ্ছা আসবো।"

"কবে আসবে?"

"আসবো একদিন সময় করে।"

"কবে আসবে বলো, আমি তো সব সময় বাড়ি থাকি না।"

একটু ভেবে বললাম, "আচ্ছা, শনিবার দিন আসবো।"

"শনিবার?" দিলওয়ারের ভুরু কুঁচকে গেল, "না, শনিবার নয়। শনিবার রেস। ঠিক আছে, তুমি এসো একটু সকাল করে, এক সঙ্গে রেসে যাবো।"

শঙ্কিত হলাম দিলওয়ারের কথা শুনে।

"না ভাই, আমি রেসে যেতে পারবো না। বরং সোমবার দিন আসবো।"

"সোমবার? বড্ড দেরী হয়ে যায় তাহলে।"

"শুক্রবার?"

"হ্যাঁ, শুক্রবার ঠিক আছে। শুক্রবার বিকেলবেলা এসো।"

কিন্তু যাওয়ার কথা দিয়েও দিলওয়ারকে কাটানো গেল না। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে লাগলো।

"অমিয়র কোনো খবর রাখো?"

"না, ওর সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয়নি।"

"মা-য়িন-ম্যার সঙ্গেও দেখা করতে যাওনি তুমি?"

"না।"

"একদিনও না?"

"না, শিরীনেরা চলে যাওয়ার পরে মা-য়িন-ম্যার সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।"

"শিরীনের কথা তোমার এখনো মনে আছে?" দিলওয়ার এক গাল হাসলো।

আমি ভাবলাম, কেন মনে থাকবে না। এই তো মাত্র কয়েক মাসের কথা।

জিজ্ঞেস করলাম, "কেন জমিলার কথা তোমার মনে নেই।"

"একটুও না", নিরাসক্তভাবে বললো দিলওয়ার "জীবনে কতো জমিলা আসে, কতো জমিলা যায়, কজনের কথা মনে রাখি বলো ?"

খুব ভালো কথা, আমি মনে মনে বললাম।

সে বলে গেল, "মা-য়িন-ম্যার সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হয়। সব সময় জিজ্ঞেস করে তোমার কথা। চলো না একদিন। আজই চলো না। কী এমন কাজ তোমার ?"

"আজ নয়।"

"কবে যাবে বলো।"

"যাওয়া যাবে একদিন," দিলওয়ারকে এক রকম এড়াবার জন্যেই বললাম।

"শুক্রবার যখন আসবে, তখন যাওয়া যাবে, কি বলো ?"

মনে মনে শুক্রবার দিন যাওয়ার সংকল্প পরিত্যাগ করলাম।

"অমিয়র কোনো খবর জানো ?" জিজ্ঞেস করলো দিলওয়ার।

"কিচ্ছু না, মা-য়িন-ম্যার সঙ্গে আছে যখন, ভালোই আছে নিশ্চয়ই।"

দিলওয়ার একটুখানি তাকিয়ে রইলো আমার দিকে, তারপর বললো, "দুনিয়া সম্বন্ধে তোমার জ্ঞান খুব কম। ও মা-য়িন-ম্যার ওখানে ভালো নেই।"

"কে বললে ?"

"কি করে ভালো থাকবে বলো ? যেখানে ওর নিজের কিছু করবার নেই, মা-য়িন-ম্যার কথায় উঠতে বসতে হয়, সেখানে তো ভালো থাকা সম্ভব নয়। ওর চাইতে পোষা কুকুর হয়ে জন্মানো অনেক ভালো।"

বলতে বলতে দিলওয়ার হেসে ফেললো। "কি করে যে ওই ভাবে একজন লোক থাকতে পারে বুঝিনা। মা-য়িন-ম্যা যে ওর

যত্ন করে না তা নয়, ওর খাওয়া-পরা সুবিধে-অসুবিধের উপর ওর খুব নজর। কিন্তু, ও বেরুবার সময় কোন্ জামা পরে বেরোবে, আদৌ বেরোবে কিনা, বেরোলে কখন বেরোবে, কখন ফিরবে সবকিছু বলে দেয় মা-য়িন-ম্যা। ভালোবাসা যখন গোলামীতে গিয়ে দাঁড়ায় তখন আর ভালোবাসা বলতে কিছু থাকেনা।"

"অমিয়র যদি ভালো লাগে তো আমাদের কার কি বলবার আছে? ওর ভালো না লাগলে ও নিজেই চলে আসবে।"

"না ভাই, সে জোর ওর নেই। ওই জোর দেখাতে গেলে যে হিম্মত থাকতে হয়, সে হিম্মত অমিয়র নেই। সে থাকলে ওর এই বরাত? এত ভালো গাইয়ে, কিন্তু পজুনডওঙের বার্মিজ কোয়ার্টারে পচে মরছে?"

বলতে বলতে একটু চুপ করে গেল দিলওয়ার। কি যেন ভাবলো, তারপর বললো, "তবে চিরকাল অমিয় এরকম থাকবে না, একদিন সে ঠিক ওসব কাটিয়ে বেরিয়ে আসবে। হাজার হোক সে আর্টিস্ট। সত্যিকারের আর্টিস্ট নিজেকে মরতে দিতে পারে না। আমি দিলওয়ার বক্‌স্ বলে যাচ্ছি, তুমি দেখে নিও।"

কথা সহজে থামবে বলে মনে হোলো না। আমি চলে যাচ্ছিলাম। দিলওয়ারও পা বাড়ালো। দু-পা এগিয়ে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো।

"সলিল!"

"কি?"

"শোনো।"

আমি কয়েক পা ফিরে এলাম।

"সেদিন সন্ধ্যেবেলা কো-চ্য-থেইনের সঙ্গে কোন্ সিনেমা দেখলে?"

আমাকে একটু ভাবতে হোলো।

"সিনেমা? কবে? ও হ্যাঁ, একসেলশায়ারে দি গ্রেট ডিকটেটার এসেছে, সেটাই দেখতে গিয়েছিলাম।"

দিলওয়ার অট্টহাস্য করলো। "কেমন লেগেছে?"

"ভালো।"

সে চলে গেল।

কয়েকদিন পর চ্য-থেইনদের বাড়ি মিমির সঙ্গে দেখা হতে সে হাসতে হাসতে আমায় বললো, "জানো, সেদিন চায়না-স্ট্রীটে বড়ো ভাইসায়েব আমাকে আর তোমাকে গাড়িতে যেতে দেখেছে।"

"তাই নাকি!" মনে মনে শঙ্কিত হলাম, দিলওয়ারকে অম্লান বদনে মিছে কথা বলেছি সেদিন যে, একসেলশায়ারে দি গ্রেট ডিক্‌টেটার দেখতে গিয়েছিলাম। "কিছু বলেছে?"

"না, কি আবার বলবে? শুধু জিজ্ঞেস করলো, কোথায় যাচ্ছিলাম। বললাম—কবর জিয়ারত করতে যাচ্ছিলাম। তুমি বাদশার মখবরা কোনোদিন দেখনি বলে তোমার সঙ্গে গিয়েছিলাম।"

"কিছু বললো না তারপর?"

"না। শুধু বললে, সলিল খুব ভালো ছেলে।—মানে, তুমি যে অন্য লোকের সঙ্গে গাড়ি করে কোথাও যাবে সেটা আমি পছন্দ করি না, তবে সলিল ছিলো বলে আমার কিছু বলার নেই।"

আমার পুরুষত্বের গর্ব একটু আহত হোলো। বললাম, "আমার সঙ্গেই বা বেরোনোর কি দরকার। সেদিন আমায় সঙ্গে না নিলেই পারতে।"

মিমি হেসে ফেললো। "পরে ভাই সায়েব আরেকটি মজার কথা বলেছে। তুমি নাকি সেই ধরণের লোক যারা মেয়েদের ভাইয়া-জী হবার জন্যে জন্মায়। তোমার দ্বারা আর কিছু হবে না। তা নইলে নাকি মা-য়িন-ম্যাকে দিনরাত সবার কাছে তোমার কুশল জিজ্ঞেস করতে হোতো না।"

"তুমি মা-য়িন-ম্যাকে চেনো?"

"ভাই সায়েবের কাছে শুনেছি," বলে একটু চুপ করে রইলো

মিমি। তারপর বললো, "আরেকজনের কথাও খুব শুনেছি। সে তোমাদের গাইয়ে সেই অমিয় গাঙ্গুলী। ওকে আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে। ভাই সায়েবকে বলেছিলাম, ওকে একদিন বাড়িতে ডাকো। গান শুনবো। এদেশে তো ভালো হিন্দুস্তানী সঙ্গীত শোনা যায় না। ভাই সায়েব বললো, ও বাজে লোক, ওকে বাড়িতে ডাকা যায় না। শুনেছি সেই জেরবাদী মেয়েটা নাকি ওকে গোলাম করে রেখেছে। তা-নইলে ও হিন্দুস্তানে গিয়ে খুব নাম করতে পারতো।"

আমি খানিকক্ষণ তাকিয়ে দেখলাম মিমিকে। তারপর হঠাৎ আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল, "আচ্ছা মিমি, তুমি কোনোদিন কারো ভালোবাসা পাওনি। না?"

মিমি বোধ হয় আমার প্রশ্নে একটু অবাক হোলো। একটু ভাবলো। তারপর বললো, "দেখ সলিল, আমাকে অনেকে চেয়েছে, আমার জন্যে দুঃখ পেয়েছে। তারা দুঃখ পেয়েছে বলে আমিও দুঃখ পেয়েছি। কিন্তু আমার কিছু করবার নেই। আমি এমন একটা পরিবারের মেয়ে, যেখানে আমার কিছু করবার নেই। ভাই সায়েব যা বলে তাই হবে। আমি একটু কড়া মেয়ে, কিছু অপছন্দ হলে বড় জোর জোরগলায় প্রতিবাদ জানাতে পারি, কিন্তু নিজের ইচ্ছায় কিছু করবার স্বাধীনতা আমার নেই। না পারলাম পড়াশুনা করতে, না পারবো নিজের চেষ্টায় কোনো রোজগার করতে, না পারবো নিজের ইচ্ছেয় বিয়ে করতে। কারণ আমি খানদানী ঘরের মেয়ে, আর আমার খানদানী শাহী-খানদানী। অবস্থা আর দশটা সাধারণ পরিবারের মতো, কিন্তু পায়ে খানদানীর জিন্‌জির। কবে কোন এক জমানায় আমার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা হিন্দুস্তানের বাদশাহ ছিলো, তাই আমায় সারা জিন্দগী কোনো এক খানদানী খসমের গোলাম হয়ে থাকতে হবে।"

"তুমি ইচ্ছে করলে এই অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারো।"

"না ভাই, পারি না। আমি একলা কি করবো। যদি জমানা

বদলে যায় তো আর দশজন মেয়ের মতো আমারও আজাদী হবে, তা নইলে নয়। দেখ, যদি হিন্দুস্তানে কোথাও পর্দানশীন হয়ে থাকতাম তো এতটা বুঝতে পারতাম না। কিন্তু এ দেশে জন্মে, বড়ো হয়ে, এখানকার মেয়েদের আজাদী দেখে আমার অবস্থা খুব ভালো করে বুঝতে পারছি।"

অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো মিমি, আমি উঠে আসবার একটু আগে বললো, "জানিনা, হয়তো আমি একলাই এই জিন্‌জির ভাঙতে পারবো। এখনো আমার মনে অতো জোর নেই। কে জানে, হয়তো একদিন জোর পেয়ে যাবো।"

আজ মনে পড়ে, সেটা উনিশ শো এক চল্লিশ সাল। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শান্ত জীবন হঠাৎ অশান্ত হয়ে উঠেছে। ভাগ্যের পায়ে কেউ আর অসহায় ভাবে মাথা নত করতে রাজী নয়। সবাই কি রকম যেন অনুভব করতে শুরু করেছে যে ইতিহাস মোড় নিয়েছে নতুন পথে। একজনের জীবন যে আরেকজনের নির্দেশে চলবে, সে আর হতে দেওয়া যাবে না—ইউরোপের ডিক্টেটার শাসিত দেশগুলোতে নয়, প্রাচ্যের ইউরোপীয় উপনিবেশগুলোতে নয়, দিলওয়ার বক্‌স্‌এর ছোটো পরিবারেও নয়।

ইউরোপে তখন খুব জোর যুদ্ধ চলছে। রাশিয়ার ভেতর অনেকটা এগিয়ে গেছে জার্মান বাহিনী। সুদূর প্রাচ্যে শোনা যাচ্ছে জাপানের অসি ঝনঝনা।

সেপ্টেম্বরের প্রথম দিকে এক শনিবার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হোলো ইউনিভার্সিটি কলেজের ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ানের সোশিয়্যাল। ইউ-নিভার্সিটি কলেজের এ্যাসেম্ব্লি হল অতিথিতে জমজমাট। বিশিষ্ট অতিথি হয়ে এসেছেন ইউনিভার্সিটির চ্যান্সলার উ-টিন-টুট্ এবং ব্রহ্মের ভারতীয় এজেন্ট জেনারেল মিস্টার হাচিংস্। ভারতীয় ছাত্র সদস্যদের সঙ্গে গেস্ট্ হয়ে এসেছে কলেজের অন্যান্য সম্প্রদায়ের ছাত্র-ছাত্রীরা, —বার্মিজ, চাইনীজ, সিনো বার্ম্যান, এ্যাংলো বার্ম্যান, আরাকানিজ, শান, ক্যারেন। মিমি ইউনিভার্সিটির বিভিন্ন সোশিয়্যালে মা-লা-লাদের সঙ্গে আসতো। এবার আমার গেষ্ট হয়ে এলো চ্য-থেইন্, মা-খিন-স, মা-লা-লাদের সঙ্গে। ওকে আগে কোনোদিন শাড়িতে দেখিনি। সেদিন সন্ধ্যায় কালো বেনারসী শাড়িতে অপরূপ দেখাচ্ছিলো তাকে।

চারিদিকে অসংখ্য টেবিল, চায়ের সরঞ্জামে সাজানো। প্রত্যেকটি টেবিল ঘিরে চারটি ছটি করে চেয়ার। একটিতে বসলাম আমরা কজন, চ্য-থেইন, মং-জ্যি, মা-লা-লা, মা-খিন-স, মিমি আর আমি। পাশেই আরেকটি টেবিলে ছিলো রোজমারী মেহতা, পেগি আরভিন, ওর ভাই বার্টি, লুসি হান, অর্জুন শ্রীবাস্তব আর আরেকজন কে যেন। চায়ের সঙ্গে সঙ্গে স্টেজ্‌এর স্ক্রীন সরে গেল, শুরু হোলো সঙ্গীতা-নুষ্ঠান। অর্জুন শ্রীবাস্তব ওধারের টেবিল থেকে আমায় ডেকে বললো, "জানো রয়, আজকে কে গাইছে? তোমার বন্ধু অমিয় গাঙ্গুলী।"

অমিয়কে ইউনিভার্সিটিতে গান গাইতে ডেকে আনা হয়েছে! শুনে আমি অবাক হলাম। শুনলাম, ইউনিয়ানের কমিটি এবার

খোঁজ করছিলো বিশুদ্ধ ভারতীয় রাগ সঙ্গীত শোনানোর জন্যে কাকে ডাকা যায়। বালাজী রাওএর ভাই কমিটিতে আছে। সে অমিয় গাঙ্গুলীর নাম করলো। তখন আমন্ত্রণ জানানো হোলো তাকে।

"সে কি গাইবে?" আমি জিজ্ঞেস করলাম আরেকটি টেবিলের ডোরাই সোয়ামী নামে একটি ছেলেকে।

"খেয়াল গাইবে, ঠুম্‌রী গাইবে।"

"সর্বনাশ! খেয়াল গাইবে?" বলে উঠলো পেছনের টেবিলের অলোক সেন নামে একটি বাঙালী ছেলে, "অল্ ছ্যাট আ-আ-আ বিজনেস? গেস্টরা সবাই উঠে পালাবে যে!"

শুনে আমিও শঙ্কিত হলাম। এই পরিবেশে খেয়ালের কি তারিফ হবে সে আমি জানতাম। সোশিয়্যাল হোলো একটি সন্ধ্যা সবাই মিলে হৈ হৈ করবার জন্যে। বেশ ধৈর্য ধরে গান শোনবার মতো মেজাজ কারো নয়। তার উপর অভ্যাগতদের অর্ধেকেরও বেশী বিদেশী, ভারতীয় ছাত্রদেরও বেশির ভাগ বিদেশীদের চাইতেও বিদেশী। গান গাইতে যাদের ডেকে আনা হয় তারা প্রায় গায় হাল্কা গান, অনেক সময় চলতি জনপ্রিয় সিনেমার গান। গানের সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতারাও পায়ে তাল দেয়, সবার হাল্কা মেজাজের সঙ্গে চটুল গান বেশ একটা স্বরসঙ্গতি সৃষ্টি করে। অনেক সময় বিদেশী গানও গায় কোনো ভারতীয় ছাত্র কিংবা কোনো এদেশী শিল্পী। এ হেন ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ানের সোশিয়্যালে আর যাই চলুক খেয়াল ঠুম্‌রি চলবে বলে মনে হয় না।

বন্দে মাতরম দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হোলো, গাইলো কলেজের কয়েকজন ভারতীয় ছাত্র-ছাত্রী,—বাঙালী, মাদ্রাজী, পাঞ্জাবী। ভারতীয়, অভারতীয়, সবাই উঠে দাঁড়ালো গানের সময়। তারপর একজন মুসলমান ছেলে একটি হিন্দি ফিল্‌মের গান গাইলো। গানের শেষে খুব হাততালি দিলো সবাই। একজন মাদ্রাজী মেয়ের বেহালায় পাশ্চাত্য সুর শুনে সবাই বিমুগ্ধ হোলো। মাউথ্ অর্গ্যান বাজালো একজন আরাকানীজ ছেলে। কলকাতা থেকে একটি বাঙালী মেয়ে

নতুন এসেছে ইউনিভার্সিটিতে। সে একটি রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইলো। সবাই হাততালি দিলো তার মুখশ্রী দেখে।

তারপর সোশিয়্যাল সেক্রেটারির ঘোষণা শুনলাম,—এবার আপনাদের খেয়াল আর ঠুম্‌রি শোনাবেন মিস্টার ওমিও গ্যাংগোলি।

"খেয়াল! হোয়াট ইজ্ খেয়াল।" অভারতীয়রা জিজ্ঞেস করলো তাদের ভারতীয় বন্ধুদের।

সোশিয়্যাল সেক্রেটারি ভারতীয় রাগসঙ্গীতের একটা অনবদ্য ভূমিকা দিলো।—লেডিজ এ্যাণ্ড জেণ্টল্‌মেন, ইণ্ডিয়ান মিউজিকের ট্র্যাডিশন হাজার বছরের পুরোনো। দুনিয়ার অন্যান্য জায়গায় মিউজিক বলতে যখন বোঝাতো শুধু সুরে কবিতা পাঠ, ইণ্ডিয়ায় তখন সঙ্গীতের উচ্চাঙ্গ ব্যাকরণ সৃষ্টি হয়েছে। উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সঙ্গীতের দুটো ধারা,—যে গান গেয়ে সুরের ভেতর দিয়ে প্রকৃতির "ডিভাইন বিউটি"কে উপভোগ করা হয়, সেটা খেয়াল। আর রাজ-দরবারে "ডান্সিং গার্লদের" নাচের সঙ্গে মাইনে করা গাইয়েরা যে গান গাইতো সেটা ঠুম্‌রি।

ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে যাদের কিছু জ্ঞান আছে তারা এই ভাষণ শুনে একটু মুচ্‌কি হাসলো। মিমি আমার দিকে তাকালো, আমি তাকালাম মিমির দিকে।

তানপুরোতে সুর দিলো অমিয়। তবলা বাগিয়ে বসলো বালাজী রাও। তাদের পেছনে আলি মুহম্মদ বসেছে সারেঙ্গি নিয়ে।

অমিয়র মুদ্রাদোষ আছে অন্যান্য গাইয়েদের মতো। আমার ভাবনা হোলো, ওর হাতের ভঙ্গি দেখে বিদেশী শ্রোতারা হাসাহাসি না করে। মনে মনে রাগ হোলো ইণ্ডিয়ান ইউনিয়ানের কর্মকর্তাদের উপর। কি দরকার ছিলো এত বিদেশীর মধ্যে ভারতীয় রাগসঙ্গীতের ব্যবস্থা করবার? ওরা কী বুঝবে!

বাহারে গান ধরলো অমিয়। লক্ষ্য করলাম যে বিদেশীদের উপস্থিতি এবং বেশির ভাগ ভারতীয় শ্রোতাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত

সম্বন্ধে রসবোধের অভাব সম্বন্ধে সেও বেশ সচেতন। হাতের ভঙ্গি ও মুদ্রাদোষ সে যথাসম্ভব বর্জন করে চলেছে, সংযত রেখেছে নিজেকে, দ্রুত্ গানের চাইতে সুরের বিস্তার আর সরগমের উপর বেশী ঝোঁক দিয়েছে, এমন ভাবে গাইছে যাতে শ্রোতারা তার কলা কুশলতা উপলব্ধি করুক বা না করুক, তার সুরের বৈচিত্র সৃষ্টিতে যেন মুগ্ধ হয়। কিছু-ক্ষণের মধ্যেই তার গান দেশী বিদেশী সব শ্রোতাদের উপর একটা আশ্চর্য প্রভাব সৃষ্টি করলো। নিস্তব্ধ হয়ে সবাই শুনতে লাগলো তার গান। যখন সে শেষ করলো, তখন কারো মনেই হোলো না যে প্রায় আধ ঘণ্টা ধরে গেয়েছে। প্রাণভরে হাততালি দিলো সবাই। সব চাইতে বেশী হাততালি দিলাম আমি।

অমিয় তারপর ধরলো একটি ঠুম্‌রি। এটা যে ভারতীয়দের খুব ভালো লাগবে সে সম্বন্ধে আমার কোনো সন্দেহ ছিলো না। আশ্চর্য তবলা জমলো তার গানের সঙ্গে। গান শেষ হতে দর্শকেরা ছাড়লো না, এন্‌কোর এন্‌কোর করে চিৎকার করে তাকে আরেকটি গজল গাইয়ে ছাড়লো।

শ্রোতাদের মধ্যে কয়েকজন বড় বড় ভারতীয় অফিসার ছিলো, —বার্মার একাউন্ট্যান্ট্ জেনারেল, আবহাওয়া বিভাগের ডিরেক্টার, গভর্ণমেণ্টের একজন আই-সি-এস সেক্রেটারি, এরকম অনেকে। ওরা বলাবলি করছিলো, ইণ্ডিয়ার বাইরে এরকম সুন্দর "ইণ্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল" গান ওরা কোনোদিন শুনবে বলে আশা করতে পারেনি। বিদেশীরা বললো,—তোমাদের মিউজিক এত সুন্দর আমরা জানতামই না। আমাদের আরো শোনানোর ব্যবস্থা করো না কেন?

গর্বে ফুলে উঠলো ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের বুক। অনেকে বললো, —একজন লোক্যাল আর্টিস্টের গান শুনেই তোমরা হায়-হায় করছো, ইণ্ডিয়ার বড় বড় ওস্তাদদের গান শুনলে তোমরা কি না জানি করবে।

মিমি চুপ করে গুম হয়ে বসেছিলো, আস্তে আস্তে বললো, "ও

যদি আরো রেওয়াজ করে, হিন্দুস্তানে গিয়ে ও খুব নাম করতে পারবে। ও এদেশে পড়ে আছে কেন ?"

রোজমারী মেহতা আমায় ডেকে বললো, "ও তোমার ফ্রেণ্ড ? একদিন ওকে আমাদের বাড়ি নিয়ে আসতে চাই। তুমি ব্যবস্থা করে দেবে ?"

সঙ্গীতানুষ্ঠান শেষ হোলো। শুরু হোলো "গেমস্।" তাতে খুব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিলো ছোটো বড়ো সবাই, ভাইস চ্যান্সলার, প্রফেসারদের থেকে শুরু করে জুনিয়ার ছাত্রছাত্রী পর্যন্ত কেউ বাদ গেল না। অভ্যাগতেরা যে যার টেবিল ছেড়ে এ-টেবিল ও-টেবিল ঘুরে গল্প করতে লাগলো চেনাজানাদের সঙ্গে।

আমি আমার জায়গা ছেড়ে নড়িনি। চ্য-থেইন, মা-লা-লা, মা-খিন-স সবাই মিশে গেছে অন্য সবার ভিড়ে। শুধু আমি আর মিমি বসে গল্প করছিলাম। হঠাৎ দেখি ভিড়ের ভিতর পথ করে অমিয় এগিয়ে আসছে আমার দিকে।

"সলিল! তোমায় আমি খুঁজে বেড়াচ্ছি সব জায়গায়। আমি জানতাম তুমি এখানে থাকবেই। কি খবর ? এদ্দিন তোমার পাত্তা নেই কেন ? কয়েক মাস দেখা হয়নি তোমার সঙ্গে। মা-য়িন-ম্যা প্রায়ই জিজ্ঞেস করে তোমার কথা। সেও এসেছে আমার সঙ্গে। কিন্তু কোথায় বসেছে দেখতে পাচ্ছি না।"

কথা বলতে বলতে তার চোখ পড়লো মিমির উপর। বোধ হয় একটু অপ্রস্তুত বোধ করে সরে যাচ্ছিলো সে।

"আচ্ছা, আজ আসি, পরে দেখা হবে। একদিন এসো।"

কিন্তু আমি ছাড়লাম না। জোর করে ওকে বসালাম। তারপর আলাপ করিয়ে দিলাম মিমির সঙ্গে। বললাম, "এ আমার বন্ধু মিমি।"

মিমি তসলিম জানালো, বললো, আমার নাম লুৎফ-উন-নিসা। আপনার গান আমার খুব ভালো লেগেছে। আপনার কথা আমি আগে শুনেছি। কিন্তু গান শোনবার সৌভাগ্য আজ এই প্রথম হোলো।"

মিমি অমিয়র সঙ্গে কথা বললো মধুর উর্দুতে। অমিয় প্রথমটা হতভম্ব হয়ে গেল। কিন্তু আর্টিস্টের কানে তার গানের প্রশংসা মধুবর্ষণ করেছে, মুহূর্তের মধ্যে সে সামলে নিলো নিজেকে। সে নিজেও খুব ভালো উর্দু জানতো, শিখেছিলো তার মায়ের কাছে। সে আলাপ করতে শুরু করলো মিমির সঙ্গে।

আমি একবার বলতে গেলাম, এই মিমি আমাদের দিলওয়ারের বোন। কিন্তু সামলে নিলাম নিজেকে। ভাবলাম, বলে কি দরকার। দরকার হয়তো মিমি নিজেই বলবে।

কান পেতে শুনলাম ওদের কথাবার্তা। দেখলাম মিমিও দিল-ওয়ারের কথা একেবারেই তুললো না। হিন্দুস্তানের গাইয়েদের সম্বন্ধে, গান সম্বন্ধেই তাদের আলোচনা। আমি একটু অবাক হলাম। মিমিও যে রাগসঙ্গীতের ভালো সমঝদার, সেকথা আমার জানা ছিলো না। আমার নিজের ভালো লাগে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, কিন্তু সে বিষয়ে কোনো বিস্তারিত আলোচনায় যোগ দেওয়ার মতো জ্ঞান আমার নেই। না জানি আগেকার জমানার গাইয়েদের সম্বন্ধে চটকি গল্প, না দিতে পারি কারো গায়কী বা কোনো ঘরানা সম্বন্ধে নিজের মতামত। সুতরাং আমাকে নীরব শ্রোতা হয়েই বসে থাকতে হোলো। এবং আমার সেটা ভালো লাগলো না।

চারিদিকে গেম্স্‌এর ধুম, শোরগোল, গল্পগুজব, হঠাৎ নিঃসঙ্গ মনে হোলো নিজেকে। ভাবলাম, এরা এখানে বসে গল্প করুক। আমি অন্য কাউকে খুঁজে নিই বা কোনো গেম্‌এ যোগ দিই।

আমি উঠে পড়লাম। এগিয়ে গেলাম দুটো টেবিল। একটি টেবিলে একলা বসে চন্দ্রা মুখার্জী, কলকাতা থেকে নবাগতা সেই ছাত্রী, যে আজকের অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রসঙ্গীত গেয়েছে। তার সঙ্গে সামান্য চেনা ছিলো, আমায় দেখে সে একটু হেসে বসতে বললো।

"আপনি একা বসে আছেন ?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"আমি নতুন এসেছি, বেশী কাউকে তো চিনি না।"

"এখানে চেনার অপেক্ষায় বসে থাকে না কেউ, নিজের থেকে সবার সঙ্গে জমিয়ে নিতে হয়।"

বুঝলাম যে এখনো তার আড়ষ্টতা কাটে নি। এখানকার ছেলে-মেয়েদের এই সহজ পরিবেশে সে অভ্যস্ত নয়।

অন্য ধারে একটা "গেম্" চলছে। অনেকের কোনো না কোনো জিনিস বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, কারো রুমাল, কারো পেন্, কারো চুলের কাঁটা, এরকম কোনো না কোনো কিছু। সব জিনিস একটি টেবিলের উপর জড়ো করা। ডেকে ডেকে মালিকদের বলা হচ্ছে যে যার জিনিস দাবী করে নিতে। যেই দাবী করতে উঠছে, তাকে বলা হচ্ছে তার জিনিস ফেরত পাওয়ার আগে নির্দিষ্ট একটা কিছু করতে,—কাউকে বলা হচ্ছে গান গাইতে, কাউকে মিলিটারি মার্চ দেখাতে, এরকম সব। একটি ক্যারেন মেয়ে উঠলো তার রুমাল দাবী করতে। তাকে বলা হোলো,—পেছন দিকে চার পা হাঁটো, সেখানে দাঁড়িয়ে ছুলাইন গান গাও, তারপর কোনো পুরুষের সামনে এসে তাকে বলো,—জেণ্টেলম্যান, ইউ আর হ্যাণ্ডসাম।

সবাই হেসে উঠলো। হাসলো সেই ক্যারেন মেয়েটিও। খুব সহজ হাসি হাসলো। তারপর পেছন দিকে চার পা হেঁটে গিয়ে, ছু লাইন ইংরেজি গান গেয়ে এগিয়ে গেল একদিকে। সেখানে বসেছিলো পালির বৃদ্ধ প্রফেসার সায়া-উ-চান্। অনেক বয়েস, সৌম্য প্রশান্ত চেহারা, বুক পর্যন্ত লম্বা পাতলা শাদা দাড়ি তার সামনে এসে দাঁড়িয়ে ক্যার্ট্‌সি করে বললো—জেণ্টেলম্যান, ইউ আর হ্যাণ্ডসাম্।

হেসে হাততালি দিয়ে উঠলো সবাই।

চন্দ্রা বললো, "আপনাদের এখানে সবাই কি রকম সহজ! আমার খুব ভালো লাগছে।"

একটা নতুন খেলা শুরু হবে। এ খেলায় জুড়ি হতে হবে একজন করে ছেলে ও একজন করে মেয়েকে।

আমি চন্দ্রাকে বললাম, "আসুন।"

"আমার লজ্জা করছে," বললো চন্দ্রা।

"আসুন না, সবার মধ্যে এক্ষনি লজ্জা কেটে যাবে।"

হয়তো চন্দ্রা আসতো, কিন্তু আমার যাওয়া হোলো না। পেছন থেকে একটা তীক্ষ্ণ সুরেলা ডাক শুনলাম, "সলিল।"

ফিরে তাকিয়ে দেখি মা-য়িন-ম্যা।

"তুমি এখানে?"

"অমিয়র সঙ্গে এসেছি। ওকে তো আমি আজকাল কোথাও একলা যেতে দিই না। বাড়ি থেকে একবার বেরোলে সহজে ফিরতে চায় না। আসতে আসতে সেই এগারোটা সাড়ে এগারোটা বেজে যায়। আমার ভালো লাগে না। এসব কি? আমার কাছে যদি ভালো না লাগে আমার কাছে থেকো না। আমি তো তোমায় বেঁধে রাখিনি। যদি আমার কাছে থাকতে হয় তো আমার কথা শুনতে হবে।"

বলতে বলতে মুখ ফিরিয়ে সে একবার চন্দ্রার দিকে তাকালো। তারপর বল্‌লো, "তোমার সঙ্গে কতোদিন দেখা হয় নি। কতো দিন আসো নি তুমি। তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। অমিয় কোথায়?"

চতুর্দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করলো মা-য়িন-ম্যা। চোখ পড়লো ওধারের টেবিলে। অমিয় তখনো বসে মৌজ হয়ে গল্প করছে মিমির সঙ্গে। সে এগিয়ে গেল সেদিকে।

"ওমিও—য়ে!" বলে হাত রাখলো অমিয়র পিঠে। দেখতে পেলাম, সে ডাক কানে যেতেই চিলের ডাক শোনা চড়ুই পাখির মতো শিউরে উঠলো অমিয়।

"রাত হয়ে যাচ্ছে। বাড়ি চলো। আমাদের অনেক দূর যেতে হবে," বলে সে অমিয়কে কোনো কথা বলবার অবকাশ দিলো না। মিমিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে অমিয়কে টেনে নিয়ে চলে গেল।

দেখলাম, মিমির মুখ আরক্ত হয়ে উঠেছে। আমি তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেলাম মিমির কাছে।

"এই জেরবাদী মেয়েটিই নিশ্চয়ই মা-ম্নিন-ম্যা," মিমি মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করলো।

"হ্যাঁ। অমিয় ওর বাড়িতেই থাকে।"

"আমি জানি।"

মিমি আর কিছু বললো না। আমিও চলে গেলাম। হঠাৎ খেয়াল হোলো চন্দ্রাকে না বলেই এদিকে চলে এসেছি। মুখ ফিরিয়ে তাকিয়ে দেখি চন্দ্রা নেই। সে ওখান থেকে উঠে চলে গেছে।

সোশিয়্যাল প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। আমি, চ্য-থেইন, মা-লা-লা, মা-খিন-স আর মিমি একটু আগেই উঠে পড়লাম। ওদের মিমিকে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। কোকাইন থেকে মোগল স্ট্রীট, আবার সেখান থেকে ফিরে কোকাইন, সময় লাগবে অনেক।

এ্যাসেম্‌ব্লি হল্‌ থেকে বেরিয়ে যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছি, চন্দ্রার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি না বলে চলে আসার জন্যে অপ্রস্তুত বোধ করছিলাম, কিন্তু চন্দ্রা খুব সহজ হাসি হেসে বললো, "আজ তো ভালো করে আলাপ হওয়ার সুযোগ হোলো না, একদিন আমাদের বাড়ি আসবেন।"

ঠিকানা দিলো। ওরা টমসন এ্যাভিনিউতে ফ্ল্যাট নিয়েছে ওর বাবা ভারতীয় কাস্‌টম্‌স সার্ভিসে আছে, মাস খানেক হোলো বর্মা গভর্ণমেণ্ট ওঁকে এখানে নিয়ে এসেছে।

মিমির সঙ্গে আমার দেখা হোতো আগেরই মতো, কখনো চ্য-থেইনদের বাড়ি, কখনো মা-লা-লা-দের বাড়ি, কখনো পেগি আরভিন বা লুসি হান্‌দের বাড়ি। গল্প করতাম, এক সঙ্গে বসে চা খেতাম, তারপর যে যার মতো বাড়ি চলে যেতাম।

কিন্তু একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করলাম তার মধ্যে। তার সহজ আভিজাত্য এবং মর্যাদাবোধের মধ্যে একটা চাপা বিষণ্ণতা ছিলো। সেটা ঘুচে গেল। হঠাৎ যেন প্রাণপ্রাচুর্যে টলমল করতে লাগলো

সে, একটা দৃপ্ত বিদ্রোহবোধ তার নিঃসহায়তা বোধকে ছাপিয়ে উঠলো।

একদিন বললে, "জানো, আমি আজকাল একলা বেরোতে শুরু করেছি।"

"দিলওয়ার কিছু বলেনি?"

"বললেই বা কে শুনছে ওর কথা? এত বেশী পর্দা এদেশে চলে না। আর আমি পর্দার মধ্যে থাকবোই বা কেন?"

শুনে আমি খুশি হলাম। আর দশজন অল্প বয়েসী কলেজের ছেলের মতো বলে বসলাম, "চলো একদিন তুমি আর আমি সিনেমায় যাই।"

মিমি হাসলো। বললো, "এখনো অতোটা নয়। তুমি দিলওয়ারকে চেনো না। ও জানতে পারলে ভালো হবে না।"

"কে ওর তোয়াক্কা করে?"

"না, না। অনর্থক হয়রানি হবে। তোমার সম্বন্ধে ওর একটা ভালো ধারণা আছে। মিছিমিছি সেটা নষ্ট হয়ে যাবে।"

"দেখ, আমরা বন্ধু। যদি একসঙ্গে ঘুরে বেড়াই, তাতে কার কি?"

মিমি হেসে উত্তর দিলো, "কেন, এই তো বেশ আছি, আর দশজন বন্ধুর সঙ্গে যেমনি দেখা হয়, তোমার সঙ্গেও দেখা হয়। সবার সঙ্গে আমরা বেশ গল্প সল্প করি।"

চ্যা-থেইন আর আমি স্টুডেণ্টস্ ইউনিয়ানের টাকশপে বসে একদিন চা খাচ্ছিলাম। সে হঠাৎ বললে, "আই-সে রয়, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছো। মিমি বদলে যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ, সে আজকাল একলা বেরোয়," আমি বললাম।

"দেখ রয়, এর গুরুত্ব কিন্তু অনেক। আগে মা-খিন-স কিংবা মা-লা-লা নিজে গিয়ে ওকে নিয়ে আসতো। আজকাল সে একলা চলে আসে। ওর ভায়ের কথা শোনে না।"

"আমি জানি।"

"দেখ রয়, এই বয়েসে কোনো মেয়েকে যখন দেখা যায় সে তার বাড়ির রীতিনীতিকে মানছে না, তার গার্জিয়ানদের অস্বীকার করছে, তখন বুঝে নিতে হয় তার জীবনে কোনো ছেলে এসেছে," বলে চ্য-থেইন তার বার্মিজ জীবন দর্শন ব্যক্ত করলো। "আমরা ভাবতে শুরু করেছিলাম সে তুমি। কিন্তু এখন দেখছি তুমি নও। কারণ অনেক সময় সে একলা বেরিয়ে, আমাদের কাছে আসে না। তোমার সঙ্গেও দেখা হয় না। মাস্ট-বী তার অন্য কোনো বয়-ফ্রেণ্ড হয়েছে। আর এবার সে সত্যি সত্যি কারো সঙ্গে গভীর ভাবে ইন লাভ।"

ওর কথা শুনে আমি হেসে ফেললাম। "তোমার মাথা খারাপ। বাড়ি থেকে একলা বেরোলেই যে অন্য কোনো ছেলের সঙ্গে ঘোরা-ফেরা করছে, সে কথা কে বললে। সংসারে কতো কাজ থাকতে পারে। আর আমি ওকে যতোটা জানি, ওর পক্ষে কোনো ছেলের প্রেমে পড়া সম্ভব নয়। মেয়েটি একেবারে অন্য রকম।"

"তুমি মেয়েদের সম্বন্ধে কি জানো," চ্য-থেইন তেড়ে উঠলো। "ওদের বোঝা অসম্ভব। মা-লা-লা আর মা-খিন-স বোধ হয় জানে। কিন্তু আমায় বলছে না। বোধ হয় তুমি আমার বন্ধু বলেই বলছে না।"

"যাই হোক না কেন, আমার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মুখ থেকে চুরুট নামিয়ে চ্য-থেইন আমার দিকে একটু তাকিয়ে রইলো। তারপর বললো, "মাই বয়, ইউ ডোণ্ট নো।"

মিমিকে আমি সবই খুলে না বলে থাকতে পারতাম না। এরপর ওর সঙ্গে যেদিন দেখা হোলো, ওকে জানালাম চ্য-থেইনের কাছে শোনা কথাগুলো। শুনে সে খুব হাসতে লাগলো।

তার হাসি দেখে আমি আশ্বস্ত হলাম।

সুলে-প্যাগোডা রোডের উপর গ্লোব সিনেমা। সেখানে একদিন

সন্ধ্যেবেলা মা-ম্নিন-ম্যার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আমি গিয়েছিলাম সন্ধ্যার শোতে ছবি দেখবো বলে। ভেতরে ঢুকে দেখি লবির এক-পাশে মা-ম্নিন-ম্যা দাঁড়িয়ে আছে।

"সলিল! অমিয়কে দেখেছো?"

"না তো, আমি এই আসছি। সে এখানে এসেছে নাকি?"

"হ্যাঁ, আসবার কথা ছিলো। আমি ওর পকেটে গ্লোবের টিকিট দেখেছিলাম।"

ম্যাটিনি-শো ভাঙলো। দর্শকদের স্রোত বেরিয়ে যাচ্ছিলো আমাদের পাশ দিয়ে। মা-ম্নিন-ম্যা এদিক ওদিক তাকাচ্ছিলো যদি অমিয়কে দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ পেছন থেকে অমিয়র গলা শুনলাম।

"তোমরা এখানে?"

"আমি এসেছি সিনেমা দেখতে। মা-ম্নিন-ম্যা এসেছে তোমার খোঁজে।"

অমিয় একটু যেন অবাক হোলো। "আমার খোঁজে?"

"তুমি তো আমায় বলো নি তুমি সিনেমা দেখতে আসবে", মা-ম্নিন-ম্যা বললো, "তুমি তো বলেছিলে তুমি যাবে তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করতে।"

"হ্যাঁ। তাই গিয়েছিলাম। কিন্তু মা বাড়ি ছিলো না, তাই কি আর করি ভেবে না পেয়ে এখানে চলে এলাম।"

"মায়ের দেখা না পেয়ে তারপর ঠিক করেছো সিনেমা দেখতে আসবে?"

"হ্যাঁ।"

আমি মা-ম্নিন-ম্যার মুখের দিকে তাকালাম। সে তাকালো আমার মুখের দিকে। পরিষ্কার বুঝলাম যে অমিয় মিছে কথা বলছে। মা-ম্নিন-ম্যা তার পকেটে আগেই দেখেছে সিনেমার টিকিট। কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগলো। মা-ম্নিন-ম্যার এ কি রকম খবরদারি!

ওরা চলে গেল। আমি টিকিট ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

মণ্টগোমেরি স্ট্রীট আর স্পার্কস স্ট্রীটের মোড়ের কাছে সেই কাকা-টীশপে আড্ডা দিতাম রোববার দিন সকাল বেলা, একদিন রোববার সকালে সেখানে গিয়ে দেখি পায়জামা আর কুর্তা পরে দিলওয়ার বসে আছে।

আমায় দেখে বললো, "তোমারই অপেক্ষা করছিলাম। অমিয়র কোনো খবর জানো?"

"খবর বিশেষ কিছু জানি না, তবে সেদিন অমিয় আর মা-য়িন-ম্যার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো," বলে হাসতে হাসতে গ্লোবে ওদের সঙ্গে দেখা হওয়ার বিস্তারিত বিবরণ দিলাম।

এক মুহূর্তের জন্যে দিলওয়ার আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো। তারপর সেও হাসতে লাগলো। বললো, "আমি তোমায় আগে বলিনি? অমিয় মা-য়িন-ম্যার কাছ থেকে পালিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছে। ওর মতো ভালো মানুষ পেয়েছে তাই। পড়তো আমার মতো লোকের হাতে, মা-য়িন-ম্যা বুঝতে পারতো কে কার খবরদারি করে।"

খানিকক্ষণ একথা সেকথার পর দিলওয়ার হঠাৎ জিজ্ঞেস করলো, "মিমির সঙ্গে তোমার দেখা হয়?"

আমার কান দুটো হয়তো একটু লাল হোলো। উত্তর দিলাম, "কখনো সখনো হয়। আমি যদি চ্য-থেইন্‌দের বাড়ি যাই, আর সে সময় মিমিও যদি গিয়ে পড়ে মা-খিন-সর কাছে, তাহলে দেখা হয়। সে ওর বন্ধুদের নিয়ে থাকে। আমি আমার বন্ধুদের নিয়ে থাকি।"

"হুঁম্। তা একদিন এসো না আমাদের বাড়ি। মিমির সঙ্গে দেখা হবে," দিলওয়ার একটা অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো, "অবশ্যি আমাদের বাড়িতে পর্দা মানে, তবে তোমার কথা আলাদা। তুমি তো ওকে চেনো। তার উপর তুমি আমার এত-দিনের বন্ধু, ঠিক আমার ভায়ের মতো।" একটু চুপ করে থেকে সে

হঠাৎ হেসে ফেললো, বললো, "একটা মজার কথা জানো? মিমি আজকাল পর্দা মানে না। মেয়েদের লেখাপড়া শেখালে ওই হয়। তখনই বাবাকে বলেছিলাম, আমার কথা তো কানে তোলেনি। আমি জানতাম এ রকম হবে। যাক, আজকালকার জমানা, দুদিন একটু ফুর্তি করুক। আমি জানি কোথায় এবং কখন রাশ টেনে ঘোড়াকে থামিয়ে দিতে হয়। আমি ওর সম্বন্ধে যতো জানি বলে মনে করি, আসলে আমি তার চেয়ে অনেক বেশী জানি। তুমি তো ওর বন্ধু। ওকে কথায় কথায় বলে দিও যে হঠাৎ কোনো কিছুর বাড়াবাড়ি ভালো নয়।"

আমার কাছে শুনে মিমি একটু ভাবলো। তারপর বললো, "সলিল, তোমার কি ধারণা ভাই সায়েব তোমায় খুব বন্ধু মনে করে বলে এত কথা বলেছে?"

"তা নিশ্চয়ই নয়—।"

"ভাই সায়েব জানে যে তুমি আর আমি খুব বন্ধু। তোমায় যা কিছু বলে সে যে আমার কানে আসবে একথা সে জানে। সে জন্যেই বলেছে। যে কথা সে এখনো আমায় সোজাসুজি বলতে চায় না, সে কথা সে ঘুরিয়ে তোমার মারফতে আমায় জানিয়েছে।"

আমি কিছুক্ষণ চুপ করে রইলাম। তারপর বললাম, "মিমি, চলো আজ তুমি আর আমি একসঙ্গে বেরোই।"

তখন বিকেল বেলা। আমরা গিয়ে বসলাম রয়্যাল লেকের পাড়ে। ওপারে শোয়ে-ড্যাগন প্যাগোডা, লেকের জলের স্থির বুকে তার শান্ত ছায়া পড়েছে। বিকেলে এখানে বেড়াতে এসেছে অনেক লোক।

আমি বললাম, "মিমি, দেখ সেদিন চ্য-থেইন তোমার নামে বলছিলো। কাল দিলওয়ার বলছিলো। তোমার নামে এসব কথা শুনতে আমার ভালো লাগে না।"

"কেন সলিল," খুব আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলো মিমি।

"এমনি," আমি অন্যদিকে তাকিয়ে উত্তর দিলাম, "তুমি কি রকম, আমি জানি। তোমায় কেউ ছোটো করবে এটা আমি সহ্য করতে পারি না।"

মিমি অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো। তারপর বললো, "আচ্ছা সলিল, একটা কথা বলবে? তুমি আমার সম্বন্ধে অতো ভাবো কেন?"

"তুমি আমার বন্ধু তাই," আমি আস্তে আস্তে উত্তর দিলাম।

"শুধু তাই?"

"তা ছাড়া আবার কি?"

মিমি মাথা নিচু করে একটি ঘাস ছিঁড়ছিলো। খুব কোমল গলায় জিজ্ঞেস করলো, "একটা কথা বলবে সলিল?"

"কি?"

"তুমি কাউকে ভালোবাসো?"

আকাশের গায়ে তখন গোধূলির সোনালী আর গোলাপী আভা জলের বুকে মেঘের বুকে রং ছড়িয়ে দিয়েছে। এতক্ষণ তাকিয়ে দেখিনি, এবার তাকিয়ে দেখলাম। সেই প্রথম বয়েস, একটা আশ্চর্য সুন্দর মধুর বেদনাময় আনন্দে মন ভরে গেল। কিন্তু কথা বলতে গিয়ে দেখি গলায় কি যেন আটকে গেছে।

অনেকক্ষণ পরে বললাম, "দেখ মিমি, যা হবার নয়, তা নিয়ে ভেবে কি লাভ। সংসারের আর দশজনার সঙ্গে একটা সহজ বন্ধুত্বের সম্পর্ক, তাই ভালো। তাতে শুধু আনন্দ, ব্যথা পেতে হয় না।"

"আমিও তোমায় সে কথাই বলতাম", মিমি মুখ না তুলে উত্তর দিলো, "এ যে কী কষ্ট সে আমি জানি। এ কষ্ট সইবার মতো জোর সবার থাকে না। তোমার বয়েস অনেক কম। এই এত অল্প বয়েসে এত বড় ব্যথা জীবনে ডেকে এনো না।"

মিমির কথা শুনে আমি চুপ করে রইলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা মিমি, তুমি কাউকে ভালোবাসো?"

"তুমি আমার বন্ধু। তোমার কাছে আমি কোনো কথা লুকোবো না। হ্যাঁ, আমি একজনকে ভালোবাসি।"

"কে সে মিমি?" আমার বুক টিপ টিপ করতে শুরু করলো।

"সে কথা শুনে আর কি করবে? তোমার না জানাই ভালো।" মনে মনে বললাম,—বেশ তাই হোক মিমি। আমি কাকে ভালোবাসি তুমিও জানবে না, তুমি কাকে ভালোবাসো, আমিও জানবো না। তোমার মনে ভালোবাসা আছে, আমার মনেও আছে, এটুকু জেনেই আমরা একটি মনের বয়েসের গণ্ডি পেরিয়ে জীবনের আকাশে ভেসে যাবো। ফিরে আসবার সময় মিমি বললো, "একথা সব সময় মনে রেখো সলিল, তুমি আর আমি বন্ধু, আমরা খুব বন্ধু।"

সেদিন রাত্তিরে অনেকক্ষণ ঘুমোইনি। জেগে থাকতে খুব ভালো লাগছিলো। তবু মনে একটু একটু কষ্ট হচ্ছিলো। ভাবছিলাম, মন যদি রঙীন হোলোই, কেন সে গোধূলির রং নিলো, যে রং আর থাকবে না, থাকবে শুধু তার স্মরণটুকু।

ভোরে যখন ঘুম ভাঙলো, ঝিরঝিরে হাওয়ায় খুব ভালো লাগলো ভোরের আলো। তাড়াতাড়ি উঠে পড়লাম। নটায় ক্লাস। আটটায় বাড়ি থেকে বেরোতে হবে।

রয়্যাল লেকের পাড়ে বসে আমি মিমিকে কি বলেছিলাম আর সে আমায় কি বলেছিলো তা নিয়ে পরে আমাদের মধ্যে নতুন করে আর কোনো আলোচনা হয়নি। আগে যেমনি দেখা হোতো তেমনি দেখা হতে লাগলো। সাধারণ গল্প গুজবের মধ্যেই যেন আমরা আমাদের অন্তরঙ্গতা আরো বেশী করে অনুভব করতে লাগলাম। মাঝে মাঝে আজকাল আমরা একলাই বেরোতাম। যখনি মিমি টুকিটাকি জিনিস কিনতে স্কট-মার্কেটে যেতো, সঙ্গে নিয়ে যেতো আমাকে। একদিন বললো, "ভাবছি, যখন নতুন সেশান শুরু হবে আগামী মার্চ থেকে, কলেজে ভর্তি হবো। ভাই সায়েব না মানুক, আমি পরোয়া করি না। বাবাকে বলেছিলাম সেদিন। উনি রাজী। ওঁর শরীর আজকাল একটু ভালো আছে। ওঁকে সব সময় দেখা শোনা করবার দরকার হয় না।"

"যদি ইতিমধ্যে তোমার বিয়ে দিয়ে দেয়?"

"আমি করলে তো! আমি সেরকম মেয়ে নই যে, দিলওয়ার যা বলবে আমি মুখ বুঁজে তাই মেনে নেবো। আমার খানদান যাই হোক না কেন, আমি বর্মা মুলুকের মেয়ে। এখানকার আর দশজন মেয়ে যা হয়, আমাকেও তাই হতে হবে। আমি নিজে রোজগার করবো। তারপর আমার যাকে খুশী বিয়ে করবো।"

"মিমি, চলো দু-বছর পরে তুমি আর আমি বিলেত চলে যাই," আমি বললাম, অল্প বয়েসী কলেজের ছেলে যেমনি স্বপ্নের জাল বোনে, তেমনি।

মিমি হাসলো। বললো, "লড়াই খতম্ হতে দাও, তারপর দেখা যাবে।"

সব মন-গড়া সুখ একদিন খুব রূঢ়ভাবে শেষ হয়। আমারও তাই হোলো।

একদিন রোববার বিকেলে কিছু করবার ছিলো না। কিছু করবার ইচ্ছেও ছিলো না। মাঝে মাঝে একরকম মেজাজ আসে, খুব একলা থাকতে ইচ্ছে করে। সেদিনও তাই হোলো। রোববার বিকেলে, বাড়িতে খুব হৈ-চৈ। ভালো লাগলো না। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম।

বাসে চড়তে ইচ্ছে হোলো না। ভালো লাগছিলো না বাসের ভিড়। ফ্রেজার স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে ফেয়ার স্ট্রীটে এসে পড়লাম। তারপর ডাইনে মোড় ফিরে ফেয়ার স্ট্রীট ধরে হাঁটতে লাগলাম। রেলওয়ে ব্লক পেরিয়ে মণ্টগোমেরি স্ট্রীট পার হয়ে এসে পড়লাম রেলওয়ে স্টেশনে। তারপর ওভারব্রিজ পার হয়ে আপার ফেয়ার স্ট্রীটে নেমে সোজা উত্তর দিকে হাঁটতে লাগলাম। ইচ্ছে ছিলো বেড়াতে বেড়াতে রয়্যাল লেকের দিকে যাবো। তারপর শোয়ে ড্যাগন প্যাগোডার ওদিকে ঘুরে চায়না স্ট্রীটে এসে ট্রাম ধরে, তারপর ফ্রেজার স্ট্রীটে বাস বদলে বাড়ি ফিরবো।

খানিকটা গিয়ে রয়্যাল এগ্রিহর্টিকালচারেল গার্ডেনের কাছে এসে পড়লাম। ভারী সুন্দর বাগানটা। না! লেকে নয়, এখানেই বসে কাটিয়ে দেওয়া যাক আজকের বিকেল।

গেট পেরিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। লোকজন খুব বেশী নেই। এদিক সেদিক খানিকটা বেড়িয়ে নকল ঝর্ণার দিকে এগিয়ে গেলাম। ঝর্ণার উপর একটি ছোট্ট সাঁকো আছে। ইচ্ছে ছিলো সেটা পেরিয়ে ওদিকের গেলিশাবাগানের মধ্যে গিয়ে বসবো।

কিন্তু যাওয়া হোলো না। হঠাৎ থমকে দাঁড়ালাম। নিজের চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হোলো না।

ওদিক থেকে মিমি আর অমিয় গাঙ্গুলী সাঁকোর উপর উঠে আসছে।

মিমির পরণে বার্মিজ পোশাক,—আজকাল সে সব সময়ে যা

পরে থাকুক। অমিয়ও সিল্কের শার্টের উপর একটি গাঢ় লাল সিল্কের লুঙ্গি পরে।

ওরা আমায় দেখতে পায়নি। আমি একটি ঝাড়ের আড়ালে সরে দাঁড়ালাম। তারপর আস্তে আস্তে বেরিয়ে এলাম বাগানের ভিতর থেকে।

কখন আপার ফেয়ার স্ট্রীট ধরে হেঁটে এসে রেল-স্টেশনে পৌঁছে গেছি খেয়াল নেই। ওভারব্রিজ পার হওয়ার সময় একটি লোকের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সম্বিত ফিরলো।

"সলিল! তুমি?"

তাকিয়ে দেখি, দিলওয়ার বকস্‌।

"কোত্থেকে আসছো?"

"গিয়েছিলাম এগ্রিহর্টিকালচারেল গার্ডেনের দিকে। এখন বাড়ি ফিরছি।"

দিলওয়ার তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়ে দেখলো আমার দিকে। তারপর বললো, "আমিও লেকের দিকে যাবো ভাবছিলাম। যাক, তোমার সঙ্গে যখন দেখা হোলো তখন অন্য প্রোগ্রাম করা যাক। চলো নাইট্‌-মার্কেটের ওদিকে গিয়ে ফালুদা খাওয়া যাক।"

হাঁটতে হাঁটতে আমরা চলে এলাম ফ্রেজার স্ট্রীটের উপর একটি ফালুদার দোকানে। চারদিকে তখন নাইট-মার্কেটের শোরগোল শুরু হয়ে গেছে।

"তুমি লেকের দিকে গেল না কেন? আমি বাড়ি চলে যেতাম," আমি বললাম।

"আমি লেকের দিকে যাচ্ছিলাম একটা প্রয়োজনে। তোমার সঙ্গে দেখা হতে মনে হোলো আমার আর লেকের দিকে না গেলেও চলে," উত্তর দিলো একটু হেসে।

আমি চোখ তুলে তাকালাম দিলওয়ারের দিকে। ঠিক বুঝতে পারলাম না তার কথার মর্মার্থ।

অমিয়র সঙ্গে মিমিকে দেখবো, এ কোনোদিন কল্পনাও করতে পারি নি। ভেবেছিলাম মিমিকে জানাবো না যে সেদিন ওদের আমি দেখেছি। কিন্তু মিমিই নিজের থেকে কথা পাড়লো।

বললো, "সেদিন তুমি আমাদের দেখে চট করে চলে গেলে কেন? তোমায় ডাকবার আগেই তুমি যে কোথায় মিলিয়ে গেলে টেরই পেলাম না।"

আমার মন খুব ভারী হয়েছিলো। কোনো উত্তর দিলাম না।

মিমি আস্তে আস্তে বললো, "সলিল, তুমি আমার খুব বন্ধু। তোমাকে একদিন না একদিন বলতাম। দেখ, সেদিন তোমায় বলছিলাম না আমি একজনকে খুব ভালোবাসি? নামটা বলতে পারিনি সেদিন। লজ্জা করছিলো খুব। এখন আর বলতে বাধা নেই। তুমি তো জেনেই গেছ।

আমি শুধু বললাম, "আমি খুব অবাক হয়েছিলাম।"

"অবাক হওয়ারই কথা। কে ভেবেছিলো? আমি তো ভাবতেই পারিনি। একদিন আলাপ হোলো কলেজের সোশিয়্যালে, তারপর একদিন রোজমারী মেহতার বাড়িতে। ওর এক ভাই না কে, অমিয়কে চেনে। তাকে গান গাইতে ডেকে আনা হয়েছিলো ওদের ওখানে। সেখানে আমিও ছিলাম। তারপর কি করে যে কি হয়ে গেল! মহব্বত মানুষের জীবনে বোধহয় এমনিই আসে, ঠিক তুফানের মতো।"

আমি পুতুলের মতো ঘাড় নাড়লাম,—"হ্যাঁ।"

"ওর আমাকে প্রয়োজন ছিলো। আমারও প্রয়োজন ছিলো ওকে। কয়েকদিনের মধ্যে আমি যে কিরকম বদলে গেছি, বলবার নয়। আমার মনে একটা আশ্চর্য জোর এসেছে। কি করে কে জানে। অমিয়ও অনেক বদলে গেছে।"

আমি পুতুলের মতো ঘাড় নাড়লাম,—"হ্যাঁ।"

"সেদিন থেকে তোমাকে আরো বেশী আপন মনে হচ্ছে। তুমি আমার যেমনি বন্ধু. তেমনি তো অমিয়রও বন্ধু।"

আমি পুতুলের মতো ঘাড় নাড়লাম,—"হ্যাঁ।"

মিমি লক্ষ্য করলো যে আমি বেশী কথা বলছি না। সে আমার দিকে তাকালো। হাসলো একটু দুষ্টুমির হাসি। বললো, "তুমিও তো একজনকে প্যার করো, না?"

এবার আর পুতুলের মতো ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলতে পারলাম না। একটু চুপ করে থেকে আস্তে আস্তে বললাম, "আমায় কেন মিছিমিছি একথা জিজ্ঞেস করা?"

মিমি আমার দিকে তাকালো। বিস্ফারিত হোলো তার চোখ। আস্তে আস্তে পাণ্ডুর হয়ে গেল তার উজ্জ্বল মুখখানি। চাপা গলায় বলে উঠলো, "সলিল!"

"কি?"

কিছুক্ষণ কিছু বলতে পারলো না সে। তারপর বললো, "সলিল, আমি ভাবতেই পারিনি,—তুমি—তুমি—"

আমি খুব সহজ হওয়ার চেষ্টা করে হেসে বললাম, "ও কিছু নয়। তুমি কিছু ভেবো না। ও রকম হয়, ঠিকও হয়ে যায়।"

মিমি কিন্তু সহজ হতে পারলো না। খুব বিষণ্ণ হয়ে গেল। আস্তে আস্তে বললো, "আমি ভাবতেই পারিনি। আমার জন্যে তুমি কষ্ট পাবে, আমি ভাবতেই পারিনি।"

"দেখ মিমি", আমি খুব সহজ গলায় বললাম, "যা হবার নয়, তা নিয়ে আমি কোনোদিন ভাবি না। সেদিন তুমি আমায় বলেছো, আজ আমি তোমায় সেকথা ফিরে বলছি মিমি, তুমি আর আমি খুব বন্ধু, একথা শুধু মনে রেখো।"

মিমি চুপ করে রইলো।

চুপ করে থাকতে আমার ভালো লাগছিলো না। হঠাৎ জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা দিলওয়ার জানে?"

"ও সব জানে।"

"কিছু বলেনি?" আমি একটু শঙ্কিত হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

"বলেছে। কিন্তু আমি ওকে জানিয়ে দিয়েছি, ও যদি অমিয়র

কোনো ক্ষতি করে আমি ভাই সায়েবের বুকে ছুরি বসিয়ে দেবো। আমি মোগলের মেয়ে। ও আমায় চেনে। ও অমিয়র কোনো ক্ষতি করবে বলে মনে হয় না।"

মা-লা-লা আর মা-খিন-স নিশ্চয়ই জানতো, চ্য-থেইনও জেনে গেল। কলেজে একদিন সে আমায় ধরে নিয়ে গেল জন্‌স্‌ টাকশপএ। খাউসোয়ের অর্ডার দিয়ে বললো, "দেখ, তুমি আজকাল বড্ড মনমরা হয়ে যাচ্ছো। এটা ভালো নয়। আমি তোমায় আগেই বলেছিলাম।"

"কো-চ্য-থেইন্‌, অন্য বিষয় আলোচনা করা যাক।"

"তাই আমি করতে যাচ্ছিলাম। তুমি এরকম ভেজিটেবল্‌ বনে বসে থাকবে সে আমাদের ভালো লাগছে না। কেন তুমি বেশী আসো না আজকাল।"

"পড়াশুনোর চাপ পড়েছে ভাই। অনার্সের চাপ পড়েছে। গত বছর বেশী পড়াশুনো করিনি। সাবসিডিয়ারি সাবজেক্টগুলোর পরীক্ষা এ বছর দিয়ে দেবো ভাবছি।"

"হেল্‌ উইথ্‌ য়োর সাবসিডিয়ারি সাবজেক্টস্‌। ভাই, তরুণ বয়েস সবার বেশীদিন থাকে না। লেট্‌ আস্‌ সী লাইফ্‌, লেট্‌ আস্‌ এন্‌জয় লাইফ্‌। কে জানে, এদিকে যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে মাস কয়েকের মধ্যেই। তখন হয়তো আর ভালো সময় থাকবে না।"

"যুদ্ধ শুরু হোক বা না হোক, আমার কি ?"

"দেখ সলিল, যুদ্ধ শুরু হলে কি হবে বলা যায় না। ইউ ইণ্ডিয়ান্‌স্‌, তোমরা বেশ সুবিধে মতো এ দেশ ছেড়ে ইণ্ডিয়ায় চলে যাবে জানি। আমরা তো তা পারবো না। আমাদের অনেককেই, বিশেষত যারা ইউনিভার্সিটিতে পড়ে, একটা বিরাট সংঘর্ষের মধ্যে জড়িয়ে পড়তে হবে। সামনে যা আসছে সেটা বার্মার জীবন-মরণ সমস্যা। তুমি তো জানো আমি দোবামা পার্টিতে আছি। যা বলি, কোনো প্রশ্ন না করে বিশ্বাস করো।"

"দেখ, আমি ওসব নিয়ে মাথা ঘামাই না। সামনে আমার অনার্সের পরীক্ষা। সে ছাড়া আমার আর কোনো ভাবনা নেই।"

"ভাবনা আমারও নেই, অন্তত আগামী কয়েক মাস। তাই এই কটা দিন আমরা খুব হৈ-চৈ করে বেড়াতে চাই। ফাইন্যাল-ইয়ার বি-এ'র লি-চেংকে চেনো। সে আমাদের জন্যে একটা প্রোগ্রাম ঠিক করেছে। এই শনিবার দিন। আমরা সবাই যাবো। তুমিও যাবে। সেদিন আর কোনো এনগেজমেণ্ট করবে না বলে দিচ্ছি। তুমি, আমি, মা-লা-লা, মা-খিন-স, পেগি, বার্টি আর লি-চেং। ব্যস।"

"মিমি?"

"না। এই প্রোগ্রামে সে ঠিক খাপ খাবে না। ওর আসতে অসুবিধে আছে।"

অভিজাত চীন পরিবারের ছেলে লি-চেং। এককালে শাংহাইতে থাকতো। ওদেশে যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর রেঙ্গুনে চলে এসেছে। এখানে ওর আত্মীয়স্বজন অনেক। বার্মায় চীন জনসংখ্যা কোনো-কালেই নগণ্য নয়, কিন্তু চীন-জাপানের যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর অনেক অর্থবান চীনা রেঙ্গুনে এসে বসবাস করতে শুরু করেছে। বিশেষ করে উনিশ-শো চল্লিশ একচল্লিশে রেঙ্গুন শহর যেন চৈনিক অধিবাসীতে ভরে উঠেছিলো। স্থায়ী অধিবাসী চীনেরা বেশির ভাগই শ্রমিক শ্রেণীর লোক, কিছু ছোটোখাটো ব্যবসায়ী। খুব ধনী চীনা সংখ্যায় খুব বেশী ছিলো না। কিন্তু সাম্প্রতিক কালে দেখা যাচ্ছিলো অনেক ধনী চীনা এসে বসবাস করতে শুরু করছে এই শহরে, বাড়ি কিনে নিচ্ছে এখানে সেখানে, বড়ো বড়ো নতুন গাড়ি চড়ে বেড়াচ্ছে, শহর ভরে যাচ্ছে চীনা লণ্ড্রি ও অন্যান্য দোকানে।

তাদেরই একজন লি-চেং। কলেজে পড়ে, তবে সে শুধু যাওয়া আসা করবার জন্যেই। ক্লাস করতে দেখা যায় না বড়ো একটা।

নিজের সানবীম-ট্যালবট গাড়ি আছে, ঝলমলে জামাকাপড় পরে গাড়ি হাঁকিয়ে বেড়ায়।

তারই গাড়িতে চেপে সেদিন সন্ধ্যের পর চ্য-থেইনদের সঙ্গে গিয়ে উপস্থিত হলাম রেঙ্গুন শহরের চীনে পাড়ায়। লেটার-স্ট্রীট থেকে বেরিয়ে ডেলহাউসি স্ট্রীটে মোড় ফিরে পাশের একটি ছোটো গলিতে এসে পড়লাম।

আশেপাশে চীনেম্যানদের অজস্র জুতোর দোকান, পওন-শপ আর মনোহারী দোকান। চৈনিক অক্ষর পরিশোভিত ছোটো বড়ো সাইনবোর্ড পথের উপর ঝুঁকে পড়েছে। পথের জনতা কিন্তু আন্তর্জাতিক। বিভিন্ন ভাষার কোলাহলে মোটরের হর্ন পর্যন্ত শোনা যায় না অনেক সময়।

অনেকটা এগিয়ে এসে একটি চীনে ডেন্টিস্টের দোকানের সামনে লি-চেং গাড়ি দাঁড় করালো। আমরা বেরিয়ে এলাম গাড়ি থেকে। লি-চেং আবার উল্টো দিকে ফিরে চললো পায়ে হেঁটে। আমরা অনুসরণ করলাম। একটি চায়ের স্টলে ভীষণ ভিড়। নিম্ন শ্রেণীর জনতা। বাসি চীনে খাবারের গন্ধ।

লি-চেং ভেতরে যাচ্ছিলো।

আমি বললাম, "শেষ পর্যন্ত এখানে?"

লি-চেং ফিরে দাঁড়ালো। বার্টি আরভিন হাসলো, বললো, "প্রথম দর্শনে মেয়েদের সম্বন্ধে ছাড়া আর কোনো কিছু সম্বন্ধে মতামত গঠন কোরো না, রয়। নির্ভয়ে চলো ওর সঙ্গে। এটা চায়না-টাউন, আর লি-চেং চাইনীজ। সেই সব কিছু ভালো জানে।"

স্টলের পেছনদিকের দরজায় বড়ো বড়ো করে লেখা—"জেন্টেল-মেন্ ওন্‌লি।" তেল চিটচিটে দরজা ঠেলে একটি অন্ধকার কক্ষ অতিক্রম করে একটি গলিপথে এসে পড়লাম। খুব ম্লান একটি আলো জ্বলছে সেখানে। একটি সরু সিঁড়ি উঠে গেছে উপরে। সেই সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে দেখি আরেকটি প্যাসেজের দুপাশে দুটো

ঘর। একটিতে প্রচণ্ড হট্টগোল, তীব্র আলোর নিচে দুর্দম উৎসাহে জুয়া চলছে।

অন্যটি নিঃশব্দ। দরজা ভেজানো। লি-চেং দরজাটা ঠেলে একটু খুললো। মৃদু নীল আলো জ্বলছে, ঘরের ভিতর। একটি মৃদু মিষ্টি অথচ গা-শিরশির করা গন্ধ এসে নাকে লাগলো। জন পনেরো কুড়ি বিভিন্ন বয়সের পুরুষ, বেশির ভাগই চিনে আর বর্মী, এবং দু-চারজন ভারতীয়, কাচের পুরু টুকরোর উপর মাথা রেখে চাটাইয়ের উপর পড়ে আছে চোখ বুঁজে। পাশে পড়ে আছে লম্বা পাইপ।

গন্ধে আমার নাসিকা কুঞ্চিত হোলো। পেগি আরভিন দু-চারটে নিশ্বাস টেনে বললে, "ডিলিশাস।"

খানিকটা এগিয়ে আরেকটি ঘর। সেখান থেকে একটি সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে। নিচে বন্ধ দরজার পাশে একটি লোক বসেছিলো। লি-চেংকে দেখে সে উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলে দিলো। সামনে "কাছরাগলি।" আমরা বেরিয়ে আসতে সে দরজা বন্ধ করে দিলো পেছন থেকে।

নাকে রুমাল চাপা দিয়ে 'কাছরা-গলি' পার হয়ে আরেকটি বাড়ির একতলার পেছনদিকের দরজা। লি-চেং দরজায় টোকা দিয়ে চীনে ভাষায় কি যেন বললো। দরজা খুলে গেল। ভেতরে ঢুকলাম আমরা সবাই। একটি প্রায় অন্ধকার প্যাসেজ পার হয়ে এসে দেওয়ালের পাশ দিয়ে ডাইনে ঘুরে বাঁয়ে ঘুরে হঠাৎ এসে পড়লাম একটি অভিজাত রেস্তঁরার ভিতর। সেখানে হাসি আর পিয়ানো আর বেহালার ঐকতানে মেশামেশি। ভেতরে ঢুকে আমার চোখ প্রায় ঝলসে গেল। উজ্জ্বল আলোয় জমকালো একটি মস্তো বড়ো হল। সমস্ত টেবিল প্রায় পরিপূর্ণ। একপাশে একটুখানি ডান্সিং ফ্লোর। সেখানেও নাচিয়েদের ভিড়। দেওয়াল ঘেঁষে একটি নিচু স্টেজ। সেখানে একটি পিয়ানো। একজন এ্যাংলো-বার্ম্যান পিয়ানোয় বসেছে। কালো কুচকুচে এক গোয়ানীজ

আলতো করে ছড়ি ধরে বেহালা বাজাচ্ছে। আরেকজন বার্মিজ ছেলের হাতে একটি গীটার।

আমরা একটি টেবিল দখল করলাম। চীনে খাবারের অর্ডার দেওয়া হোলো।

ভোজন পর্ব যখন অনেকটা এগিয়ে গেছে একজন বেয়ারা এসে আমায় বললে, "ওদিকের টেবিলে একজন সায়েব আপনাকে ডাকছে।"

ফিরে তাকিয়ে দেখি একটি টেবিলে বসে আছে দিলওয়ার। তার খাওয়া শেষ হয়েছে সবে মাত্র। আমি এদের বলে ওর টেবিলে গিয়ে বসলাম।

"তুমি এখানে?" সে জিজ্ঞেস করলো!

"কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে এসেছি।"

"চায়না টাউনের নৈশ জীবন দেখতে এসেছো?"

আমি একটু হাসলাম। বললাম, "আজ শনিবার সন্ধ্যায় কিছু করবার ছিলো না। তাই এখানে খেতে এলাম।"

"এখানে আর কি দেখবে? এসো আমার সঙ্গে।"

ঘরের পেছন দিকে স্ক্রীন ঢাকা একটি ছোটো দরজা। সেদিক দিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। একটি প্যাসেজ অতিক্রম করে দরজা ঠেলে ঢুকলাম একটা ছোটো ঘরে। সেখানে নানারকম জিনিসপত্রে ঠাসাঠাসি। মনে হোলো, এটা এখানকার যতো সব আজেবাজে ভাঙাচোরা জিনিসের গুদাম ঘর। এক কোণে একটি ঘোরানো লোহার সিঁড়ি। আমরা উপরে উঠে এলাম। সামনে প্রশস্ত ঢাকা বারান্দা। সেখান থেকে সারি সারি রুম। এবার দুজন চারজন মেয়ে-ওয়েট্রেস দেখা গেল। দিলওয়ার আমায় নিয়ে একটি ঘরে ঢুকলো। ঘরের ভিতর একটি ছোটো টেবিল, দুপাশে দুটো দুটো করে চেয়ার।

একজন ওয়েট্রেস এসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করলো, "আপনাদের জন্যে কি আনবো?"

"আমার জন্যে এক বোতল বীয়ার," বললো দিলওয়ার, "তুমি কি নেবে সলিল?"

"কিচ্ছু না," আমি একটু গম্ভীর হয়ে বললাম।

"আচ্ছা, ওর জন্যে একটি লেমন-স্কোয়াশ নিয়ে এসো।"

মেয়েটি ফিরে এলো ট্রে হাতে করে। সামনে প্রথমে নামিয়ে রাখলো গ্লাস, বীয়ারের বোতল আর লেমন স্কোয়াশ, তারপর এক প্লেট লাল টুকটুকে 'কোয়া-সী',—ভাজা নোনতা সিমের দানা।

এসব নামিয়ে রেখে সে কিন্তু চলে গেল না। দিলওয়ারের গ্লাসে বীয়ার ভরে দিলো। লেমন-স্কোয়াশের গ্লাস এগিয়ে দিলো আমার দিকে। দিলওয়ার বীয়ারের গ্লাস তুলে নিলো।

মেয়েটি আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একটি কোয়া-সী তুলে নিয়ে দাঁত দিয়ে খোসা ছাড়িয়ে আমার সামনে ধরে বললো, "খাও।"

আমার বুঝতে কিছু বাকী ছিলো না। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে দিলওয়ারকে বললাম, "আমার বন্ধুরা আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আমি যাই।" ওর কোন কথা না শুনে আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। কিন্তু ভুল করে প্যাসেজ দিয়ে চলে গেলাম অন্য দিকে।

হঠাৎ দেখি একটি ঘরের দরজা খুলে গেল। ভেতরে নীল আলো জ্বলছে। খোলা দরজা দিয়ে প্রশস্ত ঘরের অনেকটা দেখা গেল। কয়েকজন লোক নিঝুম হয়ে পাটির উপর পড়ে আছে কাঠের টুকরোর উপর মাথা রেখে। নাকে লাগলো একটা অসহ্য মৃদু গন্ধ।

অবাক হয়ে দেখি খুব আস্তে আস্তে পা ফেলে বেরিয়ে আসছে অমিয় গাঙ্গুলী। তার মুখ বিবর্ণ, চোখ দুটি কুঁচকোনো, ভেতরের মৃদু আলো থেকে বাইরের কড়া আলোয় বেরিয়ে এসে যেন তাকাতে পারছে না ভালো করে।

"অমিয়, তুমি এখানে!"

সে আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো, চিনবার চেষ্টা

করলো, আচ্ছন্নতা তখনো কাটেনি। খুব ভারী ধরা গলায় জিজ্ঞেস করলো, "দিলওয়ার কোথায় ?"

"তারই সঙ্গে এসেছো বুঝি ?"

সে আচ্ছন্নভাবে মাথা নাড়লো।

"আজ প্রথম ?"

সে মাথা নাড়লো।

কী সাংঘাতিক ছেলে দিলওয়ার, আমি ভাবলাম। জিজ্ঞেস করলাম, "বাড়ি পৌঁছে দিতে হবে ?"

সে ঘাড় নাড়লো।

"একা যেতে পারবে ?"

"হ্যাঁ।"

তাকে নিয়ে আস্তে আস্তে নিচে নেমে এলাম। দিলওয়ার যে ঘরে ছিলো সে ঘরের দরজা বন্ধ। নিচে নেমে একজন ওয়েটারকে জিজ্ঞেস্ করে রেস্তোঁরার পাশ দিয়ে বাইরে লেটার স্ট্রীটের উপর এসে পড়লাম, তারপর অমিয়কে একটি ট্যাক্সিতে তুলে দিয়ে ফিরে এলাম চ্য-থেইনদের কাছে।

আমার গম্ভীর মুখ দেখে বার্টি জিজ্ঞেস করলো, "ছিলে কোথায় এতক্ষণ ?"

"এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো।"

আর কিছু বললাম না। অনেকক্ষণ পরে মা-খিন-স-কে খুব আস্তে আস্তে বললাম, "কাল একবার মিমিকে খবর দিও তো। আমার খুব জরুরী দরকার।"

মিমিকে ঘটনাটা সবিস্তারে না বলে পারলাম না। অমিয়কে দিলওয়ারের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যই ওকে বলা প্রয়োজন। সে যে পাল্লায় পড়েছে মিমি ছাড়া আর কেউ ওকে রক্ষা করতে পারবে না। মা-য়িন-ম্যাও নয়।

আমার কাছে সব শুনে মিমি রাগে জ্বলে উঠলো। বললো,

"কতোবার অমিয়কে বলেছি ভাইসায়েবের সঙ্গে মিশবে না, ওর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকবে। কিছুতেই আমার কথা শোনে না। কি করবো। ভাইসায়েব ওকে এমন মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে যে, সে একেবারে ভুলে যায়। এখন আমি কি করবো বলো, ওকে তো নজরবন্দী করে রাখতে পারি না।"

"আমার কিছু বলার নেই। আমি মনে করলাম, তোমার আর অমিয়র বন্ধু হিসেবে তোমায় জানানো কর্তব্য। তাই জানিয়ে দিলাম।"

"ভালোই করেছো। দেখি আমি কি করতে পারি।"

কয়েকদিন পরে চ্য-থেইন আমায় জিজ্ঞেস করলো, "তোমার সেই ফ্রেণ্ড কোথায়?"

"কোন ফ্রেণ্ড?"

"সেই অমিয় গাঙ্গুলী?"

"কেন?"

"ও মিমির সঙ্গে দেখা করছে না কয়েকদিন ধরে।"

"তা আমি কি করবো?"

"একবার খোঁজ নাও। মিমি বলেছে তোমায় বলতে।"

আমার রাগ হোলো খুব, অমিয় কেন মিমির কাছে যাচ্ছে না, তার খোঁজ নেবো আমি?

"দেখ, ওর অসুখবিসুখও করতে পারে তো! একবার খবর নিয়ে দেখ। মিমি শুধু ওর খবর পেলেই খুশী হবে।"

"বেশ, আমি খবর এনে দেবো।"

"কবে যাবে?"

"দেখি, ইতিমধ্যে যেদিন সময় পাবো—।"

"না, না, আজই যাও।"

"বেশ তাই যাবো।"

"খবর নিয়ে আজ সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়ি এসো। মিমিও আসবে।"

"আচ্ছা।"

বিকেলে গেলাম মা-য়িন-ম্যার বাড়ি।

আমায় দেখে মা-য়িন-ম্যা খুব খুশী। "এসো সলিল, কতোদিন পরে এলে তুমি। এসো, ভেতরে এসে বোসো।"

"অমিয় কোথায়?"

মা-য়িন-ম্যা একটু রাগ করলো। "তুমি কার কাছে এসেছো, অমিয়র কাছে না আমার কাছে?"

"দুজনের কাছেই। তোমার সঙ্গে প্রথম দেখা হোলো বলেই জিজ্ঞেস করলাম অমিয় কোথায়। অমিয়র সঙ্গে আগে দেখা হলে তোমার খবর নিতাম।"

আমার উত্তর শুনে মা-য়িন-ম্যা খুশী হোলো। বললো, "অমিয় রান্না করছে। আমার মা-খিন-চ্যির আজ শরীর খারাপ। অমিয় তো রান্না করতে পারে। তাই তাকেই বসিয়েছি রান্না করতে।"

শুনে আমি অবাক হলাম। অমিয়কে মা-য়িন-ম্যার জন্যে রান্নাও করতে হচ্ছে? জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি রান্না করছো না কেন?"

"আমি? আজ আমার শরীর ভালো নেই। পরশু সারারাত পোয়ে নাচ ছিলো। তখন থেকে শরীরটা খুব ক্লান্ত।"

"অমিয়র সঙ্গে অনেকদিন দেখা হয় নি। ও কি আজকাল বাইরে বেশী যায় না?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"যায় তো আমার সঙ্গেই যায়। আমি আজকাল ওকে বেশী বেরোতে দিই না।"

"সে কি! কেন?"

"ও আজকাল আবার দিলওয়ারের পাল্লায় পড়েছে। সেদিন কোথায় গিয়ে চণ্ডু খেয়ে এসেছে। দিলওয়ারকে পেলে ঝাঁটা পেটা করতাম। সেদিন আমার এমন রাগ হয়েছিলো যে অমিয়কেও

দু-চার থাপ্পড় লাগিয়ে দিয়েছি। ও আমার কাছে কসম খেয়েছে যে ও আর দিলওয়ারের সঙ্গে মিশবে না।"

সে তো ভালো কথা, আমি ভাবলাম, তাই বলে মিমির সঙ্গে দেখা শোনা বন্ধ করা কেন বাপু? অমিয়র উপর তো রাগ হোলোই, মিমির উপরও রাগ হোলো।

আমার গলা শুনে অমিয় বেরিয়ে এলো রান্না ঘর থেকে। হাতে তার হলুদের ছাপ, পরনে আধ ময়লা গেঞ্জি ও সূতির লুঙ্গি, পায়ে কাঠের খড়ম।

"কি খবর সলিল?"

"তোমার খবর নিতেই তো এলাম।"

"তুমি আমার খবর নিতে এসেছো? আশ্চর্য ব্যাপার! আজ প্রায় আট-ন মাসের মধ্যে তুমি আমার খবর নেওয়া তো দরকার মনে করোনি। হঠাৎ আজ কেন?"

"খবর কি আর নিজের জন্যে নিতে এসেছি?"

"তা হলে আবার কার জন্যে।"

"বন্ধু বান্ধবদের জন্যে। সবাই বলাবলি করছে, অমিয় কোথায়, অমিয় কোথায়, ওর কি খবর। সবাই আমায় পাঠিয়ে দিলো তোমার খবর নিতে।"

মা-য়িন-ম্যার সামনে সোজাসুজি কোনো কথা বলা অসম্ভব। আর সে আমায় অমিয়র কাছে একলা রেখে যাবে বলে মনে হচ্ছে না। এমনিতেই তার চোখে একটা সন্দেহের চাউনি। কি যেন তলিয়ে বুঝবার চেষ্টা করছে।

"কোন বন্ধু আমার খোঁজ করছে ভাই?"

মাঝে মাঝে এমন বোকার মতো প্রশ্ন করে অমিয়। আমি বিরক্তি চেপে হেসে বললাম, "কোনো বিশেষ বন্ধু নয়। সবাই। যারা তোমারও বন্ধু, আমারও বন্ধু।"

অমিয়র মুখ দেখে মনে হোলো সে বুঝেছে। মা-য়িন-ম্যা একবার আমার দিকে একবার ওর দিকে তাকাতে লাগলো।

একটু বিষণ্ণ হয়ে অমিয় বললো, "বন্ধুবান্ধবদের বোলো, আমি ইদানীং আর কারো সঙ্গে দেখাশোনা করছি না। শিগগিরই মা-য়িন-ম্যার সঙ্গে মৌলমিন যাবো। মা-য়িন-ম্যা ওখানেই স্থায়ীভাবে বসবাস করবে ঠিক করেছে।"

মিমিকে সোজাসুজি বললাম, "দেখ মিমি, তোমার সঙ্গে আমার বেশী বন্ধুত্ব না থাকলে আমি অনেক আগেই তোমায় মানা করতাম অমিয়র সঙ্গে মিশতে। এদ্দিন বলিনি, এখন আর না বলে পারছি না। ওর মেরুদণ্ড বলে কোনো পদার্থ নেই। কেন ওর জন্যে তোমার এত ভাবনা?"

মিমি ম্লান হাসি হাসলো। "ওর মেরুদণ্ড আছে। কিন্তু সে কথা ও জানে না। সেজন্যেই তার জন্যে আমার এত ভাবনা।"

"কি আছে তার মধ্যে যে তুমি এত পাগল তার জন্যে?"

"তার মধ্যে সুর আছে সলিল, আর যার মধ্যে সুর আছে, তার মধ্যে জীবনের সমস্ত আনন্দ, সমস্ত ব্যথা, সমস্ত সুখ, সমস্ত দুঃখ, সব কিছু আছে। তাই তাকে আমি এত ভালোবাসি।"

"এ তোমার নেশা।"

"নেশা!"—হঠাৎ বিদ্যুতের মতো জ্বলে উঠলো মিমি। "আজ একথা তুমি বললে তাই, আর কেউ বললে তার জান নিয়ে নিতাম।"

আরেকটি রূপ দেখলাম মিমির, কয়েকদিন আগে বোটাটং এ একটি কাঠের বাড়ি জ্বলতে দেখেছিলাম, ঠিক তেমনি। বুঝলাম যে আমি একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছি। চুপ করে রইলাম।

মিমি শান্ত হোলো, শান্ত হয়ে আবার বিষণ্ণ হয়ে গেল। বললো, "আমার উপর রাগ কোরো না সলিল, আমার মন ভালো নেই।"

"না, রাগ আমি করিনি," আমি উত্তর দিলাম, "আমারই ভুল হয়ে গেছে।"

"ওর কি খবর বলো।"

"ওর আর কি খবর। বলেছে, বন্ধুবান্ধবদের বোলো, আমি ইদানীং আর কারো সঙ্গে দেখাশোনা করছি না।"

"কেন?"

"শিগগিরই ও মা-য়িন ম্যার সঙ্গে মৌলমিন যাবে।"

"মৌলমিন যাবে? কেন?"

"মা-য়িন-ম্যা ওখানেই স্থায়ীভাবে থাকবে ঠিক করেছে।"

"অমিয় চলে যাবে মা-য়িন-ম্যার সঙ্গে?" আবার জ্বলে উঠলো মিমি। "তাহলে আমায় কথা দিয়েছিলো কেন? কেন আমায় বলেছিলো, সে আমায় বিয়ে করবে?"

"বিয়ে করবে?" আমি আকাশ থেকে পড়লাম।

"হ্যাঁ, আমায় বিয়ে করবার জন্যে অমিয় মুসলমান হতে পর্যন্ত রাজী। তাই তো আমায় বলেছিলো সে।"

বিস্ময়ে আমার মুখ থেকে কথা সরলো না। অমিয় মুসলমান হতে পর্যন্ত রাজী, মিমিকে বিয়ে করবার জন্যে?

"কাল আমি ভাইসায়েবের সঙ্গে ঝগড়া করেছি খুব," মিমি বলে গেল, "বলেছি, ভাইসায়েব যদি অমিয়র আদত খারাপ করে দেয়, আমি জহর খেয়ে মরবো।"

"কি বললে দিলওয়ার?"

"ভাই সায়েব? ওর দিল বলে কিছু নেই, আছে শুধু একটি পাথরের টুকরো। বললে, আমায় তারিখ জানিয়ে দিও। জহর আমি কিনে এনে দেব।"

বলতে বলতে মিমির চোখে জল এলো।

মা-য়িন-ম্যার মৌলমিন যাওয়া স্থগিত হয়ে গেল। এখন অক্টোবর মাস এসে গেছে। সামনে বার্মিজদের আলোক-উৎসব। কয়েকটা পোয়ে নাচের আমন্ত্রণ পেয়ে গেল মা-য়িন-ম্যা।

মিমির কাছে শুনলাম, অমিয় ওর সঙ্গে আবার দেখা করছে আজকাল।

শুনে মন খারাপ হয়ে গেল। অমিয়কে মিমি এখনো চিনলো না? দু-দিন দেখা করবে, তিনদিন করবে না। জীবনে স্থির সিদ্ধান্ত বলে কিছু নেই। যদ্দিন মা-য়িন-ম্যার আওতায় থাকবে তদ্দিন তার পক্ষে অন্য কোনো সাধারণ মানুষের মতো সহজ জীবন যাপন করবার স্বপ্ন দেখা বৃথা।

কিন্তু মিমিকে কিছু বললাম না। ভাবলাম, আমার কী দরকার ওদের ব্যাপারে মাথা ঘামিয়ে।

ইদানিং দুএকবার দিলওয়ারের বাড়ি গিয়েছিলাম। আমি গেলে সে খুশিই হতো। মিমির সঙ্গে যে আমার একটা সহজ বন্ধুত্ব আছে, সে কথা সে বুঝতে পেরেছিলো। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, খুব রক্ষণশীল প্রকৃতির লোক হওয়া সত্ত্বেও সে এতে কিছু মনে করতো না। আমি যখনই গেছি, সে মিমিকে খবর দিয়ে নিচে ডাকিয়ে এনেছে। অবশ্যি সে বাড়িতে অন্য জায়গার মতো অতো স্বচ্ছন্দ আলাপ হয়নি, মিমি এসে সাধারণ-দু-চারটে কথাবার্তা বলে চায়ের বা শরবতের ব্যবস্থা করে কিছুক্ষণ পরে উঠে চলে গেছে।

"কি জানি, ভাইসায়েব তোমায় বেশ পছন্দ করে," মিমি একদিন বলেছিলো। "এটা ওর প্রকৃতিতে নেই কিন্তু। তাই ঠিক বুঝতে পারি না।"

তখন অক্টোবরের শেষ। দু-তিনদিন ধরে বেশ বাদলা ছিলো। মনসুন বিদায় নেওয়ার আগে তার শেষ বর্ষণ দিয়ে যাচ্ছে।

যদ্দুর মনে পড়ে, সেদিন ছিলো শনিবার। কলেজ থেকে চ্য-থেইন আর মা-খিন-স'র সঙ্গে আহলোন্‌এ মা-লা-লাদের বাড়ি বেড়াতে গেছি। বিকেল নাগাদ মিমিও এসে হাজির হলো। চা-টা খেয়ে গল্প করে সন্ধ্যের পর যখন ওঠার সময় হলো, মিমি আমায় বললে, "চলো, আজ তুমি আমায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।"

"আমি?" আমি একটু অবাক হলাম।

"হ্যাঁ, তাতে কি। জানলে ভাইসাহেবই জানবে, আর তুমি পৌঁছে দিয়েছো শুনলে কিছু মনে করবে না। একলাই যেতাম, কিন্তু সন্ধ্যের পর ওপাড়ায় একলা বাড়ি ফেরা ভাইসায়েব পছন্দ করে না।"

ওর বাড়ির কাছে আসতে মিমি বললো, "এসো, একটু বসে যাবে, ভাইসায়েবের আজ তবিয়ত ঠিক নেই। বাড়িতেই আছে। তুমি এলে খুব খুশী হবে।"

আমি একটু দাঁড়িয়ে ভাবলাম যাবো কি যাবো না।

হঠাৎ দেখি আকাশে ভীষণ মেঘ করে এসেছে। দুড়মুড়িয়ে মেঘ ডাকলো, আর বিদ্যুৎ চমকে গেল আকাশ জুড়ে। মিমি শিউরে উঠে সামলে নিলো।

বললো, "আঁধি আসছে। তোমার তো আর বাড়ি ফেরার কোনো প্রশ্নই হয়না। ভেতরে চলো।"

নিচের সেই ঘরটিতে, যেখানে দিলওয়ার বসে, সেখানে আলো জ্বলছে। ঘরের দরজা ভেজানো। মিমি দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকলো, আমিও ঢুকলাম পেছন পেছন। ঘরে ঢুকে আমরা দুজনেই অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। একপাশে দুটো জনি ওয়াকারের বোতল আর দুটো গেলাস। ফরাশের উপর দিলওয়ার লম্বা হয়ে ঘুমোচ্ছে। এক পাশে অমিয় চোখ বুঁজে মসনদে ঠেস দিয়ে চুপচাপ তার তানপুরোর তারের উপর আঙুল চালাচ্ছে।

তার ঠোঁট নড়ছে একটু একটু। কিন্তু শব্দ নেই। গাঢ় নেশার অবসন্নতা নেমেছে আচ্ছন্ন চেতনায়। সে হয়তো ভাবছে গানই গাইছে সে।

মিমি আর আমি আস্তে আস্তে বাইরে বেরিয়ে এলাম। মিমি দরজা ভেজিয়ে দিলো।

আমি বললাম, "আমি তাহলে যাই।"

মিমি বললো, "না, যেও না। খুব জোর আঁধি চলছে বাইরে। এসো আমরা ওপাশের ঘরে গিয়ে বসি।"

পাশে আরেকটি খালি ঘর। সেখানেও ঘর জোড়া লাইনোলিয়াম, একপাশে ফরাশ পাতা।

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "বাড়ির অন্য কেউ তোমায় এখানে আমার সঙ্গে একলা বসে থাকতে দেখলে কিছু মনে করবে না?"

মিমি হাসলো, "বাড়িতে আছে শুধু দুই ভাবী আর বাবা। ভাবীরা জানে নিচে ভাই সায়েবের কাছে মেহমান এসেছে, ওরা নিচে নামবে না। আর বাবা তো নিজের ঘরেই শুয়ে থাকেন সব সময়। আর আছে এক বুড়ো চাকর। সে আমায় খুব ভালোবাসে। আমায় বড়ো করেছে কোলেপিঠে করে।"

বৃষ্টি নামলো বাইরে। জানলার শার্সী ঝাপসা হয়ে এলো। চঞ্চল বিজলী ঘুলঘুলি দিয়ে উঁকি মারতে শুরু করলো ঘন ঘন।

মিমি উঠে গিয়ে জানলা খুলে দিলো। চুপচাপ একটু দাঁড়ালো জানলার পাশে। তারপর আস্তে আস্তে বললো, "ঘরে জল আসবে। তা' আসুক। এই বৃষ্টি আমার খুব ভালো লাগছে।"

আমি তখন কি করে বসে থাকি ফরাশের উপর। উঠে গিয়ে জানলায় ওর পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম, ওর চোখে জল।

"একি মিমি, তোমার চোখে জল কেন?"

"এমনি," মিমি খুব নিচু গলায় বললো, "কোনো কারণ নেই। শুধু এমনি। চোখ জলে ভরিয়ে আনতে ভালো লাগছে। একটা শের মনে পড়ছে, শুনবে?

দিল হী তো হৈ ন সঙ্গোখিশত্
দর্দ সে ভর ন আয়ে কোঁ,
রোয়েঙ্গে হম হজার বার
কোঈ হমে রুলায়ে কোঁ।"

শুনে আমি চুপ করে রইলাম অনেকক্ষণ। তারপর একসময় জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা মিমি, আজ থেকে তিন শো বছর আগে যদি তোমার সঙ্গে আমার আলাপ হোতো, দিল্লির কোনো মহলের

খিড়কির পাশে এমনিভাবে তোমার সঙ্গে একলা দাঁড়িয়ে থাকার সুযোগ পেতাম আমি?"

অস্ফুট সাড়ায় মিমি বললো, "কথা বোলো না সলিল, কথা তো গত তিন-চার মাস ধরে অনেক বলেছি, আজ কোনো কথা আমরা নাই বা বললাম।"

আমি আর কিছু না বলে একটি হাতে ওর কোমর জড়িয়ে ধরলাম। সে একটি হাত আমার কাঁধে তুলে দিয়ে মাথাটি রাখলো অন্য কাঁধে। বললো, "সলিল, তুমি আমার খুব বন্ধু। আমার এরকম বন্ধু নেই। আমার সব দুঃখের কথা, সব কষ্টের কথা একমাত্র তোমাকেই বলতে পারি, আর কাউকে বলতে পারি না।"

"হ্যাঁ মিমি, আমরা খুব বন্ধু," আমি খুব ভারী গলায় বললাম। মনে হোলো কে যেন আমার বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে রেখেছে।

কিছুক্ষণ এমনি কাটলো। একটু যেন নিবিড় মনে হোলো মিমির সান্নিধ্য।

"সলিল", মিমি বললো, "তুমি যেন আমার সঙ্গে অন্য ছেলেদের মতো হয়ো না। আমরা শুধু বন্ধু।"

আমি আস্তে আস্তে বললাম, "কথা বোলো না মিমি। কথা তো এই তিন চার মাস অনেক বলেছি। আজ কোনো কথা আমরা নাই বা বললাম।"

মিমি একটু হাসলো। আমার বুকের স্পন্দন রেলের ইঞ্জিনের মতো দ্রুততর হতে লাগলো।

সে হঠাৎ বললে, "দাঁড়াও, শোনো। ওই শোনো—"

"কি? কি শুনবো?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"শুনতে পাচ্ছো না? কান পেতে শোনো, কী সুন্দর!"

কান পেতে শুনলাম। কখন জেগে উঠে মিঞামল্লারের আলাপ ধরেছে অমিয় গাঙ্গুলি। খোলা জানলা দিয়ে বৃষ্টির মৃদু ছাট অতিক্রম করে দূরাগত অথচ স্পষ্ট ভেসে এলো।

হঠাৎ আমার একটা আক্রোশ জাগলো ভারতীয় রাগ সঙ্গীতের উপর, কিন্তু একটু পরেই একটা অদ্ভুত স্বপ্নময় পরিবেশে মন বেদনাতুর হয়ে উঠলো। অমিয় গান ধরেছে,—উমড় ঘুমড় ঘেরি বরসে বাদর……

সেদিন বাদলার রাতে মিঞামল্লারের গহনতায় মিমি হারিয়ে গেল। এক মুহূর্তের জন্যে সে অনেক কাছে এসেছিলো, আবার হারিয়ে গেল। কিন্তু কোনো আক্ষেপ এলো না মনে। মিমির পাশে দাঁড়িয়ে আমি অমিয়র গান শুনলাম —।

হঠাৎ শিউরে উঠলো আমার মন। আমি মিমিকে ডাকলাম, "মিমি—মিমি—।" তার কাঁধ ধরে ঝাঁকুনি দিলাম দুবার। সে সাড়া দিলো না। সে গান শুনছে চোখ বুজে।

সমস্ত পৃথিবী ভেসে গেল গানের বন্যায়। আমি আর থাকতে পারলাম না। মনে হোলো আমায় বাঁচতে হবে এই মায়াজাল থেকে। গানের কুহকী মায়ায় রূপকথার পাষাণ রাজপুত্রের মতো এখানে পড়ে থাকতে মন চাইলো না।

মিমির ঘর দ্রুত পেছন দিকে সরে চলে গেল আমার কাছ থেকে। দিলওয়ারের ঘরে অমিয়র গান আমার পেছনে আরো অস্পষ্ট হয়ে এলো। বাইরের রাজপথ দুলে উঠলো আমার সামনে। অঝোর বৃষ্টি, রাস্তায় জল জমে উঠছে। ঝাপসা হয়ে গেছে রাস্তার আলো। সামনে একটি খালি ঘোড়ার গাড়ি পেয়ে গেলাম। সচল পৃথিবী যেন নিজের কক্ষপথে একবার একটু থামলো। ভেসে এলো বাড়ির ভেতর থেকে—

উমড় ঘুমড় ঘেরি বরসে বাদর
চমকে ছমকে চমকে বিজুরিয়া
চলতে পবন পুরবৈয়া মা ঝুম—

চঞ্চল পুরবাইয়ার দুরান্ত আহ্বান এলো আমার মনে। ঘোড়ার গাড়ি খুব দ্রুত চলতে শুরু করেছে। ঝাঁকুনি দিয়ে দিয়ে আলোড়িত করছে গাড়ির ভেতরের অন্ধকার। গলি থেকে বেরিয়ে এলাম।

সামনের মোগল স্ট্রীট পেছন দিকে আবছায়া হয়ে মিলিয়ে গেল। মোগল স্ট্রীটের পেছন পেছন ছুটলো মণ্টগোমেরি স্ট্রীট। দীর্ঘ তার বিস্তৃতি। ছোটা আর শেষ হয় না। তার সঙ্গে এপাশ ওপাশ দিয়ে ডাইনে বাঁয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল স্কটমার্কেট, রেল স্টেশন, সেন্টপলস, জুডাইজিক্যাল স্ট্রীট, ক্রীক স্ট্রীট, টমসন এ্যাভিনিউ, এবং আরো অনেক ছোটো ছোটো অলি গলি। চারিদিকে ঝমঝম বৃষ্টি। পথ একেবারে জনবিরল হয়ে আছে। পজুনডওঙ কাছে এগিয়ে এলো।

যে বাড়ির সামনে গাড়ি এসে থামলো সেও অনেকদিনের চেনা বাড়ি। তবু যেন নতুন মনে হোলো তাকে। দরজার উপর মৃদু করাঘাত করলাম সশঙ্ক অনিশ্চয়তায়।

দরজা খুলে গেল। কেরোসিনের ছোট্টো বাতি হাতে করে দাঁড়িয়েছে মা-য়িন-ম্যা। বললে, "এসো। আমি জানতাম একদিন তুমি এমনি ভাবে আসবে।"

আমি ভেতরে ঢুকলাম। পেছনে দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

নিঝুম বর্ষায় নিশীথ নগরী পেছনে পড়ে রইলো।

ওপরে উঠে এসে অমিয়র ঘরে বসলাম।

মা-য়িন-ম্যা একটি ট্রাঙ্কের উপর কেরোসিনের বাতিটি রাখলো। তারপর আমার সামনে পাটির উপর এসে বসলো। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো আমার মুখের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করলো, "আজ তোমার মনে খুব কষ্ট, না?"

আমি চুপ করে রইলাম, কোনো উত্তর দিলাম না।

"আজ অমিয় বাড়ি নেই।"

"আমি জানি", আমি বললাম।

মা-য়িন-ম্যা আমার দিকে তাকিয়ে দেখলো। কি বুঝলো কে জানে। তারপর নিজের মনে বলে গেল, "এখনো ফেরেনি। বাইরে যা বৃষ্টি, কখন ফিরবে কে জানে।"

আমার চোখ মা-য়িন-ম্যার চোখের উপর স্থির হয়ে দাঁড়ালো। হঠাৎ দেখি তার কাজল চোখে মার্টাবান উপসাগরের মনসুন জেগেছে। স্বর্ণ-প্যাগোডার দেশ সে-চোখ দুটোয় হারিয়ে গেল। মনে হোলো যেন প্রথম বর্ষার জলে স্নান করবার মৌন মেঘমন্দ্র আহ্বান জাগলো সে-চোখে।

কি জানি কেন, হঠাৎ শিউরে উঠলাম।

মা-য়িন-ম্যা আস্তে আস্তে বললো, "তুমি যে আজ এসেছো, আমার খুব ভালো লেগেছে। কিন্তু আজ তুমি বাড়ি যাও। বাইরে খুব বৃষ্টি। তবু তুমি এখানে বেশীক্ষণ থেকো না। আজ তোমার মনে খুব কষ্ট। এ কষ্ট একা একা সইতে হয়।"

আমি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম।

মা-য়িন-ম্যা আলো হাতে আমায় নিচের দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিলো। আমি বেরিয়ে আসবার সময় বললো, "অমিয় ফেরেনি, কখন ফিরবে জানি না। যতক্ষণেই ফিরুক, আমি একলা জেগে তার প্রতীক্ষা করবো।"

অক্টোবর মাস কেটে গেল।

সেদিন মা-য়িন-ম্যার ওখান থেকে বাড়ি ফেরার সময় অনেকক্ষণ গাড়ি পাইনি। বেশ কিছুক্ষণ জলে ভিজতে হয়েছিলো। তারপর ইনফ্লুএঞ্জা হয়ে বিছানায় পড়েছিলাম সাত আট দিন। জ্বর সারবার পরও শরীরটা এমন দুর্বল ছিলো অক্টোবরের ছুটির পরও কয়েকদিন কলেজে যাইনি। মনও ভালো ছিল না। কারো সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে করতো না, কারো সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলতে ভালো লাগতো না। শুধু জানলার ধারে চেয়ার টেনে বসে চুপচাপ বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে ভালো লাগতো।

মাঝে মাঝে ভাবতাম, আমার খোঁজ নিতেই বা কেউ আসছে না কেন? মনকে বোঝাতাম, আমার সঙ্গে কারই বা কী এমন গভীর সম্পর্ক যে দশ পনেরো দিন আমার কোনো খবর নেই

বলে খোঁজ করতে আসবে। কলেজের বন্ধুরা কলেজেরই বন্ধু, কলেজে যতোক্ষণ আছি—ততক্ষণ। চোখের আড়াল হলেই মনের আড়াল।

এসে গেল নভেম্বর মাস।

নভেম্বরের প্রথম হপ্তা পার হয়ে গেল।

সোমবার দিন কলেজে গিয়ে চ্য-থেইনের খোঁজ করলাম। শুনলাম, ওরা সবাই অক্টোবরের ছুটিতে মেম্যো গেছে, এখনো ফেরেনি, তবে এসে যাবে কয়েকদিনের মধ্যেই। লুসি হান, রোজমারী মেহতা কি পেগি আরভিন ওরা কেউ মিমির খবর দিতে পারবে না। ওর যোগাযোগ সাধারণত মা-লা-লা আর মা-খিন-স'র সঙ্গেই।

মাঝখানে কয়েকদিন কলেজে যাইনি বলে অনার্স ক্লাসের বাকী নোটগুলো টুকে নেওয়ার চাপ পড়েছিলো খুব। হপ্তার দিনগুলো পড়াশুনোর কাজেই কেটে গেল।

রোববার সকাল বেলা মণ্টগোমেরি স্ট্রীটের মোড়ের সেই কাকা টী-শপে বসেছিলাম। সেখানে এসে উপস্থিত হোলো দিলওয়ার।

"কোথায় ছিলে এদ্দিন," সে জিজ্ঞেস করলো, "আমি কয়েকদিন ধরে তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছি। তোমার বাড়িটা ঠিক চিনি না, তা নইলে তোমার বাড়িতেই যেতাম।"

"অসুখ করেছিলো।"

"তাই নাকি! হ্যাঁ, তোমায় একটু রোগা দেখাচ্ছে বটে।" খানিকক্ষণ সাধারণ দু-চারটে কথার পর দিলওয়ার হঠাৎ বললো, "একদিন মা-য়িন-ম্যার সঙ্গে দেখা করতে যেও। ওর খুব মন খারাপ।"

"কেন? কি হোলো মা-য়িন-ম্যার?" আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম।

"ও! তুমি জানো না বুঝি? অমিয় মা-য়িন-ম্যার ওখান থেকে পালিয়ে গেছে।"

"পালিয়ে গেছে!" প্রথম প্রশ্ন করলাম বিস্ময়ের সঙ্গে। প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি করতে গিয়ে আনন্দ গোপন করতে পারলাম না, "পালিয়ে তাহলে গেছে?"

"হ্যাঁ, গেছে শেষ পর্যন্ত," দিলওয়ার একটু গম্ভীর হয়ে উত্তর দিলো, "এবং আমার মনে হয় ও আর মা-য়িন-ম্যার কাছে ফিরবে না।"

"ও কোথায় আছে এখন? ওর মায়ের কাছে?"

"না, সেখানে নেই। কোথায় আছে আমি জানি না। আমি নিজেই ওকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।"

"কেন?"

"ওকে আমার দরকার।"

উঠে যাওয়ার সময় দিলওয়ার হঠাৎ বললো, "মিমিও বোধ হয় তোমার সঙ্গে দেখা করতে চায়। তোমার যদি সময় হয় তো আমার বাড়ি এসো। কারণ মিমির সঙ্গে তো আর অন্য কোথাও দেখা হবে না।"

"কেন?"

"ওকে আমি আজকাল আর বাড়ি থেকে বেরোতে দিই না। আমায় একটু কড়া হতে হয়েছে। আমি ওর বিয়ের ঠিক করেছি। বেশ খানদানী ঘরের ছেলে। পয়সাকড়ি আছে। এখন কিছুদিন ওর আর বাড়ির বাইরে বেরোনো উচিত নয়। বিয়ের পর ওর স্বামী যদি ওকে বেরোতে দেয় তো ঠিক আছে। আমার কি?—আচ্ছা, এসো একদিন। হ্যাঁ একটা কথা মনে রাখলে ভালো হয়। তুমি যখন আমাদের বাড়ি আসবে তখন তুমি আমাদের বন্ধু, অমিয় গাঙ্গুলির নয়। তখন তুমি অমিয় গাঙ্গুলিকে চেনো না।"

মা-য়িন-ম্যার ওখান থেকে চলে এসে অমিয় কোথায় আছে কেউ

জানতো না। আমিও জানতে পারতাম না যদি না অমিয় নিজেই আমার সঙ্গে দেখা করতে চাইতো।

একদিন সে ইউনিভার্সিটি কলেজে এসে আমায় ধরলো।

আমরা দুজন টাকশপে গিয়ে বসলাম।

আমি খানিকক্ষণ চুপচাপ অপেক্ষা করলাম যদি অমিয় নিজের থেকে কোনো কথা পাড়ে। দেখলাম, অমিয় চা খেতে খেতে সাধারণ অন্যান্য কথাবার্তা বলছে। আমি যা জানতে চাই, সে সব কথার ধার দিয়েও যাচ্ছে না।

শেষ পর্যন্ত আমি নিজের থেকেই কথা পাড়লাম।

"মিমির সঙ্গে আমার অনেকদিন দেখা হয়নি।"

"আমি জানি," অমিয় উত্তর দিলো।

"আমি কয়েকদিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় খুব ভুগেছি।"

"সে খবর আমি জানতাম না। জানলে নিশ্চয়ই তোমার বাড়ি গিয়ে দেখা করতাম।"

"কেন ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিলো জানো?"

"না, কেন?"

"একদিন খুব জলে ভিজেছিলাম।"

"তাই নাকি? কেন?"

"মা-য়িন-ম্যার কাছে গিয়েছিলাম। ফেরার পথে জলে ভিজলাম গাড়ির জন্যে অপেক্ষা করতে গিয়ে।"

"মা-য়িন-ম্যার কাছে গিয়েছিলে? কবে?"

"অক্টোবরের মাঝামাঝি একদিন খুব বৃষ্টি হয়েছিলো, মনে আছে?"

হঠাৎ একটু গম্ভীর ও বিষণ্ণ হয়ে গেল অমিয়। উত্তর দিলো, "হ্যাঁ, মনে আছে। সেদিন—", বললে বলতে সে থেমে গেল।

"সেদিন আমি মিমিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গিয়েছিলাম। তুমি সেখানে ছিলে দিলওয়ারের সঙ্গে। হুইস্কি খেয়ে একবারে বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলে।"

অমিয় বিস্ময়ের সঙ্গে আমার দিকে তাকালো। "তুমিও গিয়েছিলে? জানতাম না তো!"

"মিমির সঙ্গে কিছুক্ষণ ছিলাম। তুমি মিঞামল্লার গাইতে শুরু করলে। আমি বেরিয়ে এলাম। কেন জানিনা, সোজা চলে গেলাম মা-খিন-ম্যার কাছে। দেখি, ওই বৃষ্টিতে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে তোমার পথ চেয়ে আছে।"

অমিয় মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে নিলো। তারপর বললো, "তোমায় অনেক কথা বলবার আছে সলিল, তবে এখানে নয়। চলো কোকাইন লেকের পাড়ে গিয়ে বসি।"

"চা শেষ করেনি আগে?"

"হ্যাঁ, নাও।"

চুপচাপ কিছুক্ষণ চা খেলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি এখন আছো কোথায় অমিয়?"

"ঘর নিয়েছি।"

"কোথায়?"

"লাম্‌ড-য়। কাউকে বোলো না।"

শুনলাম তাকে ঘর যোগাড় করে দিয়েছিলো চ্য-থেইন আর মা-লা-লা। মিমির একান্ত অনুরোধেই ওরা এটা করেছিলো। তাকে দিলওয়ার খুঁজে বেড়াচ্ছে। যদি খুঁজে পায়, অমিয় বিপদে পড়তে পারে, কারণ দিলওয়ারের মতলব ভালো নয়। মিমি জানতে পেরেছিলো যে দিলওয়ার অমিয়র পেছনে গুণ্ডা লাগিয়েছে।

তাই লাম্‌ড-র খাঁটি বার্মিজ পাড়ায় তাকে ঘর খুঁজে দিয়েছিলো চ্য-থেইন। একটি ভারতীয় নেই সে পাড়ায়। তার উপর সে পাড়া দোবামা পার্টির কর্মীদের একটা মস্ত বড় কেন্দ্র। সুতরাং অমিয়র কোনো ভয় ছিলো না। সে সব সময় থাকতোও বার্মিজ পোশাক পরে, কথাবার্তা বলতো বার্মিজ ভাষায়। শহর কেন্দ্রের ভারতীয় অঞ্চলে একেবারে আসতোই না।

"মিমির সঙ্গে তোমার দেখা হয়?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মিমিকে নিয়ে তার সঙ্গে এ পর্যন্ত কোনোদিন কোনো আলোচনা হয়নি। আমি তাকে কোনোদিন জানতে দিইনি যে, মিমির সঙ্গে তার যে কোনো পরিচয় আছে সে আমি জানি, সেও আমায় কোনোদিন কিছু বলেনি। আজ সোজাসুজি জিজ্ঞেস করে বসলাম কোনো কুণ্ঠাবোধ না করে। সেও অকুণ্ঠিত ভাবেই উত্তর দিলো।

"না, কয়েকদিন দেখা হয়নি। তবে ওর খবর আমি পাই। চলো, লেকের দিকে যাই। ওখানে নিরিবিলি বসে তোমার সঙ্গে অনেক কথা বলবার আছে।"

কোকাইন লেকের যেদিকটায় আমরা গিয়ে বসলাম, সেদিকটা বেশ জংলা ও নিরিবিলি। দূরে দূরে অনেকে সাঁতার কাটছিলো, নৌকো বাইছিলো, জটলা করছিলো, কিন্তু এদিকে কেউ ছিলো না। শুধু দু-তিনটি পাখি পাখা ঝাপটা দিচ্ছিলো একটি আমগাছের ডালে বসে।

অমিয় সেখানে বসে আমায় শোনালো মা-য়িন-ম্যার ওখান থেকে বাসা ভেঙে চলে আসার কাহিনী। না, সে পালিয়ে আসেনি। মা-য়িন-ম্যাকে বলেই চলে এসেছিলো।

শেষ কয়েক হপ্তা তার কাছে অসহ্য হয়ে উঠেছিলো মা-য়িন-ম্যার সঙ্গ। মা-য়িন-ম্যা তাকে ভালো নিশ্চয়ই বাসতো, তাতে অমিয়র কোনো সন্দেহ ছিলো না, কিন্তু সেটা ভালোবাসার এমন একটা সর্বগ্রাসী বিকৃত রূপ যে মা-য়িন-ম্যার জন্যে তার যেটুকু ভালোবাসা ছিলো সেটা একেবারে মুছে গিয়েছিলো। সুতরাং তার কাছে অসহনীয় উৎপীড়ন মনে হোতো তার সম্বন্ধে মা-য়িন-ম্যার দুশ্চিন্তা, সন্দেহ এবং বাড়াবাড়ি।

"সেই বাদলা সন্ধ্যার কথা আমি ভুলবো না," অমিয় বলছিলো।

সেদিন দুপুরবেলা মোগল স্ট্রীটের কাছে একজায়গায় গানের আসর ছিলো। বিকেলবেলা ভাঙলো। তানপুরো হাতে মোগল

স্ট্রীট দিয়ে যখন ফিরছিলো তখন হঠাৎ দেখা হয়ে গেল দিলওয়ারের সঙ্গে।

"আরে গাঙ্গুলী, কি খবর, কি খবর? এদিকে কোথায়?—চলো, আমার বাড়ি চলো। অনেকদিন তোমার গান শুনিনি।"

তখন আকাশে খুব মেঘ করে আসছে। বেশ জোর বৃষ্টি আসবে। ওই বৃষ্টিতে তানপুরো হাতে বাসের ভিড় ঠেলে উঠবার ইচ্ছে অমিয়র ছিলো না। দিলওয়ারও চেপে ধরলো।

"একটি পুরো বোতল জনি ওয়াকার আছে।"

শুনে অমিয়র যেটুকু অনিচ্ছা ছিলো তাও কেটে গেল। সে দিলওয়ারের সঙ্গে ওর বাড়ি এলো।

দিলওয়ার ওকে খুব আপ্যায়ন করে হুইস্কি খাওয়ালো। তারপর নানা কথাবার্তার পর এক সময় বললো, খুব মিষ্টি মোলায়েম সৌজন্যতায় ভরা ভাষায়, "ভাই গাঙ্গুলী, তোমার সঙ্গে বেশী দেখা হয় না। একটা কথা তোমায় বলবো ভাবছিলাম। আবার কবে সে কথা বলার সুযোগ হবে জানিনা। তাই আজই বলে ফেলি কথাটা। তুমি আমার বন্ধু, কিছু মনে কোরো না। কথাটা শুনে তোমার রাগ হতে পারে, কিন্তু একটা কথা মনে রেখো, তোমার আমার মধ্যে যাই হোক না কেন, আমাদের বন্ধুত্ব কোনোদিন নষ্ট হবে না।"

অমিয় শুনতে চাইলো কি ব্যাপার।

"দেখ। সব কথা খোলাখুলি বলাই ভালো। আমি জানি তুমি আমার বোনের সঙ্গে দেখা করো। সেটা আমার ভালো লাগে না। যে জিনিস হয় না, হতে পারে না, হওয়া উচিত নয়, তাই নিয়ে দুঃখ করে কষ্ট পেয়ে তো কোনো লাভ নেই। মিমি ছেলেমানুষ, ও বোঝে না, ওকে আমি সোজাসুজি বলতেও চাই না। তোমার বয়েস হয়েছে, বুদ্ধি আছে, জ্ঞান আছে। তোমারই বোঝা উচিত। তুমি মিমির সঙ্গে দেখা করা ছেড়ে দাও। ও আমার বাড়ির মেয়ে। আমি তো আমার বাড়ির কোনো রকম বেইজ্জতী সহ্য করবো না।

আমি ওর বিয়ের ঠিক করেছি। যা হবার হয়ে গেছে। কিন্তু এবার তোমায় থামতে হবে।"

দিলওয়ারের কথা শুনে অমিয় চুপ করে রইলো। কোনো উত্তর দিলো না।

"আমি জানি তোমার খুব তগলিক্ হচ্ছে, কিন্তু কি করা ইয়ার, তুমি দেখো আখেরে তোমার ভালো হবে।"

এবারও কোনো উত্তর দিলো না অমিয়।

"আর যদি তুমি সত্যিই আমার কথা কানে না তোলো, তা হলে বুঝতেই পারছো, আমায় অন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, তুমি আমার বন্ধু, সেটা খুব অপ্রীতিকর হবে, কিন্তু আমি কি করবো বলো। শুধু বন্ধু হিসেবে তোমায় আগের থেকে জানিয়ে রাখছি, আমার খুব কষ্ট হচ্ছে তোমায় একথা বলতে, কিন্তু না বলে পারছি না বলেই বলছি,—আমার কথা যদি শুনতে না চাও, তাহলে মা-য়িন-ম্যাকে বোলো, তুমি যে এর পর তিন চার মাস হাসপাতালে পড়ে থাকবে তার খরচা যোগাড় করে রাখতে। ভাই, জীবনে কতোরকম এ্যাকসিডেণ্ট হয়। আমি তোমায় আগে থাকতে শুধু সাবধান করে দিতে পারি, আর কি করতে পারি বলো।"

অমিয়র মুখ রাঙা হয়ে গেল। এবারও কিছু বললো না।

"দেখ গাঙ্গুলী, মা-য়িন-ম্যা তোমায় প্যার করে, ওই তোমার পক্ষে ভালো। একটি ভালো মেয়ে তোমায় রেখেছে, তোমায় কোনো কিছুর জন্যে কিছু ভাবতে হয় না। এর চাইতে বেশী জীবনের কাছে তোমার মতো লোক কী প্রত্যাশা করতে পারে বলো।"

অমিয় উঠে পড়ছিলো। দিলওয়ার তাকে ধরে বসালো। "আ-হা-হা, রাগ করছো কেন ইয়ার। তোমায় আমি খুব প্যার করি বলেই, এই সব শুভ কথা বললাম। তা নইলে তো তুমি কানে তুলবে না। এসো এই বোতোলটা শেষ করি। আমাদের এত ছোটো এই জীবন, কেন ঝগড়া-ঝাপ্টা করে দুঃখ পাওয়া। যেই কদিন বাঁচো, ফুর্তি করো।"

বাইরে বৃষ্টি পড়ছে একটু একটু। অমিয়কে কিছুতেই ছাড়লো না দিলওয়ার। হুইস্কি ভরে দিলো তার গেলাসে।

অনেকক্ষণ পরে অমিয় জিজ্ঞেস করলো, "মিমির বিয়ের ঠিক করেছো?"

"হ্যাঁ।"

"কোথায়?"

"খুব ভালো ঘরে। ওদের অনেক পয়সা, ছেলে খুব ভালো, সুন্দর। দেখ, তুমি হিন্দু, তুমি তো শাদী করতে পারবে না আমাদের ঘরে। তবে কেন এই কষ্ট পাওয়া, মেয়েটিকে কষ্ট দেওয়া। তুমি কি চাওনা মিমি সুখী হোক? তুমি দেখো, এ কষ্ট তুমিও দুদিনে ভুলে যাবে, সেও ভুলে যাবে।"

অমিয় চুপচাপ হুইস্কি খেয়ে গেল।

তারপর জিজ্ঞেস করলো, "মিমি বিয়ে করতে রাজী হয়েছে?"

"দেখ, বিয়ের কথা পাড়লে সংসারের কোন মেয়ে সুখী হয়ে নাচে? ওরা সবাই কাঁদে, বিয়ে করবো না করবো না বলে চিল্লায়, তারপর বিয়ে করে, বিয়ের পর সব ভুলে যায়।"

দুজনে আবার চুপচাপ হুইস্কি খেয়ে গেল। শেষ হয়ে এলো বোতলের অনেকটা। দিলওয়ার বললো, "আমার ভাই খুব নেশা হচ্ছে। আমি চোখ বুজে শুয়ে পড়ছি। অনেকদিন তোমার গান শুনিনি। আজ বৃষ্টির দিন। একটা মিঞা-কি-মল্লার শোনাও।"

নেশা ধরছিলো অমিয়রও, ব্যথার নেশা, হুইস্কির নেশা, সুরের নেশা, সে আস্তে আস্তে তানপুরোটা তুলে নিলো।

যখন বাড়ি ফিরলো তখন রাত এগারোটা। বৃষ্টি অনেকটা ধরে এসেছে। বাড়ি এসে দেখে হাতে কেরোসিনের ল্যাম্প নিয়ে মা-য়িন-ম্যা দাঁড়িয়ে আছে দরজার কাছে।

"কোথায় গিয়েছিলে?"

"একজন বন্ধুর বাড়ি।"

"এত রাত করলে কেন?"

"বৃষ্টির জন্যে আসতে পারিনি।"

"বৃষ্টি আজ সারাদিন ধরেই হচ্ছে। আমি তোমায় তখনই বেরোতে মানা করেছিলাম।"

"যাই, দেরি হয়ে গেছে এখন আর কি করবো।"

"আমি কি তোমার বাঁধা মেয়েমানুষ যে তুমি যখন খুশি বাড়ি আসবে, যতক্ষণ খুশি বাইরে থাকবে!" খুব ঝাঁঝালো শোনালো মা-য়িন-ম্যার গলার স্বর।

"তুমি আমার কি মা-য়িন-ম্যা?" অমিয় খুব গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করলো।

মা-য়িন-ম্যার কাছে নতুন মনে হোলো অমিয়র গলার গুরু-গম্ভীরতা। তখন ভয় পেয়ে সে একটা ভুল করলো। চিৎকার করে বলে উঠলো, "বেশ, আমি তোমার কেউ নই। যদি তোমার অন্য কেউ থাকে তো তার কাছে গিয়ে থাকো। আমার এখানে কেন? আমার বাড়িতে থাকবে, আমার পয়সায় খাবে, আর অন্য ছুকরীর কাছে গিয়ে ফুর্তি করবে, এটা ঠিক নয়।"

"হ্যাঁ মা-য়িন-ম্যা, আমি চলেই যাবো এখান থেকে।"

"বেশ যাও," বলেই খেয়াল হোলো যে অমিয় আজ প্রথম বললো এ কথাটা। ওর দিকে তাকিয়ে রইলো কিছুক্ষণ, তারপর গলাটা কোমল করে বললো, "অমিয়, আমি রাগ করে কিছু বললে তুমিও কি রাগ করবে?"

"তুমি সত্যি কথাই বলেছো মা-য়িন-ম্যা। আমিও রাগ করে বলিনি। অনেকদিন ধরেই ভাবছিলাম। আজ বলে ফেললাম।"

মা-য়িন-ম্যা কিছুক্ষণ পাথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর বললো, "বেশ, যাও, আমি আটকাবো না। কখন যাবে। এখন এই বৃষ্টিতে নিশ্চয়ই নয়।"

"কাল সকালে উঠেই চলে যাবো।"

"সকালে উঠেই চলে যাবে? আচ্ছা, কিন্তু চা না খেয়ে যেতে পারবে না।"

রাত কেটে গেল।

সকাল বেলা ঘুম ভেঙে অমিয় দেখে মা-য়িন-ম্যা অনেক আগেই জেগে চা তৈরী করতে বসেছে।

দুজনে একসঙ্গে বসে চুপচাপ চা খেলো। মা-য়িন-ম্যা অমিয়র জিনিসপত্র গুছিয়ে দিলো, বিছানা বেঁধে দিলো। তারপর মা-খিন-চ্যিকে পাঠিয়ে ঘোড়ার গাড়ি ডাকিয়ে আনালো।

যাওয়ার সময় অমিয় বললো, "আমি যাচ্ছি।"

"আচ্ছা।"

অমিয় গাড়িতে উঠে বসতে, সে আস্তে আস্তে দরজা বন্ধ করে দিয়ে উপরে চলে গেল।

সন্ধ্যে হয়ে আসছে। অমিয় বললো, "আমার ওখানে চলো। আমার নতুন ঘরকন্না দেখবে। কি যে অদ্ভুত ভালো লাগছে আজকাল, বোঝাতে পারবো না। যা খুশি করতে পারি, যখন খুশি বেরোতে পারি, যখন খুশি ফিরতে পারি। কেউ নেই কোনো কথা বলবার, কোনো কৈফিয়ত চাইবার। একটা আশ্চর্য শান্তি। এরকম অনেকদিন হয়নি।"

আমি ভাবছিলাম মা-য়িন-ম্যার কথা। কোনো কথা না বলে আস্তে আস্তে উঠে পড়লাম। লেক-অঞ্চল থেকে বেরিয়ে পড়ে আমরা হাঁটতে হাঁটতে চলে গেলাম বড়ো রাস্তার দিকে। তারপর প্রোম রোডের ওদিকে বার্মিজ সার্ভিস বাস ধরে চলে এলাম লাম্‌ড।

একটা সরু বর্মিজ-অধ্যুষিত গলিতে একটি কাঠের বাড়ির একতলায় অমিয় ঘর নিয়েছে। চারপাশ থেকে ভেসে আসছে রান্নার গন্ধ। বাচ্চা কাঁদছে সামনের বাড়িতে। দরজার তালা খুলে অমিয় আমায় ঘরের ভিতর নিয়ে গেল।

ভেতরটা অন্ধকার। এ পাড়ায় সব বাড়িতে ইলেকট্রিক নেই, অমিয়র ঘরেও নেই। সে দেশলাই ধরিয়ে একটি কেরোসিনের টেবিল-ল্যাম্প জ্বালালো। ঘরের ভিতর আসবাবপত্র কিছু নেই। একটি পাটির উপর ওর বিছানাটা গোটানো। একপাশে টিনের ট্রাঙ্ক। তানপুরোটা দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে দেওয়ালের এক-কোণে। পেরেকে তোয়ালে আর দু-একটা জামা টাঙানো।

"তোমার খাওয়া-দাওয়া?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"বাইরের স্টলে।"

"অসুবিধে হচ্ছে খুব?"

"কিচ্ছু না। অনেকদিন এরকম আরাম পাইনি।"

ওপরের দোতলায় একটি বাচ্চা মেয়ে সুর করে বার্মিজ বর্ণমালা কাজি-খাগোয়ে পড়ছে। পাশের বাড়িতে একটি ছেলে ব্যাঞ্জো বাজিয়ে গান গাইছে।

"তোমার রেওয়াজ করতে অসুবিধে হয় না?"

"আজকাল বেশী রেওয়াজ করতে পারি না। সন্ধ্যের পর একটুখানি করেনি। এ পাড়ায় বেশী কালোয়াতি করলে আমায় দু-দিনেই তাড়িয়ে দেবে। তবে পাড়াপড়শীরা খুব ভালো। কো-চ্য-থেইন আর মা-লা-লা আমায় ওদের বন্ধু বলে পরিচয় দেওয়াতে খুব খাতির করে, খোঁজ খবর নেয়। পাড়ার ছেলেদের উপর চ্য-থেইনের খুব প্রভাব। আমি জানতাম না, ও নাকি দোবামার খুব নাম করা কর্মী।"

"হ্যাঁ, ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট্স্ ইউনিয়নের নামজাদা ছেলে।"

"আবার চা খাওয়া যাক, কি বলো," বলে অমিয় একটি কেটলি হাতে বাইরে বেরিয়ে গিয়ে সামনের চায়ের দোকান থেকে চা নিয়ে এলো।

তারপর চা খেতে খেতে এক সময় জিজ্ঞেস করলো, "আচ্ছা সলিল, মিমির সঙ্গে আমার যে খুব জানাশোনা, এটা তুমি অনেকদিন থেকেই জানো, না?"

"প্রথম থেকেই জানি।"

"হ্যাঁ, তুমিই ওর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিয়েছিলে। একথা আমি কোনোদিনই ভুলবো না।"

এই স্বীকৃতি আমার মনকে নাড়া দিলো না একটুও। আমি চুপ করে রইলাম।

"মিমিও তোমায় অনেক কথা বলেছে, না?"

"বিশেষ কিছুই বলেনি," আমি বললাম, "আমিও কোনোদিন কিছু জিজ্ঞেস করিনি। তবে তোমাদের যে প্রায়ই দেখা হয় এটা আমি জানতাম।"

"সব শুনতে চাও?" অমিয় জিজ্ঞেস করলো।

"শুনে আর কি করবো? নতুন কথা কি আর শোনাবে। সবই তো সেই পুরাতন কাহিনী।"

অমিয় হাসলো। বললো, "হ্যাঁ। কথা তো সেই চিরদিনের পুরোনো। আলাপ হোলো, আমারও মনে হোলো এবং তারও মনে হোলো,—এই সেই, যাকে আমি মনে প্রাণে চাইছিলাম। তখন বার বার দেখা হয়, যতো বাধাই থাক, যতো অসুবিধেই থাক, সব কিছু কাটিয়ে ঠিক দেখা করে এ ওর সঙ্গে। যে বাধা কোনোদিন কাটানো যাবে বলে মনে হয়নি কারো, দরকারের সময় দেখি কিছুই আটকাচ্ছে না। একটা আশ্চর্য জোর এসে যায়, অদ্ভুত একটা সাহস একটা বেপরোয়া ভাব এসে যায়। কি করে যে দেখা হয়, কি করে যে এ ওর মনের ভাব ঠিক বুঝে নেয়, আশ্চর্য। চিরকাল ধরে সব দেশে সব জায়গায় সব সমাজে এই অন্তরঙ্গ হচ্ছে। কি ভাবে কি ঘটে যায় কাউকে বলা যায় না, বললে ঠিক সিনেমার গল্পের মতো শোনাবে, বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করবে না। প্রত্যেকের জীবনই এক একটা উপন্যাস। দেখো সলিল, তুমি নিজে যেদিন কাউকে ভালোবাসবে,—"

"আমার কথা থাক," আমি বাধা দিয়ে বলে উঠলাম, "তোমার কথা বলছো, তোমার কথাই বলো।"

চা শেষ করে কাপ নামিয়ে রাখলো অমিয়, বললো, "একটা আশ্চর্য মেয়ে মিমি। আমি ওকে বললাম, তোমায় বিয়ে করবার জন্যে আমি মুসলমান হতে রাজী আছি। সে বললে, না আমার জন্যে তুমি তোমার ধর্ম ছাড়বে কেন? তুমি যদি কোনোদিন তোমার ধর্মের উপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেল, যদি আমার ধর্ম তোমার ভালো লাগে, তাহলে যদি তুমি ধর্মত্যাগ করো, আমি কিছু বলবো না। কিন্তু শুধু একটি মেয়েকে বিয়ে করতে চাও বলে ধর্ম ছাড়বে?"

মিমির কথা শুনে অমিয় জিজ্ঞেস করলো,—"তাহলে? আমাদের বিয়ে হবে কি করে?"

"হবে না," মিমি উত্তর দিয়েছিলো, "আমি তো আর কাউকে বিয়ে করতে পারবো না। একজনকে প্যার করবো, আরেকজনের সঙ্গে ঘরকন্না করবো, সে আমায় দিয়ে হবে না। তুমি যদি পারো তো করো গে যাও, আমি কিছু বলবো না।"

"তুমি আমায় বিয়ে করতে চাও না?" অমিয় জিজ্ঞেস করেছিলো।

"না।"

"তবে তুমি কি চাও?"

"আমি চাই যে তুমি খুব বড়ো হও। তুমি হিন্দুস্তান চলে যাও, গানে খুব নাম করো, নিজের জন্যে না পারো তো যে তোমায় ভালোবাসে তার জন্যে করো। তোমায় জীবনে বড়ো হতে সাহায্য করবার জন্যে যে প্যার তোমার দরকার, সে প্যার তোমায় দেবো, আমি নিজে আর কাউকে বিয়ে করে সংসার করতে পারবো না। প্যার কি শুধু একটু সুখের জন্যে? প্যার একজন আরেকজনকে বড়ো হতে, মহান হতে সাহায্য করবার জন্যে।"

মিমির সংস্পর্শে আসবার আগে পর্যন্ত অমিয় কোনোদিন কোনো কিছু সম্বন্ধে গভীর ভাবে ভাবতে পারতো না। শুধু গান গাইতো, আর জীবনের রস যখন যেমনি ভাবে আসতো তেমনি ভাবে তাকে পান করতো। মিমি তার মধ্যে একটা গভীর পরিবর্তন এনে

দিয়েছিলো। জীবন সম্বন্ধে গভীর ভাবে ভাবতে শুরু করেছিলো সে।

"তুমি যে এই গানের গলা পেয়েছো অমিয়, সে কেন? তুমি যে এত কসরত করে গান শিখেছো, সে কেন? সে কি শুধু নিজেকে ভুলবার জন্যে? তুমি যা পেয়েছো, তার বদলে অন্যকে কিছু দাও।"

"আমি কি করবো মিমি?"

"তুমি এদেশে থেকো না। তুমি হিন্দুস্তান চলে যাও।"

অমিয় আমায় এসব নানাদিনের নানারকম টুকরো কথা শোনাচ্ছিলো সেদিন সন্ধ্যায় তার ঘরে বসে।

"বুঝলে সলিল, সবাই আমায় হিন্দুস্তান পাঠিয়ে দিতে চায়, এদেশে কেউ আমায় নিরিবিলি থাকতে দিতে চায় না। আমি চাই একটুখানি ঘর, সবাই আমার হাতে তামাম দুনিয়াকে তুলে দিতে চায়। শিরীনও ওই কথা বলতো, আজ মিমিও ওই একই কথাই বলছে।"

আমি আস্তে আস্তে বললাম, "ভাই অমিয়, জীবনে আর্টিস্ট হওয়ার চাইতে বড়ো কষ্ট আর নেই।"

নভেম্বর পার হয়ে গেল, এলো ডিসেম্বর মাস। প্রাচ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব অন্ধকার হয়ে এলো। সবাই বললে,—কিছুদিনের মধ্যেই যুদ্ধ আরম্ভ হবে। রেঙ্গুন শহরে শুরু হোলো নিষ্প্রদীপের মহড়া।

একদিন মিমির কথা খুব মনে পড়লো। ওর সঙ্গে দেখা করবার ইচ্ছে হোলো খুব। বিকেল বেলা গিয়ে উপস্থিত হলাম ওদের বাড়ি।

দিলওয়ার বাড়িতেই ছিলো। আমায় দেখে খুব খুশী হোলো, ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে। আমি কোনো কথা বলবার আগেই তার বুড়ো চাকরকে ডেকে বললো,—বুবুজানকে ডেকে দাও। বলো, নিচে এক মেহমান এসেছেন।

মিমি নিচে নেমে খুব সাধারণভাবে আর দশজনের মতো গল্প-সল্প করলো কিছুক্ষণ,—মা-খিন-স কি রকম আছে, মা-লা-লার কি খবর, ওদের সঙ্গে দেখা হয় কি না; যদি যুদ্ধ বাধে আমরা কি এখানেই থাকবো না হিন্দুস্তান চলে যাবো, এই সব। দিলওয়ার খুব খুশী, যুদ্ধ বাধুক তাতে তার আপত্তি নেই, যুদ্ধটা বার্মার ভিতরে না হলেই হোলো। সব জিনিসের দাম বেড়ে যাচ্ছে, ব্যবসা ভালো হচ্ছে, আমদানি হচ্ছে ভালো।

মিমি হঠাৎ বললো, "সলিল, তুমি তো আমার বাবাকে কোনোদিন দেখনি। সেদিন ওঁকে বলছিলাম তোমার কথা। উনি বলছিলেন, এখানে এলে তোমায় উপরে নিয়ে যেতে, দেখা করবে আমার বাবার সঙ্গে?"

"হ্যাঁ, নিশ্চয়ই, কেন করবো না?"

"এঁকে উপরে নিয়ে যাই?" মিমি জিজ্ঞেস করলো দিলওয়ারকে।

"হ্যাঁ, নিয়ে যাও, তবে বেশীক্ষণ আটকে রেখো না, ওকেও তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরতে হবে, ব্লাক-আউট হবে আজ রাত্তিরে। তা-ছাড়া আব্বাজানেরও তবিয়ত ঠিক নেই।"

সিঁড়ি বেয়ে মিমির সঙ্গে দোতলায় উঠে এলাম।

একটি ছোটো সাদাসিধে ঘর। একটা বড়ো তখ্‌তের উপর পুরু গদী পাতা, তার উপর তাকিয়া ঠেস দিয়ে শুয়ে আছেন এক সৌম্য জরাজীর্ণ বৃদ্ধ।

মিমি বললো, "আব্বাজান, ইনি সলিল। আপনার সঙ্গে মিলতে এসেছেন।"

আমি তসলিম জানালাম, উনি আমায় বসতে বললেন একপাশে। মিমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইলো।

বেশী কথাবার্তা হোলো না। বললেন, "আমার চোখ খারাপ হয়ে গেছে, আপনাকে ভাল করে দেখতে পাচ্ছি না, আর ঠিক মতো আদর আপ্যায়ন করতে পারছি না।"

এমন অদ্ভুত বিনয় ও ভদ্রতা ওঁর কথাবার্তায়, অথচ একটা সহজ বনেদীয়ানা যে আমি যেন মাটিতে মিশে গেলাম।

উনি বলে গেলেন, "দিলওয়ার আছে, মিমি আছে, ওরাই আপনার যত্ন করবে। শুনেছি আপনি নাকি দিলওয়ার আর মিমির বন্ধু, মিমির সহেলীদের বাড়ি ওর সঙ্গে জান পহচান হয়েছে, দিলওয়ার আর মিমি আপনাকে ভায়ের মতো মানে। এরকমই হবে। আমাদের সময় হিন্দু মুসলমান দূর দূর থাকতো, বেশী দোস্তি হোতো না, কাজের খাতিরে ঘরে বাইরে যতোটুকু দেখা হোতো ততটুকু। কেউ কাউকে আপন মনে করতো না। তাইতো হিন্দুস্তান বিদেশীর গোলাম হয়ে গেল। এখন জমানা বদলে যাচ্ছে, হিন্দু মুসলমানকে ভাই মনে করবে, মুসলমান হিন্দুকে ভাই মনে করবে। তারপর একদিন দেশেরও আজাদী হয়ে যাবে। এই যে দুনিয়া জুড়ে লড়াই শুরু হয়েছে, দেখো, যুদ্ধের পর অনেক কিছু বদলে যাবে।"

ওঁর দুটো চারটে কথা থেকে বুঝলাম খুব আদর্শবাদী ধর্মভীরু লোক। খুব শ্রদ্ধা হোলো। কিছুক্ষণ পর উঠে এলাম।

বাইরে বেরিয়ে এলাম মিমির সঙ্গে। সিঁড়ির মাঝামাঝি সে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বললো, "সলিল, ভাই সায়েবের সামনে বলার সুবিধে হবে না। শোনো, অমিয়কে বোলো, ও যেন আমার জন্যে ভাবনা না করে। আমি যেমন করেই হোক শিগ্গিরই একবার ওর সঙ্গে দেখা করবো। খুব সম্ভব মা-খিন-স বা মা-লা-লার বাড়িতেই দেখা হবে।"

আমায় নিচে পৌঁছে দিয়ে মিমি আবার উপরে চলে গেল।

দিলওয়ার জিজ্ঞেস করলো, "মা-য়িন-ম্যার সঙ্গে দেখা হয়েছে?"

আমি উত্তর দিলাম, "না।"

"আমি একদিন গিয়েছিলাম," দিলওয়ার একটু আনমনা হয়ে বললো, "ও দেখা করেনি। মা-খিন-চ্যিকে দিয়ে বলে পাঠালো, ও আজকাল আর কারো সঙ্গে দেখা করে না।"

পাঁচ-ছয়দিন পরের কথা। সেদিন বোধ হয় সাতই ডিসেম্বর। বিকেলবেলা আমাদের প্রফেসারের বাড়িতে অনার্সের ছাত্রছাত্রীদের চায়ে ডেকেছিলো। ইউনিভার্সিটি এলাকার মধ্যেই ইউরোপীয় প্রধান অধ্যাপকের বাংলো। লন্ চেয়ার পেতে বসে আমরা সবাই যখন খুব হৈ-চৈ করে চা খাচ্ছি আর গল্প করছি, এমন সময় খবর এলো।

জাপানী বিমানবাহিনী পার্ল হারবার আক্রমণ করে বোমা-বিধ্বস্ত করেছে। ইংলণ্ড আর আমেরিকা জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আজ থেকে শহরে টোট্যাল ব্ল্যাক-আউট।

তখন সন্ধ্যে হয়ে আসছে। ইউনিভার্সিটি এলাকা নির্জন, শান্ত। সন্ধ্যার স্নিগ্ধ পরিষ্কার আকাশে কয়েকটি তারা ফুটে উঠেছে। চারদিক এত নিস্তব্ধ, এত শান্তিময় যে ভাবতে মন ভারী হয়ে ওঠে, পৃথিবীর অন্য কোথাও বাড়ি ঘরদোরের দগ্ধাবশেষ থেকে ধোঁয়া উঠছে আকাশের দিকে।

ছাত্রছাত্রীদের অনেকেই থাকে ইউনিভার্সিটি ক্যামপাস্-এর ভিতর বিভিন্ন ছেলেদের ও মেয়েদের হস্টেলে। ওরা যে যার মতো হস্টেলে ফিরে গেল। ডে-স্টুডেণ্টস্ আমরা যে চার-পাঁচজন ছিলাম প্রফেসার নিজে গাড়ি করে সবাইকে শহরে পৌঁছে দিলেন,—কারণ পাঁচটা বাজতে না বাজতে রেঙ্গুন ইলেকট্রিক ট্রামওয়ে কোম্পানি তাদের সার্ভিস বাস ও ইলেকট্রিক ট্রলি-বাস সার্ভিস বন্ধ করে দিয়েছে।

শহরে পৌঁছে দেখলাম পথে দোকানপাট লোক চলাচল বন্ধ। শুধু একটা দুটো প্রাইভেট কার ছুটে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। এখানে

সেখানে নীল ইলেকট্রিক টর্চ হাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে এ-আর-পির লোকেরা।

প্রথম ব্ল্যাক-আউটের রাত্রি খুব সুন্দর লাগলো। চিরকাল রাত্তিরে ইলেকট্রিক আলোর সমারোহ দেখতে অভ্যস্ত, একেবারে নিষ্প্রদীপ শহর অসংখ্য তারা আর একফালি ফিকে চাঁদের আলোয় কিরকম সুন্দর দেখায় এই প্রথম উপলব্ধি করলাম।

তার পরদিন সকালে কাগজে পড়লাম ইউনিভার্সিটি অনির্দিষ্ট কালের জন্যে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। চ্য-থেইনের খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম, সে নেই, ফেরার হয়েছে। তার সঙ্গে মা-লা-লাও। দোবামা পার্টির এবং রেঙ্গুন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টস্ ইউনিয়ানের বেশির ভাগ কর্মীই আণ্ডারগ্রাউণ্ডে চলে গেছে। যারা সময় মতো পারেনি তাদের পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

প্রথম নিষ্প্রদীপ রাত্রি ভালো লেগেছিলো। কিন্তু তারপর থেকে ব্ল্যাক-আউটের অন্ধকার রাত্রিগুলো সশঙ্ক প্রতীক্ষায় ভয়াবহ হয়ে উঠলো। জাপানী বিমানবাহিনী যে কোনোদিন শহর আক্রমণ করতে পারে। সারা শহরে চাঞ্চল্য জাগলো।

তেরোই ডিসেম্বর দুপুর বেলা প্রথম জাপানী পর্যবেক্ষক বিমান দেখা গেল শহরের উপর। বারান্দা থেকে দেখতে পেলাম অনেক উঁচুতে ছোটো খেলনার মতো দুটো রুপালী প্লেন চলে যাচ্ছে, যক্ষ্মাগ্রস্ত রোগীর কাশির মতো আওয়াজ করতে করতে। বৃটিশ ফাইটারের মতো একটানা আওয়াজ নয়। বিমান আক্রমণ প্রতিরোধ ব্যবস্থায় এমন বিশৃঙ্খলা যে সাইরেন পড়লো বেশ কিছুক্ষণ পরে। তার আগেই শহরের অধিবাসীরা টের পেয়ে গেছে যে জাপানী প্লেন এসেছে।

লোকের স্নায়ু যেটুকু ছিলো, তাও ভেঙে গেল। একটা ভীতির পরিবেশ গড়ে উঠলো শহরে। পালানোর হিড়িক এলো। দলে দলে লোক ছুটলো শহরতলিতে, শহরের উপকণ্ঠে, আশপাশের মফস্বল শহরে, কেউ বা আরো দূরে। জাহাজঘাটা, রেলস্টেশন লোকের ভিড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে উঠলো।

বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে আমিও চলে গেলাম প্রোম শহরে। পশ্চিমে ইরাবতী নদী, আরো দূর পশ্চিমে আরাকানের পর্বতশ্রেণী। কাঠের বাড়ির আর বাঁশের বেড়ার বাংলোর ছোটো শহর, নোংরা, কিন্তু সুন্দর। চেনাশোনা কেউ ছিলো না এই শহরে। নদীর পাড়ে একা একা ঘুরে বেড়িয়ে মোটা মোটা বার্মিজ দেহাতী চুরুট ফুঁকে সময় কাটতো। প্রায়ই মনে পড়তো মিমির কথা, দিলওয়ারের কথা, অমিয়, মা-য়িন-ম্যার কথা। মাঝে মাঝে মনে পড়তো শিরীনকেও।

কেটে গেল ছয়-সাত দিন।

অমিয়র কাছে আমার ঠিকানা রেখে গিয়েছিলাম। হঠাৎ তার কাছ থেকে একটা চিঠি পেলাম:

ভাই সলিল, আমি হয়তো ইণ্ডিয়ায় চলে যাবো শিগগিরই। তোমার বন্ধু ফেরার হয়েছে। আমরা কেউ জানতাম না চ্য-থেইন, মা-লা-লা, মা-খিন-স'দের সঙ্গে সেও দোবামার রাজনীতিতে লিপ্ত ছিলো। তবে আমার সঙ্গে প্রায় প্রত্যেক দিনই একবার দেখা হয়। ওর দাদার ধারণা আমি নাকি ওকে নিয়ে পালিয়েছি। সে আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমার পেছনে লোক লাগিয়েছে আমাকে ঠ্যাঙানোর জন্যে। যাই হোক, আমি এখান থেকে যেতে চাই না, কিন্তু তোমার বন্ধু শুনছে না, সে তার চেনা কারো মারফতে আমার জন্যে একটা জাহাজের টিকিটের ব্যবস্থা করেছে। জাহাজ চব্বিশ তারিখ। টিকিট পাওয়া দুষ্কর। আমি যাবো কিনা জানি না। তবে যদি যাই তো চব্বিশ তারিখেই যাবো। তোমার বন্ধুকে নিয়ে যেতে চাই, কিন্তু সে কিছুতেই যাবে না। তুমি যদি ইতিমধ্যে একবার রেঙ্গুন আসতে পারো তো ভালো হয়।

আমরা রেঙ্গুন ছেড়ে আসার সময় অল্প কিছু নিতান্ত প্রয়োজনীয়

জিনিসপত্র ছাড়া আর কিছু সঙ্গে আনিনি। অন্যান্য আরো অনেক কিছু আনবার জন্যে আমার রেঙ্গুনে ফেরার প্রয়োজন ছিলো। মাকে বলে রেঙ্গুন রওনা হলাম অমিয়র চিঠি পাওয়ার পরদিনই।

প্রোম থেকে রেঙ্গুন এক রাত্তিরের পথ। এসে পৌছলাম তেইশে ডিসেম্বর সকালবেলা। বাড়ি পৌছেই স্নান করে জামাকাপড় বদলে লামড চলে গেলাম অমিয়র সঙ্গে দেখা করতে। সেও আমায় নিয়ে বেরোলো সঙ্গে সঙ্গেই। মিমি খবর পাঠিয়েছে তার সঙ্গে দেখা করতে। ফেয়ার স্ট্রীটের একটি মিল্ক বার-এ সে অপেক্ষা করবে অমিয়র জন্যে। অমিয় আমায় সঙ্গে নিয়ে সেখানে চলে এলো।

মিমি অমিয়র অপেক্ষায় বসেছিলো। তার পরনে বার্মিজ পোশাক। আমায় দেখে খুব খুশী হোলো। বললো, "সলিল, তুমি ফিরলে কবে?"

"আজ সকালে।"

"তোমরাও কি হিন্দুস্তান চলে যাবে?"

"কিছু ঠিক নেই," আমি উত্তর দিলাম, "ওদেশে গিয়েই বা কি করবো জানি না। ওখানে কোনোদিন যাইনি। সে তো একরকম বিদেশ আমাদের কাছে। কাউকে চিনি না, কিচ্ছু জানি না—।"

"তবু সে নিজের দেশ, চলে যাও সলিল," মিমি বললো, "এখানে ভয়ানক গোলমাল হবে। আমি জানি।"

মনে পড়লো অমিয় লিখেছিলো, মিমিও জড়িত আছে দোবামা আন্দোলনের সঙ্গে।

জিজ্ঞেস করলাম, "অমিয় বলছিলো তুমি দোবামার মেম্বার। আমি তো জানতাম না। কাজ করতে কখন?"

মিমি এদিক ওদিক তাকালো। বেশি লোকজন নেই। বার্মিজ মালিক কাউন্টারে বসে কাগজ পড়ছে। জাপানী সৈন্য মালয়ের ভেতর দিয়ে টেনাসেরিম অঞ্চলে হানা দিয়েছে।

মিমি বললো, "দোকানের মালিক আমাদের পার্টির লোক। তবু

একটু আস্তে বলো। কে কি শুনে ফেলে ঠিক নেই। আমায় তো পুলিশ খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

শুনলাম মা-খিন-স, মা-লা-লা, চ্য-থেইনদের সঙ্গে সে দোবামা পার্টির কাজ করে অনেকদিন থেকেই। এখন আছে মা-খিন-স, চ্য-থেইনদের সঙ্গে।

"এখনো কিছুদিন লুকিয়ে থাকতে হবে," সে বললো।

"তারপর?"

"ইংরেজরা চলে গেলে তারপর আবার স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারবো।"

"ওরা চলে যাবে?" আমি খানিকটা অবিশ্বাসের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম। সুদূর প্রাচ্যে রণশক্তিতে ওরা যে অপরাজেয় নয় একথা তখনো বেশি কেউ মানতে চায় না।

"ওরা যেতে বাধ্য হবে," মিমি উত্তর দিলো, "জাপানীদের সঙ্গে পেরে উঠবে না।"

"তোমরা কি চাও জাপানীরা বর্মা দখল করুক?"

"না, সে আমরা চাই না। আমরা চাই ইংরেজরা যখন চলে যাবে, তখন বর্মা দেশে আজাদী বার্মিজ হুকুমত কায়েম হবে।"

"জাপানীরা সেটা হতে দেবে?"

"সে তর্ক এখানে নয়," মিমি চারদিক তাকিয়ে উত্তর দিলো, "অন্য কথা বলা যাক। অমিয়, তুমি তাহলে কালকের জাহাজ ধরছো?"

"মিমি—।"

"দেখ আমি কোনো কথা শুনতে চাই না। এখন গোলমালের সময়। তুমি হিন্দুস্তান চলে যাও। সব গোলমাল থেমে যাক। তারপর একদিন না একদিন আবার দেখা হবে।"

"তোমার সঙ্গে আমিও তো এখানে থেকে যেতে পারতাম।"

"না, এখানে তোমার কিছু করবার নেই। তুমি বর্মা ছেড়ে চলে যাও কিছুদিনের মতো। আরেকটা কথা কি জানো? দিলওয়ার

যাচ্ছে না কোথাও, সে এখানেই থাকবে। কিছুদিন এদেশে আইনকানুন বলে কিছু থাকবে না। আমি চাই না সে সময় তুমি এখানে থাকো। দিলওয়ার কি করে বসে কিছুই ঠিক নেই। আমার এখন অনেক কাজ। আমি নিজের কাজ দেখবো, না তোমার জন্যে দুর্ভাবনা করে মরবো। তুমি তো জানো সে পাগলের মতো তোমায় খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"তুমি কেন ফেরার হয়েছো সে কথা দিলওয়ার সত্যিই জানে না?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না, সে জানে না, কারো কাছে শুনলেও বিশ্বাস করবে না। সে এর জন্যে অমিয়কেই দায়ী মনে করছে। ওকে পেলে সোজা ছুরি মেরে দেবে দিলওয়ারের লোকেরা, সত্যি বলছি। অমিয়, আমি অনেক কষ্ট করে তোমার জন্যে টিকিটের ব্যবস্থা করে দিয়েছি। তুমি চলে যাও। আমার কথা রাখো। আমি জানি, আবার আমাদের দেখা হবে।"

একটু চুপ করে রইলো অমিয়। তারপর বললো, "তোমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে মিমি।"

"আমায় তো এখন যেতে হবে। আমি আবার বিকেলে দেখা করবো। শোয়ে ড্যাগন পাগোডার মা-ম্যা-সেইনের ফুলের দোকানে এসো। সেখানে দেখা হবে।"

আমি তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম মিমিকে। কথাবার্তা খুব কাটাকাটা পুরুষালী হয়ে গেছে। চোখ দুটি তীক্ষ্ণ, চঞ্চল। এই কদিনের মধ্যে অনেক বদলে গেছে মিমি। সে আর মোগলকন্যা লুৎফ-উন-নিসা নয়, আমাদের ছুটির দিনের অবসরবেলার হাল্কা মুহূর্তগুলির সঙ্গিনী মিমি নয়,—সে একটি দেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে অনেক কাজের দায়িত্বের অংশীদার এক মেয়ে-কর্মী। অন্য সব সামাজিক, পারিবারিক, ব্যক্তিগত দায়িত্ব গৌণ হয়ে গেছে তার কাছে।

"আমায় এবার উঠতে হবে," সে বললো।

পথে নেমে এসে আমি বললাম, "তোমায় যদি কেউ চিনে ফেলে ?"

মিমি এসে বললো, "একটু ঝুঁকি না নিয়ে উপায় নেই। তবে সে সম্ভাবনা কম। পুলিশ আমার সম্বন্ধে শুনেছে, তবে আমার চেহারা খুব সম্ভব চেনে না। ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে দিলওয়ার বক্স্-এর বোন লুৎফ-উন-নিস'কে, অজ্ঞাত কুলশীল বার্মিজ মেয়ে মা-মি-মিকে নয়। আর একটা কথা কি জানো, ইদানীং ইংরেজ সরকার খুব মাথা ঘামাচ্ছে না আমাদের নিয়ে। ওরা ইভ্যাকুএশানের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। ওরা জানে যে ওরা এদেশে থাকতে পারবে না।"

কথা বলতে বলতে ফেয়ার স্ট্রীট ধরে হেঁটে এসে ফ্রেজার স্ট্রীটে মোড় ফিরেছি,—এমন সময় হঠাৎ শহর কাঁপিয়ে পথচারীদের হৃদয় স্পন্দনে ব্রেক কষিয়ে অতর্কিত সাইরেন বেজে উঠলো চারদিকে।

আর সঙ্গে সঙ্গেই কাছাকাছি কোথাও বিপুল বিস্ফোরণে একটি বোমা বিদীর্ণ হোলো। ধোঁয়ায় আর ধুলোয় দৃষ্টি ব্যাহত হোলো। হুড়োহুড়ি ছুটোছুটি শুরু হোলো চারদিকে।

অমিয় আমাকে আর মিমিকে ধরে এক ঝটকা টানে নিকটবর্তী একটি ফ্ল্যাট বাড়ির ব্যাফল-ওয়াল ঢাকা প্রবেশ পথে ঢুকিয়ে দিলো। সিঁড়ির নিচে ও পাশে অনেকটা জায়গা। বেশ কয়েকজন এসে জুটেছে সেখানে। চারদিকে দুমদাম বোমা ফাটছে কানে তালা লাগিয়ে। থরথরিয়ে কাঁপছে অনেকেই। বাইরে থেকে শোরগোল চিৎকার চেঁচামেচি ভেসে আসছে। ধোঁয়ায় ভরে গেছে চারদিক। আকাশে অনেক প্লেনের শব্দ।

ধোঁয়ার ভিতর দিয়ে আ·· একজন ছুটে এসে ভিতরে ঢুকলো, আর আমাদের দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো।

চারদিকে তখন শ্রুতিবিদীর্ণ বিস্ফোরণ। উত্তাল শব্দের সমুদ্রে যেন তুফান শুরু হয়েছে।

"ভাই সায়েব!" মিমির রুদ্ধ কণ্ঠ ঘড়ঘড়িয়ে উঠলো।

দিলওয়ার কোনো উত্তর দিলো না। আস্তে আস্তে এগিয়ে গেল অমিয়র দিকে।

"না, না, না," চেঁচিয়ে উঠলো মিমি, কিন্তু তার গলা চাপা পড়ে গেল আরেকটি বিপুল বিস্ফোরণে। ততক্ষণে অমিয়র চোয়ালে একটি ঘুষি বসিয়ে দিয়েছে দিলওয়ার। আমি ছুটে গেলাম থামাতে। কিন্তু অন্যান্য সবাই ভাবলো আমিও বোধ হয় মারামারিতে যোগ দেবো। ওরা চেপে ধরে রাখলো আমাকে। অমিয় আর দিলওয়ারকেও ওরা থামাতে গেল। কিন্তু ততক্ষণে অমিয়র উল্টো ঘুষিতে দিলওয়ার প্রায় দরজার কাছে গিয়ে গড়িয়ে পড়েছে। অমিয় ছুটে গেল ওর কাছে। দিলওয়ার উঠে দাঁড়িয়ে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। দুজনেই পড়ে গেল মাটিতে, তারপর জড়াজড়ি করে গড়িয়ে গড়িয়ে বাইরে পথের উপর গিয়ে পড়লো।

সমস্ত ব্যাপারটা ঘটে গেল এক মিনিটের মধ্যে। কেউ কিছু বুঝে উঠবার আগেই মেশিন গানের দ্রুত আওয়াজের নিবিড় বর্ষণ শুরু হোলো। ততক্ষণে ধোঁয়ায় প্রায় অন্ধকার হয়ে গেছে আমাদের আশ্রয়স্থল। মিমি চাপা কান্নায় কেঁপে কেঁপে উঠলো।

বিমান আক্রমণ শেষ হোলো কিছুক্ষণের মধ্যেই। তবু অল-ক্লিয়ারের অপেক্ষায় সেই ধোঁয়া-ধূসর অন্ধকারে সবাই বসে রইলো আরো কিছুক্ষণ। তারপর চারদিকের সন্ত্রস্ত জনতা পথে বেরিয়ে পড়লো।

মিমির সঙ্গে সঙ্গে আমিও বেরিয়ে এলাম। ধোঁয়ায় আবছায়া নগরপথে তখন এক তীব্র বীভৎসতা ছড়িয়ে পড়েছে। কেয়ার স্ট্রীটের মোড় থেকে স্পার্কস্ স্ট্রীট পর্যন্ত সারাটা ফ্রেজার স্ট্রীট ধরে অগণ্য মৃতদেহ সমস্ত পথে ছড়ানো।

আমরা যেখানে আশ্রয় নিয়েছিলাম তারই সামনে দিলওয়ার আর অমিয় পড়ে আছে,—তখনো দুজন দুজনকে জড়িয়ে।

পরদিন বিকেল বেলা শোয়ে-ড্যাগন প্যাগোডায় মা-ম্যা-সেইনের ফুলের স্টলে গিয়ে উপস্থিত হলাম। খুঁজে পেতে অসুবিধে হোলো না। মিমি অপেক্ষা করছিলো আমার জন্যে।

মা-ম্যা-সেইন যে রকম খাতির করলো মিমিকে, তাতে মনে হোলো হয়তো সেও দোবামার একজন কর্মী, নয়তো বা একজন সক্রিয় সমর্থক। সে আমাদের ওর স্টলে একলা রেখে পাশের স্টলের মেয়েটির সঙ্গে গল্প করতে গেল।

সেদিন প্যাগোডায় ভিড় নেই একেবারেই, কেউ এলো না এই স্টলে ফুল কিনতে। দু-একজন যারা আসছিলো মা-ম্যা-সেইন তাদের পাশের স্টলেই ডেকে নিলো। একলা নিরিবিলি বসে কথা বলছিলাম আমি আর মিমি।

চোখের জল মুছে মিমি বললো, "তোমরাও কি মুলুক চলে যাবে সলিল ?"

"হ্যাঁ, বাবা তাই ঠিক করেছেন। বাড়ির মেয়েদের নিয়ে আমি পরশুর জাহাজ ধরবো। পুরুষেরা আসবে পরে আরেকটি জাহাজে। ওরা কেউ এখন যেতে পারছে না, অনেক কাজ এখানে।"

"হ্যাঁ ভাই, যেতে যখন হবেই, চলে যাওয়াই ভালো। তোমরা এদেশে থেকে কি করবে ? এদেশকে কোনোদিন নিজের দেশ বলে মনে করতে পারবে না।"

আমি বললাম, "চিরকালের জন্যে তো যাচ্ছি না। কয়েক মাসের জন্যেই যাচ্ছি। এদিকে বোমা-টোমা পড়ছে। শহরে থাকা নিরাপদ নয়। মফস্বলে খুব লুটপাট হচ্ছে, তাই সেদিকে গিয়ে থাকাও সম্ভব নয়। তাই কিছুদিনের জন্যে দেশে যাচ্ছি। কয়েক মাসের মধ্যে অবস্থা নিশ্চয়ই অনেক শান্ত হয়ে আসবে। তখন আবার ফিরে আসবো।"

সে সময় অনেকেই ওই একই কথাই ভাবছিলো। মাস কয়েকের জন্যে দেশে গিয়ে থাকবে। অবস্থা একটু আয়ত্তের মধ্যে এলেই

আবার ফিরে আসবে।—তারপর কতো বছর কেটে গেছে, অনেকেই ফেরেনি, নিখোঁজ হয়ে গেছে।

আমি বলে গেলাম, "তদ্দিনে ইউনিভার্সিটি নিশ্চয়ই খুলে যাবে, আমায় আসতেই হবে। পরের বছর অনার্সের ফাইন্যাল।"

মিমি ম্লান হাসি হাসলো, বললো, "তুমি কি অন্ধ? এত বড়ো একটা ওলট-পালট হয়ে যাচ্ছে, আর তুমি ভাবছো তোমার অনার্সের ভাবনা। এ গোলমাল অনেকদিন চলবে।"

"তোমার সঙ্গে আবার কবে দেখা হবে মিমি?"

"জানি না," সে বললো।

একটু ভেবে বললাম, "মিমি, তুমিও আমাদের সঙ্গে চলো—।"

আজ মনে পড়লে হাসি পায়, কি রকম ছেলেমানুষের মতো কথাটা তখন বলেছিলাম। কিন্তু বলেছিলাম খুব আন্তরিক ভাবেই।

"না ভাই, সে হয় না," মিমি উত্তর দিলো।

"কেন হয় না?"

একটু চুপ করে রইলো মিমি। তারপর বললো, "আমার তো এদেশ ছাড়ার উপায় নেই। আমার অনেক কাজ। দোবামার কাজ আছে, বাবার দেখাশোনা করতে হবে, তা-ছাড়া নিয়মিত বাহাদুর শা'র কবর জিয়ারত করতে হবে। যদি এদেশে হিন্দুস্তানের আজাদীর লড়াই শুরু হয়, তখন আমাকেও যোগ দিতে হবে তাতে। সে আমার অনেক দিনের স্বপ্ন।"

"তুমি হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করবে?" আমি একটু হেসে জিজ্ঞেস করলাম।

"আজকালকার লড়াইতে মেয়েদেরও অনেক কাজ থাকে, সলিল," মিমি খুব শান্ত গলায় উত্তর দিলো। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো সে, তারপর বললো, "সলিল ভাইয়া, তোমার সঙ্গে আর কখনো দেখা হবে কিনা জানি না, তবে আমি তোমায় কোনোদিন ভুলতে পারবো না। তোমার মতো বন্ধু আমার আর কেউ হবে না।"

উঠবার সময় হয়ে আসছিলো। সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরতে

হবে। সন্ধ্যের পর বাইরে থাকা নিরাপদ নয়। বাড়ি ফিরতেও অসুবিধে। সারা শহর অন্ধকার হয়ে যায়, লোক চলাচল থাকে না, ট্রাম বাস ইলেকট্রিক-ট্রলি কিছু পাওয়া যায় না।

"কাল আবার আসবে মিমি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম।

"না ভাই, আর দেখা হবে না। পরশু তো তোমরা চলে যাচ্ছো, আর আমি কাল কয়েকদিনের জন্যে থারাওয়াডি যাচ্ছি মা-খিন-স'র সঙ্গে।"

শোয়ে ড্যাগনের প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিলাম। মিমি হঠাৎ পেছন থেকে ডাকলো, "সলিল ভাইয়া, শোনো।"

ফিরে গেলাম তার কাছে। সে আস্তে আস্তে বললো, "ভাইয়া, তুমি যেখানেই থাকো, সন্ধ্যার আকাশে যখনই দেখবে ফুটে উঠছে একটি দুটি তারা, মনে কোরো যে মিমি তোমার কথা ভাবছে।"

অসংখ্য ধাপ শোয়ে ড্যাগনের প্রশস্ত সিঁড়ির। অনেকটা নিচে নেমে এসে ফিরে তাকালাম। পেছনে অনেক উঁচুতে মা-ম্যা-সেইনের ফুলের দোকানের সামনে বার্মিজ মেয়ের সাজে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে মিমি।

আমায় ফিরে তাকাতে দেখে সে হাত নাড়লো। আমিও হাত নাড়লাম। তারপর বেরিয়ে এলাম শোয়ে-ড্যাগনের দক্ষিণ সিংহদ্বার পার হয়ে।

দুদিন পরে আমরা রেঙ্গুন ছাড়লাম। বিষাদ ভারাক্রান্ত হুইসল্ ধ্বনিতে নদীর বুকে প্রতিধ্বনি ছড়িয়ে এস-এস-জলগোপাল সুলে-প্যাগোডা হোয়ার্ফ থেকে ছাড়লো। ধীরে ধীরে এগিয়ে চললো রেঙ্গুন রিভার ধরে। শহরটি বাঁয়ে সরে গেল আস্তে আস্তে। দূরের শোয়ে-ড্যাগন, বোমা-বিধ্বস্ত ক্রুকিং স্ট্রীট জেটি, জলের ধারে বোটাটাং কয়া ডিসেম্বরের প্রভাতী কুয়াশায় ক্রমে ক্রমে ঝাপসা হয়ে এলো।

শ্যামল প্রান্তর-বিস্তীর্ণ কিংস্ ব্যাঙ্ক, ডালার ধোঁয়াবিহীন নিস্তব্ধ

চালের কল ডাইনে ফেলে মাঙ্কি-পয়েন্ট ছাড়িয়ে মোড় ঘুরলো এস-এস জলগোপাল।

দূরে শোয়ে ড্যাগন পড়ে রইলো, পড়ে রইলো বাহাদুর শার সমাধি, পড়ে রইলো মিমি। ডেকের উপর রেলিংএর পাশে নিস্তব্ধ বেদনাতুর বিষণ্ণ যাত্রীদের মধ্যে দাঁড়িয়ে সেদিন আমার একা, ভীষণ একা, মনো হোলো নিজেকে।

কাহিনীর উপসংহার এখানেই টানতাম যদি না সাত বছর পরে একদিন বিকেলবেলা মা-য়িন-ম্যার সঙ্গে হঠাৎ আমার দেখা না হয়ে যেত কলকাতায়।

চৌরঙ্গীতে গ্রাণ্ড হোটেলের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ দেখি হোটেলের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে একজন ফিটফাট বার্মিজ মহিলা। খুব চেনা-চেনা মনে হোলো। সেও তাকালো আমার দিকে, সঙ্গে সঙ্গে চিনতে পারলাম দুজনে দুজনকে।

"মা-য়িন-ম্যা!"

"সলিল!"

আমি ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম মা-য়িন-ম্যাকে। বেশ একটু মোটা আর রাশভারী হয়েছে দেখতে।

"তুমি কলকাতায় এলে কবে?"

"কাল।"

"থাকবে কিছুদিন?"

"না, কালকের প্লেনে আমরা ইওরোপ যাচ্ছি।"

ইওরোপ! মা-য়িন-ম্যা যাচ্ছে ইওরোপ! কী ব্যাপার!

শুনলাম মা-য়িন-ম্যার স্বামী ইওরোপের কোনো একটি বন্দরে বার্মিজ কনসাল জেনারেল নিযুক্ত হয়েছে সম্প্রতি।

মা-য়িন-ম্যার স্বামী? বার্মার ফরেইন সার্ভিসে? মা-য়িন-ম্যা বুঝলো আমি একটু অবাক হয়েছি। খুলে বললো সব। বার্মায় যখন আওঙ-সানের নেতৃত্বে জাপবিরোধী গুপ্ত আন্দোলন শুরু হোলো, অনেক বার্মিজ তরুণ তরুণীর মতো তাতে যোগ দিয়েছিলো মা-য়িন-ম্যাও। একটি ফিল্ড-হসপিট্যালের কিচেন পরিচালনার

দায়িত্ব ছিলো তার উপর। সে সময় বার্মিজ ফ্যাসিবিরোধী গণফৌজের এক মেজরের সঙ্গে তার আলাপ হয়। আলাপ থেকে গড়ে ওঠে অন্তরঙ্গতা। কিছুদিন পরে ওদের বিয়ে হয়ে যায়। যুদ্ধের পর তার স্বামী বার্মার ফরেইন সার্ভিসে যোগ দেয়।

"তুমি কি করছো এখন?" সে আমায় জিজ্ঞেস করলো।

আমি হেসে উত্তর দিলাম। তারপর জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, দিলওয়ারের এক বোন ছিলো, মিমি। সে দোবামায় ছিলো। তুমি জানো?"

"সেই মিমি? যার সঙ্গে অমিয়র খুব বন্ধুত্ব ছিলো?" মা-য়িন-ম্যা হেসে জিজ্ঞেস করলো।

"তুমি জানতে?" অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম।

"হ্যাঁ, আমি সবই জানতাম," সহজভাবে হাসলো মা-য়িন-ম্যা।

এমন সহজভাবে আর দশটা কথার মতো বললো যে, আমি ভাবলাম হয়ত মহাকাল জীবনের সব দুঃখই একদিন না একদিন ভুলিয়ে দেয়।—কিংবা কে জানে, মেয়েদের মন, জীবনের চরম দুঃখ হয়তো মনের অতলে গোপন রেখে দেয়, জানতে দেয় না বুঝতে দেয় না কাউকে।

"মিমিকে আমরা মা-মি-মি বলেই জানতাম। দোবামায় তো ইণ্ডিয়ান বেশী কেউ ছিলো না। তাই পরে পরে ওর নাম আমরা সবাই শুনতে পেতাম। নেতাজী যখন আই-এন-এ করলেন, মা-মি-মি তখন ঝান্সি-ব্রিগেডে যোগ দেয়।"

"এখন কোথায় আছে সে?"

"জানি না। এই এক যুদ্ধে এত ওলট পালট হয়ে গেছে আমাদের দেশে, কে কার খবর রাখে!"

খুব হাল্কাভাবে বললো মা-য়িন-ম্যা। অনেক বদলে গেছে সে, আমার মনে হোলো। জীবনটাকেই বদলে দিয়েছে সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধ। ইতিহাসের একটি দীর্ঘ পরিচ্ছেদ শেষ হয়ে গেছে। শুরু হয়ে গেছে আরেকটি।

মনে পড়লো বাহাদুর শার সমাধিতে সেই সন্ধ্যার কথা। মনের মধ্যে এখনো ছবির মতো ভেসে ওঠে। কাগজে পড়েছিলাম, নেতাজী অনেক টাকা খরচা করে সেখানে নতুন সমাধি গড়ে দিয়েছেন।

একটা দ্রুত ছায়াচিত্র ভেসে গেল মনের উপর দিয়ে—কতো চরিত্র তাতে, অমিয় গাঙ্গুলী···দিলওয়ার বক্স্···শিরীন···জমিলা ···চ্য-থেইন···মা-খিন-স, মা-লা-লা, লুসি হান, পেগি আর বার্টি আরভিন···মা-য়িন-ম্যা···মিমি···বাহাদুর শার সমাধি।

মা-য়িন-ম্যার জন্যে গাড়ি অপেক্ষা করছিলো। সে চলে গেল।

সন্ধ্যা নামলো চৌরঙ্গীতে। লাল সবুজ নিওন সাইনগুলো এদিকে ওদিকে ঝলমল করে উঠলো। সন্ধ্যার আকাশে তাকিয়ে দেখি আস্তে আস্তে ফুটে উঠছে একটি দুটি তারা।

শোয়ে ড্যাগনের সিঁড়ির ধাপে দাঁড়িয়ে মিমি আমায় বলেছিলো।

শেষ